# ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি

মুফতী তকি উসমানী দা. বা.

# ইসলাম এবং আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি

মূল: আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ: শামসুল আলম
শিক্ষক: জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা- ১২১৭

মাকতাবাতুল আযহার
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা, ফোন: ৯৮৮১৫৩২,
মোবা: ০১৯২৪০৭৬৩৬৫, ০১৭১৫০২৩১১৮

www.pathagar.com

# ইসলাম এবং আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি

মূল: আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ: শামসুল আলম

প্রকাশক :
মাকতাবাতুল আযহার
আদর্শ নগর, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।
ফোন : ৯৮৮১৫৩২, ০১৭১৫০২৩১১৮

প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ২০১১ ইং
জুমাদাল উলা ১৪৩২ হিজরী

[©: লেখকের]

প্রচ্ছদ :
বশীর মিসবাহ্

হাদিয়া ঃ ১৬৫.০০ টাকা মাত্র

---

ISLAM ABONG ADHUNIK
AORTHONITHI O BABOSAYNITI
By: Allama Mufti Muhammad Taqi Usmani
Translated by: Shamsul Alam

www.pathagar.com

# উৎসর্গ

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ এর শিক্ষক আমার
মুহতারাম উস্তাদ হযরত মাওলানা মাহবূবে এলাহী সাহেব
রাহ. এর মাগফিরাত ও রফয়ে দারাজাতের উদ্দেশ্যে

অনুবাদক

www.pathagar.com

# অনুবাদকের ভূমিকা

আলোচিত গ্রন্থটি বর্তমান বিশ্বের অবিসংবাদিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের আধুনিক কালের ইমাম আল্লামা তাকী উসমানী (দামা যিল্লুহু)-এর বহুল আলোচিত 'ইসলাম আওর জাদীদ মাঈশাত ওয়া তিজারাত' গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্তাকারে প্রচলিত অর্থনীতির দর্শন ও তার প্রয়োগবিধির বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন এবং তার প্রয়োগবিধি সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক কালের ব্যবসায়ের বিভিন্ন জটিল পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান এবং নাজায়েয ক্ষেত্রে বিকল্প ইসলামী প্রক্রিয়া উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান এই গ্লোবাল ভিলেজ যুগের মূল নিয়ামক শক্তি এখন অর্থনৈতিক শক্তি। মূলত অর্থনৈতিক শক্তিই বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিশ্ব। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে বৈশ্বিক রাজনীতি। তাই সম্পদশালী হওয়ার প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্বই এখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। সম্পদ আহরণের প্রতিযোগিতা প্রতিটি মানুষের জীবনেও নিয়ে এসেছে এক অন্তহীন অস্থিরতা। কিন্তু সম্পদ আহরণের এ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা মানব সভ্যতার শুরু লগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং সম্পদ অর্জনের কলাকৌশল নিয়ে মানুষ বহু পূর্ব থেকেই ভেবে আসছে এবং বহু দর্শন ও মতবাদ মানুষ আবিষ্কার করেছে।

সুতরাং এ পর্যন্ত যতগুলো অর্থনৈতিক দর্শন পৃথিবীতে এসেছে তার মধ্যে দুটি দর্শন উল্লেখযোগ্য। একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অপরটি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। রাশিয়ার পতনের আগ পর্যন্ত দুটি অর্থনৈতিক দর্শন পৃথিবীকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তবে সমাজতন্ত্রের পতনের পর বর্তমানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই প্রায় সারা বিশ্বে এককভাবে ছড়ি ঘুরাচ্ছে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে ধনী ও দরিদ্র এ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। পুঁজিবাদী দর্শনের কল্যাণে ধনিক শ্রেণী সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে আর দরিদ্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধুকছে। এ অর্থব্যবস্থা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে বাধ্য করছে। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানেই, ধন জমা করার

www.pathagar.com

উপায় বা কৌশল। সুতরাং এ ব্যবস্থা অর্থ কেবল পুঞ্জীভূত করে, বিতরণ করে না। অর্থাৎ সম্পদের সুষম বণ্টনের কোনো সুব্যবস্থা নেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ কর্তৃক সৃজিত পৃথিবীর সম্পদরাজি অসীম নয় বরং সসীম। সুতরাং কেউ অতিরিক্ত সম্পদ জমা করলে নিশ্চয় সে অন্য কারো অংশ জমা করছে। এভাবে দরিদ্র শ্রেণীর সম্পদ ধনীরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমা করে দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করে আরো দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা দরিদ্রের সম্পদ চারিদিক থেকে গুটিয়ে ধনীর ভাঁড়ারে জমা করার জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার আবিস্কার করেছে। সে হাতিয়ারটি হচ্ছে সুদব্যবস্থা। এটি এমন একটি আপাতমধুর ব্যবস্থা যা দেখতে রংধনুর মত বর্ণিল কিন্তু বাস্তবে প্রবল জলোচ্ছাসের মত ভয়ানক ধ্বংসাত্মক। বাস্তবিকই এ ব্যবস্থা জলোচ্ছাসের খড়কুটোর ন্যায় গরিবের সম্পদগুলো ধনীর ভাণ্ডারের মহাসাগরে নিয়ে ফেলে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এত জটিল ও সূক্ষ্ম যে তা সাধারণ মানুষের জন্য মোটেও সহজবোধ্য নয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে পৃথিবীর সুবিধাভোগী এক শ্রেণীর মানুষ।

সবচেয়ে বড় বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, পৃথিবীর প্রায় সব মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, সুদ ছাড়া ব্যাংকি কর্মকাণ্ড অসম্ভব এবং ব্যাংক ছাড়া আধুনিক অর্থনীতি কল্পনা করা যায় না। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, সুদ ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব অর্থাৎ জীবনধারণই অসম্ভব। অথচ কুরআন ও হাদীসে সুদের বিরুদ্ধে যত কঠোর সতর্কবাণী ও নিকৃষ্ট ভাষায় নিন্দাবাণী উচ্চারিত হয়েছে অন্য কোনো পাপের বেলায় তা হয় নি। ঘোষণা হচ্ছে, "অতঃপর যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও (সূরা বাক্বারা: ২৭৯)।" ইরশাদ হচ্ছে, "সুদের মধ্যে ছত্রিশ প্রকারের পাপ রয়েছে: তন্মধ্যে সবচেয়ে লঘু পাপ হচ্ছে, নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য পাপ ()।" তাহলে কি ইসলাম একেবারে অসম্ভব একটি বিষয়ে এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল? এ প্রশ্নটি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করা সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

www.pathagar.com

ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া আধিপত্ববাদের বিরুদ্ধে এক সময় পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিল সমাজতন্ত্র। দুটোরই জন্মস্থান পাশ্চাত্যে। কিন্তু পুঁজিবাদের সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্য খর্ব করে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্র যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা ছিল মানব প্রকৃতি বহির্ভূত। ফলে সে পুঁজিবাদের ভিত তো কাঁপাতে পারেই নি বরং নিজেই এখন অস্তিত্বের মানচিত্র থেকে বিলীন হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

পাশ্চাত্যে এ দুটি মতবাদ সৃষ্টি হওয়ার বহু আগেই পৃথিবীতে এসেছিল ইসলাম। ইসলাম মানব প্রকৃতির ধর্ম এবং বিশ্ব মানবতার ধর্ম। অর্থাৎ মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল রীতিনীতি এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য শান্তি নিরাপত্তা ও সাম্যের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম পৃথিবীতে বৈষম্য ও অশান্তি কোনোভাবেই অনুমোদন করে না। সুতরাং মানব প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিংবা অসম্ভব পালনীয় বা বৈষম্য সৃষ্টিকারী কোনো বিষয়ের নির্দেশ ইসলাম দেয় নি এবং দিতে পারে না। এটাই চিরন্তন সত্য।

বস্তুত ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন সবধরণের প্রান্তিকতামুক্ত এবং অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের মাঝামাঝি অবস্থান দিয়ে চলে। এখানে পুঁজিবাদের ন্যায় সম্পদ চারিদিক থেকে গুটিয়ে একত্রে পুঞ্জীভূত হওয়ার সুযোগও নেই আবার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য সমাজতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পদ কেড়ে নেয়ার জুলুমও নেই। সম্পদ আহরণের জন্য বল্গাহীন স্বাধীনতাও ইসলাম অনুমোদন করে না যা একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ আবার সম্পদের মালিক হওয়ার মানবিক দাবিও অস্বীকার করে না যা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল নিয়ামক। ইসলাম এমন একটি সুষম অর্থনৈতিক দর্শন পেশ করেছে যা একদিকে মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি দেয় অপরদিকে মানুষকে সম্পদশালী হতেও বাধা প্রদান করে না। এভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ইসলামের এ সুন্দর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুলাফায়ে রাশেদীনের পর পৃথিবীতে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ফলে এর বাস্তব নমুনা এবং তার সুফল পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পারে নি। এখন এটা কেবল তাত্ত্বিক দর্শন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। তবে আজকের এ অশান্ত পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে বিশেষত

www.pathagar.com

অসংখ্য প্রান্তিক আয়ের মানুষের মুখে দুবেলার অন্নের ব্যবস্থা করতে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন মুসলমানদের এ সত্য উপলব্ধি করার এবং পৃথিবীতে এ সুন্দর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার তাওফীক দান করেন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলানুগ অনুবাদের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থনীতিশাস্ত্র বিশেষত ব্যবসায়নীতি আধুনিক কালের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল একটি বিষয়। এ বিষয়ের সাথে আমাদের ঘনিষ্ট যোগসূত্র নেই। তদুপরি বইটি উর্দু ভাষায় রচিত এবং এর উর্দু পরিভাষাগুলো বাংলায় রূপান্তর করা অত্যন্ত দূরহ কাজ। অর্থনীতির উর্দু পরিভাষার শব্দগুলো অর্থনীতির বাংলা পরিভাষায় রূপান্তর করার চেষ্টা করেছি। সেক্ষেত্রে শাব্দিক অনুবাদ সম্ভব হয় নি। গ্রন্থটি যেহেতু পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে রচিত তাই প্রসঙ্গক্রমে স্থানীয় পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় পরিভাষায় বিষয়টি বোঝার জন্য টীকা সংযোজন করে বাংলায় তার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। কোথাও প্রসঙ্গক্রমে পাকিস্তানের কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও সেই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে কোনগুলো এবং তার নাম ও পরিচয় টীকায় উলেখ করা হয়েছে।

অনুবাদ কর্মটি সুন্দর ও সহজবোধ্য করার চেষ্টায় ত্রুটি করা হয় নি। এখন এর সাফল্যের মূল্যায়ন বিজ্ঞ পাঠকের কাছে সমর্পিত। পূর্ণ সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে ভুলগুলো আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা তা আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করব এবং পরবর্তীতে শুধরে নিব ইনশাআল্লাহ।

বইটি মাকতাবাতুল আযহার থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এজন্য আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তায়ালা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইটি পড়ে পাঠকবর্গ সামান্য উপকৃত হলেও আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব। পাঠকবর্গের নিকট দুআর সনির্বন্ধ অনুরোধ, আল্লাহ যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আখেরাতের সামান হিসেবে কবুল করেন। আমিন।

৮/ ১১/ ২০০৯

শামসুল আলম
২৮/৬ নিউ ইস্কাটন

www.pathagar.com

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ১৩ |
| বিষয়বস্তুর পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা | ১৮ |
| অর্থনৈতিক দর্শন ও তার পর্যালোচনা | ২০ |
| মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা | ২০ |
| প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ (Determination of Priorities) | ২১ |
| সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Allocation of Resources) | ২১ |
| আয় বণ্টন (Distribution of Incame) | ২২ |
| উন্নয়ন (Development) | ২২ |
| ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা | ২৩ |
| সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Allocation of Resources) | ২৫ |
| ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি | ২৮ |
| ব্যক্তিমালিকানা (Private Property) | ২৮ |
| ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা (profit Motive) | ২৮ |
| সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ততা (Laissez Faire) | ২৮ |
| সমাজতন্ত্র | ৩০ |
| সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতি | ৩৩ |
| সমষ্টিক মালিকানা (Collective Property) | ৩৩ |
| পরিকল্পনা (Planning) | ৩৩ |
| সমষ্টিক স্বার্থ (Collective Interest) | ৩৪ |
| আয়ের সুষম বণ্টন (Equitable Distribution of Income) | ৩৪ |
| উভয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা | ৩৫ |
| সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা | ৩৫ |
| ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা | ৩৮ |
| অর্থনীতির ইসলামী বিধান | ৪৩ |
| খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ | ৪৫ |
| রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ | ৪৬ |
| নৈতিক বিধি-নিষেধ | ৪৮ |
| বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন | ৫১ |
| সম্পদ উৎপাদন (Production of Wealth) | ৫১ |
| সম্পদ বণ্টন (Distribution of Wealth) | ৫১ |
| সম্পদ বিনিময় (Exchange of Wealth) | ৫১ |
| সম্পদ ভোগ (Consumption of Wealth) | ৫১ |
| উৎপাদন ও বণ্টনের পুঁজিবাদী দর্শন | ৫২ |
| ভূমি (Land) | ৫২ |
| শ্রম (Labour) | ৫২ |


www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| মূলধন (Capital) | ৫২ |
| সংগঠক (Entrepreneur) | ৫২ |
| সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন | ৫৪ |
| ইসলামী শিক্ষা | ৫৫ |
| সম্পদ উৎপাদনের উপর ব্যবস্থাত্রয়ের সামগ্রিক প্রভাব | ৫৮ |
| সম্পদ বণ্টনের উপর ব্যবস্থাত্রয়ের প্রভাব | ৬০ |
| ব্যবসায়েরপ্রকারভেদ (মালিকানা হিসেবে) (Different kinds of Business) | ৬৪ |
| কোম্পানির সংজ্ঞা | ৬৪ |
| কোম্পানি গঠন | ৬৬ |
| কোম্পানির মূলধন | ৬৭ |
| কোম্পানির অংশ (শেয়ার) | ৬৯ |
| কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কাঠামো | ৭১ |
| মুনাফা বণ্টন | ৭২ |
| লিমিটেড কোম্পানির ধারণা | ৭৩ |
| প্রাইভেট কোম্পানি | ৭৪ |
| অংশীদারিত্ব ও কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য | ৭৪ |
| কোম্পানির তহবিল সংগ্রহ | ৭৫ |
| সনদ (Bond) | ৭৭ |
| ডিবেঞ্চার | ৭৮ |
| ইজারা | ৭৮ |
| কোম্পানির হিসাব-নিকাশ | ৭৯ |
| ব্যালান্স শিট (Balance Sheet) | ৭৯ |
| সম্পত্তিসমূহ | ৮০ |
| চলতি মূলধন (Current Assets) | ৮০ |
| স্থাবর সম্পত্তি (Fixed Assets) | ৮০ |
| অবস্তু সম্পত্তি (Intangible Assets) | ৮০ |
| নিট মূলধন | ৮১ |
| লাভ-লোকসানের পরিমাপ | ৮১ |
| শেয়ার বাজার (Stock Exchange) | ৮৩ |
| পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা | ৮৩ |
| মেম্বারশিপ | ৮৪ |
| স্টক এক্সচেঞ্জে দালালি | ৮৪ |
| মার্কেট অর্ডার (Market Order) | ৮৫ |
| লিমিটেড অর্ডার (Limited Order) | ৮৫ |
| স্টপ অর্ডার (Stop Order) | ৮৫ |
| শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ | ৮৫ |
| শেয়ার ক্রেতার শ্রেণীবিভাগ | ৮৫ |


www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া | ৮৬ |
| নগদ বিক্রি (Spot Sale) | ৮৬ |
| Sale On Margin | ৮৬ |
| Short Sale | ৮৭ |
| নগদ ও অগ্রিম ক্রয় | ৮৭ |
| পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নগদ ও অগ্রিম বিক্রি | ৮৮ |
| ফটকাবাজি (Speculation) | ৮৯ |
| الخيارات (Options) | ৯০ |
| পুঁজিবাজার السوق المالية (Financial Market) | ৯১ |
| শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানি | ৯৩ |
| শরীয়তে 'আইনগত সত্তার' দৃষ্টান্ত | ৯৪ |
| সীমিত দায়ের শরয়ী ভিত্তি | ৯৬ |
| লিমিটেড কোম্পানির ফিকহী দৃষ্টান্ত | ৯৮ |
| কোম্পানির কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয় | ৯৮ |
| অবলেখন (Under Writing)-এর শরয়ী ভিত্তি | ৯৮ |
| শেয়ারের শরয়ী ভিত্তি ও তার ক্রয়-বিক্রয় | ১০০ |
| শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী | ১০১ |
| শেয়ার ব্যবসার (Capital Gain) হুকুম | ১০৬ |
| শেয়ারের উপর যাকাত | ১১০ |
| অর্থব্যবস্থা (Monetary System) | ১১৪ |
| অর্থের (Money) সংজ্ঞা | ১১৪ |
| অর্থ ও মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য | ১১৪ |
| মুদ্রার ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা | ১১৫ |
| বিনিময় হার নির্ধারণ | ১১৮ |
| ব্রেটন উডস সম্মেলনের তিন সংস্থা | ১১৯ |
| আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল | ১২১ |
| বিশ্বব্যাংক | ১২৩ |
| ব্রেটন উডসের মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা | ১২৩ |
| ব্রেটন উডস ব্যবস্থার পতন | ১২৫ |
| কাগজী নোটের ভিত্তি ও তার ফিকহী বিধান | ১২৬ |
| নোটের ফিকহী ভিত্তি | ১২৭ |
| মুদ্রার মূল্যমান মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন এবং মূল্য সূচক | ১৩১ |
| মূল্য সূচক | ১৩২ |
| দেনা পরিশোধে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব | ১৩৩ |
| ব্যাংকিং (Banking) | ১৩৯ |
| ব্যাংকের সংজ্ঞা | ১৩৯ |


www.pathagar.com

ব্যাংকের ইতিহাস ১৩৯
ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ১৩৯
চলতি হিসাব (Current Account) ১৩৯
সঞ্চয়ী হিসাব (Saving Account) ১৪০
স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) ১৪০
ব্যাংকের কার্যাবলী ১৪১
অর্থের যোগান (Financing) ১৪১
ঋণদানের প্রক্রিয়া ১৪১
ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ (বিনিয়োগ হিসেবে) ১৪৩
কৃষি ব্যাংক ১৪৩
শিল্প ব্যাংক ১৪৩
উন্নয়ন ব্যাংক ১৪৩
সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank) ১৪৩
বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank) ১৪৪
বাণিজ্যিক ব্যাংক ১৪৪
আমদানি রপ্তানিতে ব্যাংকের ভূমিকা ১৪৪
এল সি-এর উপর ফিস ১৪৬
ওকালত (Agency) ১৪৬
জামানত (Guarantee) ১৪৬
ঋণ (Credit) ১৪৬
বিল অব এক্সচেঞ্জ ১৪৮
মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টির কাজ ১৪৯
কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) ১৫৩
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions) ১৫৩
ট্রেজারি বিল ১৫৫
অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ১৫৮
উন্নয়ন ঋণদান সংস্থা (Development Financial Institutions) ১৫৮
এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (A.D.B.P) ১৫৯
সমবায় সমিতি (Co-operative Society) ১৫৯
লিজিং কোম্পানি ১৫৯
ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (N.I.T) ১৫৯
ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান (I.C.P) ১৫৯
সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা ১৬১
ব্যাংকিংয়ের শরীয়তসম্মত পন্থা ১৬৩
ব্যাংক ও ডিপোজিটরের সম্পর্ক ১৬৩

www.pathagar.com

ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ১৬৬
শিরকাত ও মুদারাবা ১৬৬
শিরকাত ও মুদারাবার সমস্যা ১৬৭
ইজারা ১৬৯
মুরাবাহা মুআজ্জালা ১৭০
প্রচলিত মুরাবাহার মধ্যে শরয়ী ত্রুটিসমূহ ১৭১
ঋণের দলিল ১৭৩
ঋণ পরিশোধের বিলম্বে জরিমানা ১৭৫
সময়ের পূর্বে পরিশোধ করায় ঋণ কমিয়ে দেয়া ১৭৭
ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির শাখাগত সমন্বয় ১৭৮
আমদানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ১৭৯
রপ্তানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ১৮০
اعادة تمويل الصادرات-এর হুকুম ১৮৫
ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরয়ী হুকুম ১৮৬
ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান (I.C.P) ১৯০
স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ফাইন্যান্স করপোরেশন ১৯০
হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (H.B.F.C) ১৯০
বিমা (Insurance) تامين ১৯৩
বিমার বিকল্প ১৯৮
সরকারি অর্থব্যবস্থা (Public Financing) ১৯৯
ব্যয় ২০১
চলতি (Current) ব্যয় ২০১
স্থায়ী ব্যয় ২০১
আয় ২০১
কর রাজস্ব আয় ২০১
প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) ২০১
পরোক্ষ কর (Indirect Tax) ২০১
কর বহির্ভূত আয় ২০২
ঘাটতি ও ঘাটতি পূরণ ২০২
বৈদেশিক ঋণ (Foreign Loans) ২০৩
অভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal Loans) ২০৩
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (Non Banking Loans) ২০৩
ব্যাংক ঋণ (Banking Loans) ২০৩
স্থায়ী ঋণ (Permanent Loans) ২০৩
ভাসমান ঋণ (Floating Loans) ২০৪
স্বল্পমেয়াদী ঋণ (Unfunded Loans) ২০৪
ঘাটতি পূরণের বিকল্প পদ্ধতি ২০৫

www.pathagar.com

# ভূমিকা

বর্তমান যুগে ব্যাপক পরিমণ্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেনের নতুন নতুন প্রকৃতি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন মাসআলা সৃষ্টি করেছে। যার উপর বিশ্বব্যাপী চিন্তা গবেষণা চলছে এবং তার বিভিন্ন সমাধান পেশ করা হচ্ছে। এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে এর উপর শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

আলহামদু লিল্লাহ, কিছুদিন থেকে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুসলমানদের প্রতি চাপিয়ে দিয়েছে তার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ইসলামী আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে তারা সচেষ্ট হচ্ছে। আল্লাহর ফযলে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পর্যায়ে এ চিন্তা ইসলামী দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেসব মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি দ্বীনের উপর আমল করার জযবা রাখেন তারা তাদের কারবার যথাসম্ভব ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করতে চান। আর সমষ্টিগত পর্যায়েও বিভিন্ন দেশে অর্থনীতিকে ইসলামী বিধান অনুসারে পরিচালনা করার চেষ্টা চলছে।

এ উভয় শ্রেণীর প্রচেষ্টার জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী ফিকায় অভিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের দিকনির্দেশনার অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের যুগে উলামায়ে কিরাম ও আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝখানে এমন একটি অন্তরাল সৃষ্টি হয়েছে যে, উভয়ের চিন্তার ধরন, তাদের ভাষা এবং পরিভাষা এতটা ভিন্ন যে, একে অন্যের কথা বুঝতেও কষ্ট হয়। এ কারণে এ মাসআলাগুলোর উপর পরস্পর আলোচনা পর্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার আদান প্রদানে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে।

অন্তত অর্থনৈতিক মাসআলার ক্ষেত্রে এ দূরত্ব দূর করার জন্য উভয় শ্রেণীর পরস্পরকে কাছে আনতে এবং উভয়ের মাঝে পরস্পর বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ত করতে 'মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দারুল উলূম করাচীর কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছে। কিছু প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনীতির অন্যান্য বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য। এ সকল কোর্সের মধ্যে তাদেরকে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পর্কিত মৌলিক ইসলামী বিধান সম্পর্কে অবগত করানো হয়েছে। আল্লাহর ফযলে এ কোর্স অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কারণ এ সকল কোর্সে অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট শত শত উচ্চ শিক্ষিত লোক অত্যন্ত আগ্রহ এবং গভীর নিষ্ঠার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা অবগত হয়েছেন আপন আপন বিভাগ সম্পর্কিত মৌলিক ইসলামী বিধান সম্পর্কে। এসব কোর্সের ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

অন্যদিকে কিছু কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে উলামায়ে কিরাম বিশেষত ফতোয়ার কাজের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য। এ সকল কোর্সের মধ্যে তাদেরকে অর্থনীতির বর্তমান ধারণা এবং আধুনিক কালে ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের যে মাসআলাগুলো সরাসরি ফিকাহর সাথে সম্পৃক্ত তার বর্তমান অবস্থা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে যেন তাদের গোচরে এসে যায়। যাতে তারা সেটা পুরোপুরিভাবে বুঝে তার ফিকহী বিধান ব্যাখ্যা করতে পারেন।

এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের পুরো অর্থনীতি বা পুরো ব্যবসায়নীতি শেখানোর প্রয়োজন ছিল না; বরং উভয় বিষয়ের শুধু নির্বাচিত বিষয়গুলোই যথেষ্ট ছিল, যা তাদের আলোচিত প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারে। অন্যদিকে তাদের সামনে এ বিষয়গুলো বোঝানোর জন্য এমন একজন ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, যিনি তাঁদের পরিচিত ঢংয়ে এবং তাঁদের নিজের ভাষায় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করবেন।

সুতরাং কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভের পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এ পাঠদানের দায়িত্ব আমি নিজে পালন করব। যাতে উল্লিখিত দুটি প্রয়োজনই পূর্ণ হয়। কিন্তু যেহেতু অর্থনীতি ও ব্যবসায়নীতি আমার গবেষণার বিষয় নয়, তাই আমার দুজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কাছে আবেদন জানালাম, তাঁরা যেন আমাকে একটু সাহায্য করতে ক্লাসে উপস্থিত থাকেন। যাতে করে আমি কোথাও ভুল করলে তারা শুধরে দেন। প্রয়োজনের সময় বিস্তারিত ব্যাখ্যাও পেশ করতে পারেন।

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে একজন হলেন জনাব ডক্টর আরশাদ জামান সাহেব, যিনি আমাদের দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমাদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের চিফ ইকোনোমিস্ট পদে আসীন ছিলেন। তিনি পুরো কোর্সে –যা ১৪১৩ হিজরীর রজব মাসে প্রায় চার সপ্তাহ ধরে দারুল উলূম কুরঙ্গিতে চলছিল– স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উপকৃত করেছেন। বিশেষত বিনিময় হারের বিভিন্ন ব্যবস্থার পরিচয় এবং সরকারি অর্থ ব্যবস্থার উপর তিনি লেকচারও দিয়েছেন।

অন্যজন হলেন জনাব সাইয়িদ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব, যিনি আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। এ নামে তিনি সারা দেশে পরিচিত। বর্তমানে তিনি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস-এর চেয়ারম্যান এবং মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামীর ভাইস চেয়ারম্যান। তিনিও কোর্সের অনেক সময় জুড়ে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে ও প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। বিশেষত কোম্পানির হিসাবের উপর তিনি যথারীতি লেকচার দিয়েছেন।

এ দুজনের উপস্থিতি আমার জন্য সাহস ও উৎসাহের কারণ হয়েছে। এভাবে আল্লাহর ফযলে এ কোর্স সাফল্যের সাথে শেষ হয়েছে।

এটি যেহেতু একটি পর্যবেক্ষণধর্মী কোর্স ছিল, তাই তা দারুল উলূমের শিক্ষক ও তাখাছ্ছুছের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। তবে ফয়সালাবাদ থেকে দারুল উলূমের ইফতা বিভাগের ফাযেল, বর্তমানে জামিয়া ইমদাদিয়ার মুহাদ্দিস ও মুফতি মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ মুজাহিদ সাহেবও অংশগ্রহণ করেন। তিনিই পুরো কোর্স টেপরেকর্ডারের সাহায্যে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেছেন।

যেহেতু উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীগণ এ কোর্সের খুব উপকারিতা উপলব্ধি করেছেন, তাই পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৪১৪ হিজরীর জুমাদাল উলায় এ ধরনের আরো একটি কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেয়া হয় দেশের উল্লেখযোগ্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং মুফতিদেরকেও। সুতরাং এ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ডেরা ইসমাঈল খান থেকে শুরু করে করাচী পর্যন্ত বিশিষ্ট দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, মুফতি এবং উলামায়ে কিরাম দারুল উলূম কুরঙ্গিতে তাশরিফ আনেন। বাইরে থেকে আগতদের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ জন। তাদের সুবিধার জন্য দরসের

www.pathagar.com

প্রতিদিনের সময় বৃদ্ধি করে কোর্সকে দুই সপ্তায় সংকুচিত করা হয়। এবারও এ খেদমত আমি পালন করি। দরসের শেষে পরীক্ষাও হয়। মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামীর পক্ষ থেকে সনদও প্রদান করা হয়।

এ দ্বিতীয় কোর্সের সময় আমার আগের অভিজ্ঞতা এবং নতুন অবস্থার আলোকে দরসের আলোচনা ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোজন বিয়োজনেরও সুযোগ হয়। আল্লাহর রহমতে এ দ্বিতীয় কোর্স আগের তুলনায় আরো বেশি সফল হয়।

বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ থেকে এ আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়। যাতে এ কোর্সে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেন নি তারাও এর থেকে উপকৃত হতে পারেন। সে সাথে এ বক্তৃতামালা একটি স্বতন্ত্র উপকারী বস্তুও হতে পারে। আমি আমার বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এ সব বক্তৃতা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে অপারগ ছিলাম। সুতরাং মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ মুজাহিদ সাহেব টেপরেকর্ডারের সাহায্যে যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন তা প্রকাশ করাই উপযুক্ত মনে হল। সুতরাং এ মুহূর্তে আপনাদের সামনে যে গ্রন্থটি রয়েছে, তা মূলত সে বক্তৃতামালাই যা টেপরেকর্ডারে ধারণ করা হয়েছিল। তবে আমি তাতে সম্পাদনা করে উপযুক্ত সংযোজন সংশোধন করে দিয়েছি। এখন তা আল্লাহর নামে প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে এ লেখার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখা জরুরি:

১. এটি যথারীতি প্রণীত কোনো গ্রন্থ নয়; বরং ধারাবাহিক বক্তৃতার সংকলন। মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ মুজাহিদ সাহেব এ বক্তৃতাগুলো শব্দে শব্দে বিন্যাস করেন নি। বরং বক্তৃতার সারাংশ এবং মূল বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং বর্ণনার সংক্ষিপ্ত ঢং অবলম্বিত হয়েছে। জনাব মাওলানা দীর্ঘ আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত শব্দ ও ভাবের মধ্যে সংকুচিত করার চেষ্টা করেছেন। এ কারণে সাধারণ পাঠকবর্গ কোথাও হয়ত দুর্বোধ্যতা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা, বিজ্ঞ পাঠক তা একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বুঝতে কষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ।

২. এ বক্তৃতাগুলোর সরাসরি সম্বোধিত ছিলেন উলামায়ে কিরাম। তাই বিশেষভাবে ফিকহী আলোচনার মধ্যে ফিকহী পরিভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিষয়বস্তুও নির্বাচন করা হয়েছে তাদের প্রয়োজন বিবেচনা করে।

www.pathagar.com

৩. যদিও এ পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিচয় দেয়া। যাতে উলামায়ে কিরামের জন্য এ মাসআলার উপর চিন্তা-ভাবনা এবং অনুসন্ধানী পর্যালোচনা করা সহজ হয়। কিন্তু যেহেতু পেছনের প্রায় দশ বার বছর যাবৎ এ বিষয়টি আমার নিজের চিন্তা-গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল, তাই দরসে অংশগ্রহণকারীদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এসব মাসায়িলের ব্যাপারে আমি আমার নিজের গবেষণার সারাৎসার যেন তাদের খেদমতে পেশ করি। তাই আমি এসব মাসায়িলের উপর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতেও আলোচনা করেছি।

এ আলোচনার ব্যাপারে আমি দরসে অংশগ্রহণকারীদের স্পষ্ট করে দিয়েছিলাম, এর গুরুত্ব কেবল একটি ভাবনা মাত্র। বিজ্ঞজনদের এর উপর চিন্তা ভাবনা করার জন্য তা পেশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে অনেক মাসায়িল আছে যার সুস্পষ্ট বিধান কুরআন সুন্নাহ বা ফিকাহর মধ্যে বর্তমান নেই। এ কারণে সে ব্যাপারে সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধানী গবেষণা পর্যালোচনা এবং আবিষ্কার উদ্ভাবনের প্রয়োজন। সুতরাং এ বক্তৃতামালার মধ্যে যে কোনো মাসআলার ব্যাপারে ফিকহী পর্যালোচনা করা হয়েছে তা এ বিষয়ের শেষ কথা নয়। এ মাসআলা আলোচনায় আনা হয়েছে, যাতে তার উপর আলোচনা পর্যালোচনার পথ উন্মুক্ত হয়। এ চিন্তা অবশ্যই আমার ব্যক্তিগত রুচি ও আকর্ষণের দর্পণ। তাকে প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে আমার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ফতোয়া মনে করা উচিৎ হবে না।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখে গ্রন্থটি পাঠ করলে আশা করি কেউ উপকার থেকে বঞ্চিত হবেন না ইনশাআল্লাহ। বিজ্ঞ আলেমগণ গ্রন্থটি পাঠ করে যদি এসব মাসআলার উপর– বর্তমানে পুরো মুসলিম বিশ্ব যার মুখোমুখি– মুসলিম জাতির পথনির্দেশের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহলে আমি মনে করব, আল্লাহর ফযলে এ শ্রম সার্থক হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাঁর দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। তার উপর আমল করার এবং ধরাপৃষ্ঠে তা কার্যকর করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

২১ যিকাদাহ ১৪১৪ হিজরী

মুহাম্মদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম, করাচী-১৪

www.pathagar.com

# বিষয়বস্তুর পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

এ ক্লাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আধুনিক লেনদেনগুলো যে পদ্ধতিতে বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত সে সম্পর্কে ছাত্রদের ন্যূনতম প্রাথমিক ধারণা দেয়া। যাতে এ লেনদেনের প্রকৃত অবস্থা বুঝে সে ব্যাপারে শরয়ী বিধান উদঘাটন করা যায়। আপনারা জানেন, ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন :

من جهل باهل زمانه فهو جاهل (شرح عقود رسم المفتى ص: ٩٨)

–যে ব্যক্তি তার সমকালীনদের সম্পর্কে অজ্ঞ (অর্থাৎ সমকালীনদের জীবনপদ্ধতি, তাদের সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং তাদের রুচি ও স্বভাব সম্পর্কে অবগত নয়), সে মূর্খ।

একজন আলেমের জন্য কুরআন হাদীসের বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া যেমন জরুরি, যুগপ্রথা এবং সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে জানাও তেমন জরুরি। এ ছাড়া শরয়ী মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না। হযরত ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শায়বানী রাহ.-এর জীবনীতে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়, ফিকাহ সংকলনের সময় তিনি নিয়মিত বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে বসতেন, তাদের লেনদেন বুঝতেন। বাজারে কী ধরনের প্রথা চালু আছে তা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। বলাবাহুল্য, নিজে ব্যবসা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কেবল ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক রীতিনীতি ও প্রথাগুলো জানার জন্য তাদের কাছে গিয়ে বসতেন। কারণ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া একজন আলেম বিশেষত একজন ফকীহ ও মুফতির অত্যাবশ্যক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তাঁর নিকট যদি এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন আসে তখন যেন তিনি প্রশ্নের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হয়ে উত্তর দিতে পারেন। তাছাড়া তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন না। বরং এমনও বলা হয়েছে, যখন কোনো এলাকা বা সমাজে নাজায়েয কারবার বৃদ্ধি পায়, তখন যেহেতু একজন আলেম ও মুফতি কেবল ফতোয়া প্রদানকারীই নন; বরং তিনি একজন দাঈও। তাই তাঁর কাজ এ সীমা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয় না যে, তিনি শুধু বলে দেবেন, অমুক কাজ নাজায়েয ও হারাম। বরং একজন দাঈ হিসেবে কাজটি নাজায়েয ও হারাম ঘোষণা করে তার বিকল্প হালাল পদ্ধতিও বলে দেয়া তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। সে বিকল্প পদ্ধতিটি

www.pathagar.com

বাস্তবায়নযোগ্য হতে হবে, আবার শরয়ী বিধান অনুযায়ীও হতে হবে। হযরত ইউসুফ আ. এর কাহিনী কুরআন কারীমে আলোচিত হয়েছে। তাঁর কাছে জেলখানায় যখন বাদশার পয়গাম পৌঁছে এবং তাঁর কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হয়, তখন হযরত ইউসুফ আ. সাত বছরব্যাপী দুর্ভিক্ষ আসছে– স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা পরে বলেছিলেন। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলার আগে এ দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের পথ নির্দেশ করেন। সুতরাং বলা হয়েছে :

فما حصدتم فذروه فى سنبله الا قليلا مما تأكلون

–অতপর যা কাটবে তার মধ্যে থেকে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষসমেত রেখে দেবে। (সূরা ইউসুফ: ৪৭)

এ আয়াত থেকে ইস্তিম্বাত (উদঘাটন) করা হয়েছে, হকের দাঈ কেবল হারাম কাজকে হারাম ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হবেন না বা কোনো বিপদের কথা জানিয়ে দিয়েই বসে থাকবেন না যে, এ বিপদ আসছে। বরং নিজ সাধ্যমতো তা থেকে মুক্তির পথও বলে দেবেন। আর এ পথ সম্পর্কে তখনি বলা যাবে যখন মানুষ লেনদেন ও তার স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হবে। এ বিবেচনা থেকে আধুনিক লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়টি তাখাসসুসের নেসাবে একটি ঘণ্টা অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি মনে করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে এবং এর অনেক বিশেষজ্ঞ গবেষকও রয়েছেন। এখানে পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতি শাস্ত্র পড়ানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এ শাস্ত্রের ওইসব অংশের সাথে পরিচিত করানো উদ্দেশ্য, যেগুলো একজন আলেম ও ফকীহের ফকীহ হিসেবে প্রয়োজন হয় এবং যে সম্পর্কে সচরাচর প্রশ্নও আসে ও তার উত্তর খোঁজার দরকার হয়। সাধারণত মাসআলার অনুসন্ধানী পর্যালোচনার জন্য যে বিষয়গুলো প্রয়োজন হয় সে ব্যাপারে অর্থনীতিতে অভিজ্ঞ একজন আলেম অবগত থাকেন না। এ কারণে আমি নিজেই এ পাঠদানের ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

# অর্থনৈতিক দর্শন ও তার পর্যালোচনা

বর্তমান বিশ্বে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো প্রচলিত আছে তার মধ্যে দুটি ব্যবস্থা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এক. ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Capitalism), যাকে আরবীতে বলা হয় 'الرأسمالية'; দুই. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Socialism), আরবীতে যাকে বলা হয় 'الاشتراكية'। এরই চূড়ান্ত রূপ সাম্যবাদ (Communism), যাকে আরবীতে বলা হয় 'الشيوعية'। বিশ্বে যত কারবার বা লেনদেন হচ্ছে, তা এ দুই ব্যবস্থার অধীনেই হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সমাজতন্ত্র যদিও একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং সে সাথে তার অর্থনৈতিক দর্শনও দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু একটি অর্থনৈতিক দর্শন হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য দর্শনের মধ্যে এখনো তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ কারণে তার সম্পর্কে জানাও জরুরি। সুতরাং সর্বপ্রথম এ দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় তুলে ধরা হল। তারপর তার মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণগুলো উল্লেখ করা হবে।

## মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

সর্বপ্রথম জানা প্রয়োজন অর্থনীতি কী? তার মৌলিক সমস্যাগুলো কী? আজ যাকে আমরা 'معاشيات' (অর্থনীতি) বলি, সেটা মূলত ইংরেজি শব্দ ইকোনোমিকস (Economics)-এর অনুবাদ। মূলত ইকোনোমিকসের সঠিক অর্থ 'মাআশিআত' (অর্থনীতি) নয়। বরং এর সঠিক অর্থ আরবী শব্দ 'اقتصاد' দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। এ শব্দ থেকেই প্রতীয়মান হচ্ছে, সকল অর্থনৈতিক দর্শনে, স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, 'মানুষের অভাব ও চাহিদা মানবীয় উপকরণের তুলনায় বেশি'। আর বর্তমান অর্থনীতিতে 'অভাব' শব্দটি যখন ব্যবহার হয়, তখন 'চাহিদা' শব্দটিও তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। মোট কথা, মানবীয় উপকরণ সীমিত আর তার মোকাবেলায় অভাব ও চাহিদা অনেক বেশি। এখন প্রশ্ন, সীমাহীন অভাব ও চাহিদা সীমিত উপকরণ দ্বারা কিভাবে পূরণ করা সম্ভব?

'ইকতিসাদ' ও 'ইকোনোমিকস' অর্থ হচ্ছে, সীমিত উপকরণগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে তা দ্বারা যতদূর সম্ভব বেশি প্রয়োজন

www.pathagar.com

মেটানো যায়। এ কারণে অর্থনীতি শাস্ত্রকে ইংরেজিতে 'ইকোনোমিকস' এবং আরবীতে 'ইকতিসাদ' বলা হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যেক অর্থনৈতিক দর্শনে কিছু মৌলিক সমস্যা থাকে যা সমাধান না করে সে অর্থনীতি চলতে পারে না। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, এ মৌলিক সমস্যা চারটি।

## এক. প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ (Determination of Priorities)

প্রথম সমস্যা যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ' বলা হয়, তার সারকথা হল, মানুষের অভাব ও চাহিদা অগণিত, কিন্তু তার তুলনায় উপকরণ সীমিত। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, এ সীমিত উপকরণ দ্বারা সকল অভাব ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। অতএব কিছু অভাব ও চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, আর কিছুকে পেছনে রাখতে হবে। কিন্তু কোন অভাবটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কোন অভাবটিকে পেছনে রাখতে হবে এটা একটা জটিল প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়। যেমন আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা আছে। এ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আটা চালও কিনতে পারি, কাপড়ও কিনতে পারি। আবার কোনো হোটেলে বসে সেখিন খাবার খেয়েও ব্যয় করতে পারি। এ চার পাঁচটি অপশন (options) আমার সামনে আছে। এখন আমি এ পঞ্চাশ টাকা এসবের মধ্যে থেকে কোন কাজে ব্যয় করব? একে বলা হয় 'প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ'।

এ সমস্যা যেমন একজন মানুষের জীবনে দেখা দেয় ঠিক তেমনি পুরো দেশ এবং রাষ্ট্রের জীবনেও দেখা দেয়। যেমন মনে করুন, কোনো দেশের কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, কিছু মানব সম্পদ আছে, কিছু খনিজ সম্পদ আছে, কিছু উৎপাদিত সম্পদ আছে। এসব উপকরণ সীমিত। তার তুলনায় অভাব ও চাহিদা সীমাহীন। এখন নির্ধারণ করতে হবে, এসব উপকরণ কোন কাজে ব্যয় করা হবে, কোন জিনিসের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে? এ বিষয়টির নামই 'প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ'।

## দুই. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Allocation of Resources)

দ্বিতীয় সমস্যা হল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। আমাদের কাছে উৎপাদনের উপকরণ, অর্থাৎ মূলধন, শ্রম, ভূমি আছে। এগুলো আমরা কোন কাজে কী

www.pathagar.com

পরিমাণ ব্যবহার করব? ধরুন, আমাদের ভূমি আছে। এখন কতটুকু জমিতে আমরা গম আবাদ করব? কতটুকু জমিতে ধানের আবাদ করব? কতটুকু জমিতে তুলা চাষ করব? অথবা অনুরূপভাবে আমাদের কারখানা স্থাপনের যোগ্যতা আছে। এখন আমরা কাপড় কলও স্থাপন করতে পারি। জুতা তৈরির কারখানাও স্থাপন করতে পারি। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন কারখানাও স্থাপন করতে পারি। এখন কতগুলো কারখানা কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করব? আর কতগুলো জুতা তৈরিতে ব্যবহার করব? আর কতগুলো খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের কাজে ব্যবহার করব? এ প্রশ্নের মীমাংসাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার' বলা হয়।

## তিন. আয় বণ্টন (Distribution of Incame)

তৃতীয় সমস্যা হল, আয় বা উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত উপকরণগুলো কাজে লাগানোর পর তা থেকে যে উৎপাদন বা আয় হল, সেগুলো কিভাবে সমাজে বণ্টন করা হবে, কিসের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে? অর্থনীতির পরিভাষায় একেই বলে 'আয় বণ্টন'।

## চার. উন্নয়ন (Development)

চতুর্থ সমস্যা হল 'উন্নয়ন'। অর্থাৎ নিজের অর্থনৈতিক উৎপাদনগুলোকে কিভাবে উন্নত করা যায়? যাতে যে উৎপাদন হচ্ছে সেগুলো মানের দিক থেকে আগের তুলনায় আরো ভাল হয় এবং পরিমাণের দিক থেকে আরো বৃদ্ধি পায়। আর কিভাবে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও শিল্পদ্রব্য উদ্ভাবন করা যায় যাতে সমাজের উন্নয়ন হয়। মানুষের কাছে অর্থনৈতিক উপকরণ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষের আয়ের উপায় তাদের হস্তগত হয়। এ বিষয়কে অর্থনীতির পরিভাষায় 'উন্নয়ন' বলা হয়।

এ চারটি মৌলিক সমস্যা অর্থাৎ 'প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ', 'সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার', 'আয় বণ্টন' এবং 'উন্নয়ন'-এ চারটি সমস্যার সমাধান করা প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য জরুরি। প্রথমে বুঝতে হবে, এ সমস্যাগুলো যদিও প্রাকৃতিক সমস্যা, কিন্তু তাকে একটি দর্শনের অধীনে নিয়ে চিন্তা করা এবং তার সমাধান খুঁজে বের করার ভাবনা বিগত দিনগুলোতে বেশি হয়েছে। তারই ফলে দুটি পরস্পর বিরোধী দর্শন আমাদের সামনে এসেছে। একটি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Capitalism), আর অপরটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Socialism)।

www.pathagar.com

# ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা
# (Capitalism)

সর্বপ্রথম আমাদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝতে হবে, সে উপরোল্লিখিত চারটি মৌলিক সমস্যা কোন্ মূলনীতির ভিত্তিতে সমাধান করার দাবি করেছে? সেগুলো সমাধান করার জন্য কী দর্শন পেশ করেছে?

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বক্তব্য হল, এ চারটি সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র উপায় আছে। তা হল, প্রত্যেক মানুষকে ব্যবসায়িক ও শিল্পোৎপাদন তৎপরতার জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছেড়ে দিতে হবে। তাকে এ ব্যাপারে ছাড় দিতে হবে, সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য সে যে পদ্ধতি উপযুক্ত মনে করবে সেটাই গ্রহণ করতে পারবে। এর দ্বারা অর্থনীতির উপর্যুক্ত চারটি সমস্যাই আপনা আপনি সমাধান হয়ে যাবে। কারণ প্রতিটি মানুষ যখন চিন্তা করবে, আমি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করব, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে কাজই করবে সমাজে যার প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে চারটি সমস্যাই আপনা আপনি এক বিশেষ ভারসাম্যের সাথে সমাধান হতে থাকবে। এখন প্রশ্ন হল, এ চার সমস্যা কিভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হবে? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিঞ্চিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য :

১. মূলত এ পৃথিবীতে বহু প্রাকৃতিক বিধান কর্মরত আছে। যেগুলো সবসময় একই ধরনের ফলাফল সৃষ্টি করে। এ ধরনেরই একটি বিধান যোগান (Supply) ও চাহিদা (Demand)। যোগান বলা হয় বিক্রির উদ্দেশে বাজারে আনীত কোনো ব্যবসায়িক পণ্যের মোট পরিমাণকে। আর মূল্যের বিনিময়ে বাজার থেকে ক্রেতাদের ব্যবসায়িক পণ্য খরিদ করার আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় চাহিদা। যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক বিধান হল, বাজারে যে বস্তুর যোগান চাহিদার তুলনায় বেশি হয়, তার মূল্য হ্রাস পায়। আর যে বস্তুর চাহিদা তার যোগানের তুলনায় বেশি হয়, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। যেমন ধরুন, গরমের মওসুমে যখন গরম খুব বেশি পড়তে থাকে তখন বাজারে বরফের ক্রেতা বেড়ে যায়। যার অর্থ, বরফের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যদি বরফের মোট উৎপাদন বা বাজারে প্রাপ্ত বরফের মোট

www.pathagar.com

পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বরফের দাম বেড়ে যাবে। তবে সে সময় বরফের উৎপাদন যদি ততটুকু বৃদ্ধি পায় যতটুকু চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে দাম বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে শীতের সময় বরফের ক্রেতা কমে যায়। তার অর্থ, বরফের চাহিদা কমে গেছে। এখন যদি বাজারে বরফের মোট পরিমাণ চাহিদার তুলনায় বেশি হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে বরফের মূল্য কমে যাবে। এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। একে বলা হয় যোগান ও চাহিদাবিধি (Law of Demand and Supply)।

২. ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দর্শন বলে, প্রকৃতপক্ষে যোগান ও চাহিদার এ প্রাকৃতিক বিধিই কৃষি পেশার মানুষের জন্য নির্ধারণ করে, সে তার জমিতে কী উৎপাদন করবে। এ বিধিই নির্ধারণ করে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি কোন্ বস্তু কী পরিমাণ বাজারে আনবে। এভাবে অর্থনীতির উল্লিখিত চারটি সমস্যাই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যায়।

৩. যোগান ও চাহিদাবিধির মাধ্যমেও প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ হবে এভাবে : যদি আমরা প্রত্যেককে বেশি বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেই, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার মুনাফা অর্জনের তাগিদে সে বস্তুই বাজারে আনার চেষ্টা করবে যার প্রয়োজন বা চাহিদা বেশি হবে, যাতে সে তার চড়া দাম পায়। কৃষক সে বস্তুর উৎপাদনকে প্রাধান্য দেবে বাজারে যার চাহিদা অধিক হবে। শিল্পপতি সে শিল্পদ্রব্য তৈরি করতে চেষ্টা করবে বাজারে যার কাটতি বেশি হবে। কেননা তারা যদি এমন জিনিস বাজারে আনে যার চাহিদা কম, তাহলে তারা বেশি লাভ পাবে না। তার ফলাফল হবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদিও নিজের মুনাফার জন্য কাজ করছে, কিন্তু যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক শক্তি তাকে বাধ্য করছে সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করতে। এমনকি যখন কোনো দ্রব্যের উৎপাদন বাজারে তার চাহিদার সমপরিমাণ এসে যায় তখন সে দ্রব্য আরো উৎপাদন করা যেহেতু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির জন্য লাভজনক হবে না, তাই সে তার উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। এভাবে শুধু সে দ্রব্যই প্রস্তুত হবে, সমাজে যার প্রয়োজন রয়েছে। ততটুকু পরিমাণ প্রস্তুত হবে প্রকৃতপক্ষে যতটুকু তার প্রয়োজন পূরণে দরকার। এর নামই প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ।

www.pathagar.com

## ৪. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার (Allocation of Resources)

এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের সাথে। যখন কোনো ব্যক্তি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করে নেয়, তখন সে হিসেবে বিদ্যমান উপকরণগুলোকে বিভিন্ন কাজে লাগায়। সুতরাং যোগান ও চাহিদাবিধি যেমনিভাবে প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করে, তেমনিভাবে সাথে সাথে সম্পদ বণ্টনের কাজও আঞ্জাম দেয়। যার ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের উপকরণ, অর্থাৎ ভূমি মূলধন ও শ্রম সে কাজে ব্যবহার করে। যাতে সে এমন জিনিস বাজারে আনতে পারে যার চাহিদা বাজারে বেশি এবং তার লাভ বেশি হয়। সুতরাং যোগান ও চাহিদাবিধির মাধ্যমে সম্পদ বণ্টনের সমস্যাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয়ে যায়।

৫. তৃতীয় সমস্যা আয় বণ্টন। কতিপয় উৎপাদন কার্যক্রমের ফলে যে উৎপাদন বা আয় হল তা কিসের ভিত্তিতে সমাজে বণ্টন করা হবে? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বক্তব্য হল, যে আয় হবে তা সেসব উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হওয়া উচিৎ যারা উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করেছে। ধনতান্ত্রিক দর্শন অনুযায়ী এ উপাদান মোট চারটি :

১. ভূমি, ২. শ্রম, ৩. মূলধন, ৪. উদ্যোক্তা বা সংগঠক।

উদ্যোক্তা বা সংগঠক দ্বারা সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে প্রাথমিকভাবে কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্দেশে প্রথম তিন উপকরণকে এ কাজের জন্য একত্র করে এবং লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বক্তব্য হল, উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে যে আয় হবে তা বণ্টিত হবে এভাবে, ভূমিদানকারীকে দেয়া হবে ভাড়া। শ্রমিককে প্রদান করা হবে মজুরি। মূলধন সরবরাহকারীকে দেয়া হবে সুদ। আর এ উৎপাদন কার্যক্রমের মূল উদ্যোক্তা সংগঠককে দেয়া হবে লভ্যাংশ। অর্থাৎ ভূমির ভাড়া, শ্রমের মজুরি ও মূলধনের সুদ পরিশোধ করার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তাই হবে উদ্যোক্তার লভ্যাংশ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কিভাবে নির্ধারিত হবে, ভূমির ভাড়া কত প্রদান করা হবে, শ্রমের মূল্য কত দেয়া হবে, মূলধনের কি পরিমাণ সুদ দেয়া হবে। এসব প্রশ্নের উত্তরে পুঁজিবাদী দর্শন আবার সে যোগান ও চাহিদাবিধিকে উপস্থাপন করে। সে বলে, এ তিন উপকরণের বিনিময় তার

www.pathagar.com

চাহিদা ও যোগানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। এসব উপকরণের মধ্যে যে উপকরণের চাহিদা বেশি হবে তার বিনিময়ও তত বেশি হবে।

মনে করুন, যায়েদ একটি কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে যেহেতু এ শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা এবং সে-ই লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে উৎপাদনের উপকরণগুলো সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছে। এ কারণে অর্থনীতির পরিভাষায় তাকে সংগঠক (Entrepreneur) বলা হয়। এখন তার কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ভূমির। যদি তার কাছে ভূমি না থাকে তাহলে তা কারো থেকে ভাড়া নিতে হবে। ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ হবে জমির যোগান ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ জমি ভাড়াদানকারীর সংখ্যা যদি অনেক হয়, অর্থাৎ জমির যোগান বেশি এবং ভাড়া গ্রহণকারী তার তুলনায় কম হয়, অর্থাৎ চাহিদা কম হয়, তাহলে জমির ভাড়া কম হবে। আর যদি অবস্থা তার বিপরীত হয় তাহলে জমির ভাড়া বেশি হবে। এভাবে যোগান ও চাহিদাবিধি ভাড়া নির্ধারণ করে দেবে।

তারপর কারখানায় কাজের জন্য মজদুর প্রয়োজন হবে। অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে শ্রম বলা হয়– তার পারিশ্রমিক দিতে হবে। এ পারিশ্রমিকের পরিমাণও যোগান এবং চাহিদাবিধির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ বহু মজদুর যদি কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহলে তার অর্থ শ্রমের যোগান বেশি। সুতরাং তার পারিশ্রমিক কম হবে। কিন্তু যদি এ কারখানায় কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিকের সরবরাহ না থাকে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, তার যোগান কম। সুতরাং তাকে বেশি পারিশ্রমিক দিতে হবে। এভাবে পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে মজুরি এমন পর্যায়ে নির্ধারিত হবে যেখানে যোগান ও চাহিদা উভয় একত্র হয়।

তেমনিভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠাকারীর যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য মূলধনের প্রয়োজন হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এর উপর তাকে সুদ দিতে হবে। এ সুদের পরিমাণও নির্ধারিত হবে যোগান ও চাহিদাবিধির ভিত্তিতে। ঋণদাতা যদি বেশি থাকে তাহলে তার অর্থ হচ্ছে পুঁজির যোগান বেশি। সুতরাং অল্প সুদে কাজ চলে যাবে। কিন্তু যদি মূলধনের ঋণদাতা কম হয় তাহলে বেশি সুদ আদায় করতে হবে। এমনিভাবে সুদের পরিমাণও নির্ধারণ হবে যোগান এবং চাহিদার ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

যখন যোগান ও চাহিদার উল্লিখিত নিয়মে ভাড়া মজুরি ও সুদ নির্ধারিত হল, তখন কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে যে আয় হবে তার অবশিষ্ট অংশ উদ্যোক্তা লভ্যাংশ হিসেবে পাবে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয় বণ্টনের মৌলিক বিষয়টিও যোগান এবং চাহিদাবিধির আওতায় সম্পন্ন হয়।

৬. অর্থনীতির চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে উন্নয়ন। অর্থাৎ সব অর্থনীতির জন্য জরুরি হল, সে তার উৎপাদনের অগ্রগতি নিশ্চিত করবে এবং পরিমাণ ও মানের দিক থেকে তার উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শন অনুযায়ী এ সমস্যাও যোগান এবং চাহিদার ভিত্তিতে সমাধান হয়। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যখন বেশি বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে, তখন যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক বিধানই তাকে নতুন নতুন ও ভাল ভাল কোয়ালিটির পণ্য বাজারে আনতে উদ্বুদ্ধ করবে। যাতে তার শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বেশি হয় এবং লাভ বৃদ্ধি পায়।

www.pathagar.com

# ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৌলিক মূলনীতি তিনটি :

## ১. ব্যক্তিমালিকানা (Private Property)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির এ অধিকার থাকে, সে তার ব্যক্তিমালিকানায় পণ্যদ্রব্যও রাখতে পারে এবং উৎপাদনের উপকরণও রাখতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী যদিও ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে, কিন্তু উৎপাদনের উপকরণ যেমন ভূমি বা কারখানা সাধারণত ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যবহার্য সামগ্রী হোক বা উৎপাদনী সামগ্রী হোক, সব ধরনের বস্তু ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে।

## ২. ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা (profit Motive)

দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, উৎপাদন কর্মকাণ্ডে যে প্রেরণা কাজ করে সেটা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রেরণা।

## ৩. সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ততা (Laissez Faire)

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে, সরকার ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করবে না। তারা যেভাবেই কাজ করুক তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনোরূপ বাধা প্রদান না করা সরকারের কর্তব্য। সরকারের পক্ষ থেকে তাদের উপর অতিরিক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করা উচিৎ নয়। সাধারণভাবে এ মূলনীতির জন্য সরকারি হস্ত ক্ষেপমুক্ততা (Laissez Faire) পরিভাষা ব্যবহার হয়। মূলত এটি ফরাসি শব্দ। অর্থাৎ 'সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি'। এর অর্থ হচ্ছে 'করতে দাও'। অর্থাৎ সরকারকে বলা হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত সে যেভাবেই কাজ করছে তাকে সেভাবে করতে দাও। তার কাজে কোনো প্রকারে বাধা দিও না। সরকারের অধিকার নেই, সে লোকদের বলবে, অমুক কাজ কর আর অমুক কাজ করো না। ব্যবসা এভাবে কর, ওভাবে করো না– সরকারের একথাও বলার অধিকার নেই। এটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তৃতীয় মূলনীতি এবং মৌলিক দর্শন।

পরবর্তীতে যদিও স্বয়ং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে ক্রমান্বয়ে এ নীতি

www.pathagar.com

সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং কার্যত এমন হয় নি যে, সরকার একেবারেই হস্তক্ষেপ করে নি। বরং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সরকারের পক্ষ থেকে বহু বিধি-নিষেধ দেখা যায়। যেমন কখনো ট্যাক্সের মাধ্যমে অনেক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়, বা কোনো কাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য সরকার অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আজ সারা বিশ্বে এমন একটি দেশও নেই যেখানে ব্যবসা বাণিজ্যে সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌলিক দর্শন এটাই ছিল, সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না; বরং ব্যবসায়ীদের পুরো স্বাধীনতা দেবে। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয়ে থাকে, 'যে কর্তৃত্ব কম করে সে সর্বোত্তম সরকার' অর্থাৎ হস্তক্ষেপ না করে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা কার্যকর থাকে, তাই তাকে 'ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা' বলে। তার অপর নাম হচ্ছে 'মার্কেট ইকোনোমি' (Market Economy) বাজার অর্থনীতি। এ কারণে এক্ষেত্রে মার্কেটের শক্তি (Market Forces) অর্থাৎ যোগান ও চাহিদা দ্বারা কাজ আদায় করা হয়।

www.pathagar.com

# সমাজতন্ত্র

# (Socialism)

সমাজতন্ত্র মূলত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করেছে। পুঁজিবাদী দর্শনের পুরো জোর ছিল এর উপর, সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য প্রত্যেকেই স্বাধীন। অর্থনীতির সকল সমস্যা মৌলিকভাবে শুধু যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে সমাধান হয়। এ কারণে এ দর্শনে জনকল্যাণ ও গরীবের স্বার্থ ইত্যাদির প্রতি কোনো সুস্পষ্ট গুরুত্ব ছিল না। আর সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের প্রতিযোগিতায় দুর্বল মানুষের নিষ্পেষিত হওয়ার প্রচুর ঘটনা ঘটে। এর ফলে ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ব্যবধান অনেক বেড়ে যায়। এজন্য সমাজতন্ত্র এসব দোষ-ত্রুটি প্রতিহত করার দাবি নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। সে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে অর্থনীতির উপরোল্লিখিত চার মৌলিক সমস্যা শুধু ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রেরণা, ব্যক্তিমালিকানা ও বাজারশক্তির ভিত্তিতে সমাধান করার দাবি অস্বীকার করে।

সমাজতন্ত্র বলল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো যোগান ও চাহিদার এক অন্ধ বধির শক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যা শুধু ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রেরণার ভিত্তিতে কাজ করে। জনকল্যাণের অনুভূতিই তার থাকে না। বিশেষত আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে এ শক্তি অবিচারমূলক ফলাফল বয়ে আনে। যার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত হচ্ছে, শ্রমিকের সংখ্যা বেশি হলে তার মজুরি কমে যায়। কখনো শ্রমিক অত্যন্ত কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হয়। তার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে যে উৎপাদন হচ্ছে তার থেকে সে এতটুকু অংশও পাচ্ছে না, যা দ্বারা সে তার নিজের ও বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য স্বাভাবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করতে পারে। যেহেতু তার শ্রমপ্রার্থী পুঁজিপতির এ ব্যাপারে কোনো ভাবনা নেই, যে মজুরিতে সে তার থেকে শ্রম নিচ্ছে সেটা বাস্তবিকপক্ষে তার শ্রমের উপযুক্ত বিনিময় এবং তার প্রয়োজনের প্রকৃত সমাধানকারী কিনা। তার তো কেবল ভাবনা, যোগানের পর্যাপ্ততার কারণে সে তার চাহিদা অত্যন্ত কম পারিশ্রমিকে মেটানো, যার দ্বারা তার মুনাফায় বৃদ্ধি ঘটবে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক দর্শন অনুযায়ী আয় বণ্টনের জন্য যোগান ও চাহিদার ফর্মুলা

www.pathagar.com

এমন একটি অনুভূতিহীন ফর্মুলা, যাতে গরীবদের প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই; বরং সে পুঁজিপতির ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণার অনুগত এবং একেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রের নিকট প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলোও যোগান এবং চাহিদার অন্ধ বধির শক্তির হাতে সমর্পণ করা সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। একটি তাত্ত্বিক দর্শন অনুযায়ী এটা ঠিক, ব্যক্তিগত মুনাফা প্রেরণার অধীনে একজন কৃষক বা একজন শিল্পমালিক ততক্ষণ পর্যন্ত তার উৎপাদন অব্যাহত রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার যোগান চাহিদার সমান না হয়। যখন যোগান চাহিদা থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকবে তখন সে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। কিন্তু বাস্তব জগতে কোনো ব্যবসায়ী বা কৃষকের কাছে এমন কোনো নির্ধারিত মাপকাঠি নেই, যার সাহায্যে সে সময় মতো জানতে পারে, এখন অমুক উৎপাদিত দ্রব্যের যোগান চাহিদার সমান হয়ে গেছে। সুতরাং সে কখনো এ চিন্তা করে উৎপাদন অব্যাহত রাখে, এখনো এ পণ্যের যোগান প্রয়োজন ও চাহিদার তুলনায় কম। অথচ বাজারে তখন প্রকৃত যোগান পর্যাপ্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থার খবর সে অনেক পরে পায়। পরিণামে বাজারে কখনো এমন পণ্যের ছড়াছড়ি দেখা যায় যার চাহিদা সে পরিমাণ নয়। এভাবে অর্থনীতি মন্দার শিকার হয়ে পড়ে। ফলে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে পড়ে। আরো বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সুতরাং শুধু যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে উপরোল্লিখিত চারটি সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি কী হওয়া উচিৎ? তার উত্তরে সমাজতন্ত্র এ দর্শন পেশ করল, উৎপাদনের উপাদান অর্থাৎ ভূমি ও কারখানাকে মানুষের ব্যক্তিমালিকানায় স্বীকৃতি দেয়াটাই মূল সমস্যার জন্ম দিয়েছে। হওয়া উচিৎ এমন, সকল উৎপাদন-উপাদান ব্যক্তির ব্যক্তিমালিকানায় না থেকে রাষ্ট্রের সমষ্টিক মালিকানায় থাকবে। যখন সব উপাদান রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে তখন সরকার জানতে পারবে তার কাছে মোট কী পরিমাণ উপাদান আছে। সমাজের প্রয়োজনগুলো কী কী। তার উপর ভিত্তি করে সরকার একটি

www.pathagar.com

পরিকল্পনা তৈরি করবে। এতে নির্ধারণ করা হবে সমাজের কোন্ প্রয়োজনগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া যায়। কোন্ বস্তু কী পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। বিভিন্ন উপাদানগুলোকে কোন্ নিয়মে কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহার করা হবে। এতে যেন প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়ন– তিনটি কাজই সরকারের পরিকল্পনার অধীনে বাস্ত বায়িত হল। বাকি থাকল আয় বণ্টনের প্রশ্ন। সুতরাং সমাজতন্ত্র দাবি করল, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপকরণ মাত্র দুটি। ভূমি ও শ্রম। ভূমি যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানা নয়; বরং সমষ্টিক মালিকানায় আছে, তাই তার উপর নির্দিষ্ট ভাড়া বা কর দেয়ার প্রয়োজন নেই। বাকি থাকে শুধু শ্রম। সরকার একথা চিন্তা করে তার পরিকল্পনার অধীনে শ্রমের মজুরির পরিমাণও নির্ধারণ করে দেবে যেন শ্রমিক তার উপযুক্ত বিনিময় পায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেমনিভাবে উল্লিখিত চার মৌলিক সমস্যা শুধু ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা এবং বাজার শক্তির উপর ভিত্তি করে সমাধান করতে চেয়েছিল, তেমনিভাবে সমাজতন্ত্র এ চার সমস্যা সমাধানের জন্য একটাই মৌলিক সমাধান প্রস্তাব করল। অর্থাৎ সরকারি পরিকল্পনা। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে পরিকল্পিত অর্থনীতি (Planned Economy) বলা হয়। যার আরবী অনুবাদ করা হয়েছে اقتصاد موجهة বা اقتصاد مخطط।

www.pathagar.com

# সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতি

সমাজতন্ত্রের উপরোল্লিখিত দর্শনের ফল হিসেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নিম্নলিখিত মৌলিক মূলনীতি কার্যকর হয়।

## ১. সমষ্টিক মালিকানা (Collective Property)

এ মূলনীতির অর্থ হচ্ছে, উৎপাদনের উপাদান, অর্থাৎ ভূমি এবং কারখানা ইত্যাদি কোনো লোকের ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে না; বরং তা জাতীয় মালিকানায় থাকবে। আর তা পরিচালিত হবে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে, কিন্তু উৎপাদনের উপাদান কোনো ব্যক্তিমালিকানায় থাকতে পারে না। এর পরিণাম হল, খাঁটি সমাজতান্ত্রিক দেশে শুধু জমি ও কারখানাই নয়; বরং ব্যবসায়িক দোকান-পাটও কোনো ব্যক্তি বিশেষের মালিকানায় থাকে না। সেখানে সব লোক সরকারের কর্মচারী। উৎপাদিত আয়ের পুরোটা সরকারি কোষাগারে যায়। আর কর্মচারীদের বেতন বা মজুরি সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদান করা হয়।

## ২. পরিকল্পনা (Planning)

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় মৌলিক নীতি হচ্ছে পরিকল্পনা। এর অর্থ, সবধরনের মৌলিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকার নিজস্ব পরিকল্পনার অধীনে বাস্তবায়ন করে। এ পরিকল্পনার মধ্যে সব অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং সকল অর্থনৈতিক উপাদানের পরিমাণ ও সংখ্যা একত্র করা হয়। তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, কোন্ উপাদান কোন্ জিনিসের উৎপাদনে লাগানো হবে। কোন্ বস্তু কী পরিমাণ উৎপাদন করা হবে। কোন্ বিভাগের শ্রমিকদের কী পরিমাণ মজুরি নির্ধারণ করা হবে।

সরকারের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ধারণা মূলত সমাজতন্ত্র পেশ করেছিল। পরবর্তীতে আস্তে আস্তে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোও আংশিকভাবে পরিকল্পনা প্রণয়নের পন্থা অবলম্বন করতে শুরু করে। এর কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে তার সে মূলনীতির উপর পরিপূর্ণরূপে অটল থাকতে পারে নি যে, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বরং বিভিন্ন সমষ্টিক স্বার্থের খাতিরে পুঁজিবাদী সরকারকেও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছু না কিছু হস্ত

www.pathagar.com

ক্ষেপ করতে হয়েছে। এমনকি মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) নামে এক নতুন পরিভাষা অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর অর্থ হচ্ছে, যদিও মৌলিকভাবে অর্থনীতি বাজার শক্তির অধীনেই পরিচালিত হবে, কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসা ও শিল্পের কিছু বিভাগ সরকারি তহবিলেও থাকতে পারে। যেমন কিছু ধনতান্ত্রিক দেশে রেলওয়ে, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, এয়ারলাইন সার্ভিস ইত্যাদি সরকারি খাতে থাকে। যে ব্যবসা ব্যক্তিগত পর্যায়ে চালানো হচ্ছে, সরকার তাও কিছু নীতিমালা ও বিধিবিধানের অধীন করে নেয়। প্রথম প্রকারের ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত বিভাগ (Public Sector) এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ব্যক্তিগত বিভাগ (Private Sector) বলা হয়। এ মিশ্র অর্থনীতিতে যেহেতু এক পর্যায়ে সরকারের হস্তক্ষেপ থাকে, তাই আংশিকভাবে তাকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। এ আংশিক পরিকল্পনার পরিণামে সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। তবে তা আংশিক পরিকল্পনা। আর সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকারি পরিকল্পনার অধীন হয়।

## ৩. সমষ্টিক স্বার্থ (Collective Interest)

সমাজতন্ত্রের তৃতীয় মূলনীতি হচ্ছে সমষ্টিক স্বার্থ। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দাবি হল, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুগামী হয়। কিন্তু সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনার মাধ্যমে মৌলিকভাবে সমষ্টিক স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়া হয়।

## ৪. আয়ের সুষম বণ্টন (Equitable Distribution of Income)

সমাজতন্ত্রের চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে, উৎপাদনের মাধ্যমে যে আয় হবে তা জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টিত হবে। ধনী দরিদ্রের মাঝে অতিরিক্ত ব্যবধান থাকবে না। উভয় শ্রেণীর আয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকবে। প্রথমে দাবি করা হয়েছিল, সমাজতন্ত্রে আয়ের সমতা হবে। অর্থাৎ সবার আয় সমান হবে, কিন্তু বাস্তবে এরূপ কখনো হয় নি। মানুষের মজুরি ও বেতন কমবেশি হতে থাকে। তবে সমাজতন্ত্রে অন্তত এ দাবি অবশ্যই করা

www.pathagar.com

# উভয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা

সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলে আসছে। দর্শনগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্কও চলে আসছে। রাজনৈতিক পর্যায়ে যুদ্ধাংদেহী ভাবও কার্যকর রয়েছে। উভয় পক্ষ থেকে পরস্পরের যে সমালোচনা হয়ে আসছে এবং এ বিষয়ে যত বই পুস্তক লেখা হয়েছে, যদি সেগুলো একত্র করা হয় তাহলে পুরো একটি গ্রন্থাগার পূর্ণ হতে পারে। এখানে তার সবগুলো সমালোচনা তুলে ধরা সম্ভব হবে না। তবে সংক্ষিপ্তভাবে উভয় ব্যবস্থার উপর মৌলিক কিছু পর্যালোচনা করা যেতে পারে। যা আমি এখানে সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করতে চাই।

# সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা

প্রথমে সমাজতন্ত্রের উপর পর্যালোচনা করা এ হিসেবে যুক্তিযুক্ত, তার অনিষ্টগুলো বুঝা তুলনামূলকভাবে সহজ। সমাজতন্ত্রের এতটুকু কথা তো বাস্তবিকই সঠিক ছিল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণাকে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, যার ফলে জনকল্যাণের ধারণা হয় তো একেবারেই বাকি থাকে নি, নয় তো অনেক পেছনে পড়ে গেছে। কিন্তু তার যে সমাধান সমাজতন্ত্র প্রস্তাব করেছে সেটা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী চিন্তা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তিকে এতটা স্বাধীন ও লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছিল, যাতে সে তার মুনাফার জন্য যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াতে পারে। তার বিপরীতে সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে এতটা চেপে ধরেছে, যাতে তার ব্যক্তিস্বাধীনতাটুকুও রহিত হয়ে গেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাজার শক্তি, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদাকে সব সমস্যার সমাধান স্থির করেছে। কিন্তু সমাজতন্ত্র এ প্রাকৃতিক বিধান মানতেই অস্বীকার করে। তার স্থানে

www.pathagar.com

সাব্যস্ত করেছে। অথচ মানুষের নিজের তৈরি করা পরিকল্পনা সব জায়গায় কাজ করে না। বহু স্থানে একটি কৃত্রিম জোড় বন্ধন ছাড়া তার আর কোনো ফলাফল বয়ে আনে না।

মানুষের জীবনে অনেক সামাজিক সমস্যা আসে। এসব সমস্যা পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে সমাধান করা সম্ভব হয় না। যেমন একটি সামাজিক সমস্যা হল, প্রত্যেক পুরুষের বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রী দরকার আর প্রত্যেক মহিলার জন্য দরকার উপযুক্ত পাত্রের। এ সামাজিক সমস্যা পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমাধান হয়ে আসছে। প্রত্যেকেই তার নিজের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী খোঁজে। যেখানে উভয় পক্ষের মতৈক্য হয় সেখানে বিবাহ সংঘটিত হয়। এ ব্যবস্থার পরিণামে নিঃসন্দেহে কিছু সমস্যাও সামনে আসে। যেমন এ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত কোনো সময় ভুলও হয়ে যায় । যার ফলে অমিল অনৈক্য সৃষ্টি হয়। এমনও হয়, কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা বিবাহ থেকে বঞ্চিত থাকে তার প্রতি কারো কোনো আকর্ষণ হয় না বলে। কিন্তু এ সমস্যার এমন সমাধান আজ পর্যন্ত কেউ ভাবে নি, বিবাহ ব্যবস্থাপনাকে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর ছেড়ে না দিয়ে সরকারের কাছে সমর্পণ করা উচিৎ। সে পরিকল্পনা তৈরি করবে কত পুরুষ ও কত মহিলা আছে, কোন্ পুরুষ কোন্ মহিলার জন্য অধিক উপযুক্ত। যদি কোনো সরকার বা রাষ্ট্র এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা করতে চায়, তাহলে সেটা হবে একটি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম ব্যবস্থা। যা দ্বারা কখনো সন্তোষজনক ফল বের হয়ে আসতে পারে না।

অনুরূপভাবে একটি সমস্যা হল, মানুষ কোন্ পেশা গ্রহণ করবে, উৎপাদনের কোন্ কাজে কতটুকু অংশগ্রহণ করবে, কোন্‌ভাবে সমাজে তার অবদান পেশ করবে। এটা মূলত একটা সামাজিক বিষয়। এ বিষয় যদি শুধু নীরস পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হবে।

১. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিকল্পনা তৈরির কাজ সম্পন্ন করে। আর সরকার ফেরেশতাদের কোনো দলের নাম নয়। যাদের থেকে কোনো ত্রুটি বা দুর্নীতি প্রকাশ পাবে না। সরকার পরিচালনাকারীরাও রক্ত মাংসের মানুষ। তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হতে

www.pathagar.com

পারে। তাদের চিন্তার মাঝেও ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে যখন সারা দেশের সব উৎপাদন-উপকরণ এ শ্রেণীর মানুষের নিকট সমর্পণ করা হবে, তখন তাদের নিয়তে অসৎপ্রবণতা আসলে তার পরিণাম পুরো জাতিকেই ভোগ করতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যদি এক ক্ষুদ্র পুঁজিপতি সীমিত উৎপাদন-উপকরণের উপর স্বত্বাধিকার লাভ করে কিছু মানুষকে জুলুমের নিশানা বানাতে পারে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের কতিপয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি সমগ্র দেশের উৎপাদন-উপকরণের উপর অধিকার পেয়ে তার থেকে অনেকগুণ বেশি জুলুম-নিপীড়ন চালাতে পারে। এর পরিণাম হতে পারে এমন, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিপতি খতম হয়ে যাবে, আর তাদের স্থানে জন্ম নেবে বিরাট এক পুঁজিপতি। যে রাষ্ট্রের সব সম্পদ নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করবে।

২. সমাজতন্ত্রের পরিকল্পিত ব্যবস্থা একটি চূড়ান্ত শক্তিশালী; বরং স্বৈরাচারী সরকার ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং চলতেও পারে না। কারণ মানুষকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রের পরিকল্পনার অনুসারী করার জন্য রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অত্যাবশ্যক। কেননা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ ইচ্ছায় কাজ করার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার অধীনে কাজ করতে হয়। এ পরিকল্পনা এক প্রবল স্বৈরাচারী শক্তি ছাড়া কাজ করতে পারে না। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিসমাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এভাবে সবদিক থেকে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিষ্পিষ্ট করা হয়।

৩. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে দেয়া হয়, এ কারণে মানুষের কর্মকাণ্ডে এর খারাপ প্রভাব পড়ে। মানুষ চিন্তা করে, সে উদ্দীপনা ও পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনী আগ্রহের সাথে কাজ করুক বা অলসতা ও নিস্পৃহতার সাথে কাজ করুক, সর্বাবস্থায় তার আয় সমান। এ কারণে তার মধ্যে ব্যক্তিগত উত্তম কর্মস্পৃহা অবশিষ্ট থাকে না। ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষা সাধারণভাবে খারাপ বিষয় নয়। বরং সেটা যদি সীমার মধ্যে থাকে তাহলে মানুষের যোগ্যতাকে বিকশিত করে। তাকে নতুন নতুন সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এ স্বভাবজাত স্পৃহাকে সীমার মধ্যে রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে দমিয়ে

www.pathagar.com

দিলে মানুষের অনেক যোগ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়।

এসব ত্রুটি বিচ্যুতি শুধু দর্শনগত ব্যাপার নয়। বরং সমাজতন্ত্রের প্রথম পরীক্ষাগার রাশিয়ায় চুয়াত্তর বছরের অভিজ্ঞতা এসব অনিষ্ট পুরোপুরি প্রমাণ করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সমাজতন্ত্র ও জাতীয়করণের বুলি আওড়ানো হত। যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মুখ খুলত তাকে গোঁড়া, প্রতিক্রিয়াশীল এবং পুঁজিবাদের এজেন্ট বলা হত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সময় স্বয়ং রুশ প্রেসিডেন্ট ইয়েলিৎসন বলেন, "যদি সমাজতান্ত্রিক (Utopian)[১] দর্শনের পরখটা রাশিয়ার মতো একটা বিশাল দেশে না করে আফ্রিকার কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলে করা হত, তাহলে তার ধ্বংসাত্মক পরিণতি জানার জন্য চুয়াত্তর বছর লাগত না। –(নিউজ উইক)

# ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা

এবার সংক্ষিপ্তভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শন পর্যালোচনা করতে হয়। সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পর পাশ্চিমা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে অত্যন্ত জোরেশোরে বগল বাজানো হচ্ছে। দাবি করা হচ্ছে, বাস্তব জগতে যেহেতু সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সত্যতা ও যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অথচ ব্যাপার হল, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ প্রচলিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশুদ্ধতা ছিল না; বরং তার কারণ ছিল, সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃত ভুলগুলো সংশোধনের পরিবর্তে অন্য একটি ভুল পথ অবলম্বন করেছিল। সুতরাং এখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দর্শনগত ভুলগুলো অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বুঝা দরকার।

বস্তুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দর্শনে এতটুকু কথা সঠিক ছিল,

---

[১]. Utopian অর্থ 'নিরাশ্রয়'। মূলত এটা একটা বইয়ের নাম। প্রাচীন কালে কোনো ল্যাটিন বা গ্রিক রাজা লেখেছিলেন। এর মধ্যে এক কাল্পনিক রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরা হয়েছিল। যেখানে সকল বস্তু মানুষের যৌথ মালিকানাধীন। প্রত্যেক ব্যক্তি যে বস্তু ইচ্ছা নিজের চাহিদামতো বিনামূল্যে লাভ করতে পারে। কারো প্রতি কোনো বিধি-নিষেধ নেই। এটা বাস্তবায়ন যেহেতু অসম্ভব ধারণা ছিল, তাই এ শব্দটি এক কাল্পনিক স্বর্গের অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। যা লাভ করার কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যে ব্যক্তি এ ধরনের কাল্পনিক পরিকল্পনা তৈরি করে তাকে Utopian বলে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করার জন্য ব্যাক্তগত মুনাফার প্রেরণা এবং বাজার শক্তি অর্থাৎ যোগান ও চাহিদাবিধি থেকে কাজ নেয়া জরুরি। কারণ এটা মানবীয় প্রকৃতির দাবি। কিন্তু ভুলটা মূলত এখানে হয়েছে, একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে হালাল হারামের কোনো পার্থক্য ছিল না। সামগ্রিক কল্যাণের প্রতিও তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। সুতরাং তার জন্য এমন পদ্ধতি অবলম্বন করাও বৈধ হয়ে যায় যার পরিণামে সে সর্বোচ্চ সম্পদশালী হয়ে বাজারের উপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য (Monopoly) প্রতিষ্ঠা করতে পারে। একচ্ছত্র আধিপত্যের অর্থ হল, কোনো বিশেষ পণ্যের যোগান ও সরবরাহ করা কোনো এক ব্যক্তি বা এক গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, সে ব্যক্তি বা গ্রুপ ছাড়া অন্য কেউ ঐ বস্তু উৎপাদন করতে পারে না। এ একচ্ছত্র আধিপত্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল, মানুষ সে বস্তু তার স্বেচ্ছাচার-নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে লাগামহীন ছাড় দেয়া এবং তার উপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দেয়ার ফলে যে অনিষ্ট পুঁজিবাদী সমাজে সৃষ্টি হয়েছে তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপ–

১. মুনাফা অর্জনের জন্য যেহেতু হালাল হারামের কোনো পার্থক্য ছিল না, এ কারণে তার থেকে বহু নৈতিক অনিষ্ট সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। কেননা, সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা অনেক মানুষের নিচু প্রকৃতিকে জাগ্রত করে তার কুপ্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর উপায় উপকরণ যোগান দেয়। যা দ্বারা সমাজে নৈতিক বিকৃতি ছড়ায়। সুতরাং এটাও পাশ্চাত্য জগতের উলঙ্গপনা ও অশ্লীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সেখানে উলঙ্গ ছবি ও চলচ্চিত্রের সয়লাব বইয়ে দিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ ব্যক্তিগত মুনাফার আকাঙ্ক্ষা মেটাচ্ছে। নারীরা তাদের শরীরের এক একটি অঙ্গ এ আকাঙ্ক্ষার অধীনে বাজারে বিক্রি করছে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুসারে সার্ভিসের কারবারে মডেল গার্লসের কারবার সর্বাধিক লাভজনক। যারা নিজেদের ছবি শিল্পপতিদের নিজস্ব শিল্পদ্রব্যের উপর ছাপানোর জন্য বা প্রচারের মডেল বানানোর জন্য সরবরাহ করে। এর বিনিময়ে তারা অত্যন্ত চড়া মূল্য আদায় করে। এমনকি আমেরিকায় এ শ্রেণী সবচেয়ে বেশি উপার্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, তাদের যে লাখ লাখ ডলার ব্যয় করা

www.pathagar.com

হয় তা অবশেষে উৎপাদন-ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাধারণ ভোক্তাদের কাঁধে গিয়ে পড়ে। এভাবে পুরো জাতি এ সব অনৈতিকতার আর্থিক মূল্যও পরিশোধ করে।

২. ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের উপর যেহেতু বিশেষ কোনো নৈতিক বিধি-নিষেধ নেই এ কারণে প্রয়োজনের অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ ও সম্পদ বণ্টনে জনকল্যাণের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায় না। যখন অধিক মুনাফা অর্জনই চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হয় তখন এ অধিক মুনাফা যদি উলঙ্গ ফিল্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়, তাহলে এক ব্যক্তি বাস্তুহীন মানুষের আবাসনের জন্য অর্থ কেন ব্যয় করবে? যখন এখাতে তুলনামূলক লাভ কম।

৩. ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষার উপর হালাল হারামের নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে সুদ, জুয়া, হুন্ডি ইত্যাদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৈধ। অথচ এগুলো এমন বস্তু যা স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। যার একটা নিদর্শন হল, এর ফলে অধিক পরিমাণে একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব একচেটিয়া আধিপত্য বর্তমান থাকতে বাজারের প্রাকৃতিক শক্তি, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার বিধান পঙ্গু হয়ে পড়ে, তা যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। একদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দাবি, আমরা বাজার শক্তি, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদাবিধি থেকে কাজ নিতে চাই। অন্যদিকে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণাকে নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দিয়ে তা একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। যা দ্বারা যোগান ও চাহিদার শক্তি অকার্যকর বা প্রভাবহীন হয়ে পড়ে।

এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল, যোগান ও চাহিদা শক্তি অর্থনীতিতে ভারসাম্য সৃষ্টিকরণে তখনি কার্যকর হয়, যখন বাজারে স্বাধীন প্রতিযোগিতার (Free competition) পরিবেশ থাকে। কিন্তু যখন বাজারে কোনো ব্যক্তির একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন মূল্যব্যবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ থাকে না। আর অর্থনীতির চার মৌলিক সমস্যার ব্যাপারে হওয়া সিদ্ধান্ত গুলো সমাজের প্রকৃত প্রয়োজন ও চাহিদার চিত্র তুলে ধরে না। এখানেও একটা কৃত্রিম ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। এক দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টা বুঝা যাক। মনে করুন, চিনির উৎপাদন প্রয়োজন মোতাবেক এ পরিমাণ হওয়া উচিৎ যাতে যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে বাজারে তার উপযুক্ত দাম

www.pathagar.com

নির্ধারিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত দাম তখনি নির্ধারণ সম্ভব যখন চিনি প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন কারখানা বিদ্যমান থাকে। আর ক্রেতাদের এ অধিকার থাকে, এক কারখানার চিনির দাম যদি বেশি হয় তাহলে সে অন্য কারখানা থেকে ক্রয় করতে পারবে। যদি বাজারে এ প্রতিযোগিতার পরিবেশ থাকে তাহলে কোনো কারখানাই দাম নির্ধারণে স্বেচ্ছাচার করতে পারবে না। এ অবস্থায় বাজারে চিনির যে দাম নির্ধারিত হবে তা প্রকৃতপক্ষে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য অনুসারে হবে এবং তা হবে ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য। কিন্তু যদি একজন মাত্র ব্যক্তি চিনির কারবারের ইজারাদার বনে যায়, আর মানুষ কেবল তার থেকেই চিনি ক্রয়ে বাধ্য হয়, তাহলে তার নির্ধারিত দামে চিনি ক্রয় করা ছাড়া মানুষের কাছে আর কোনো উপায় থাকে না। এ অবস্থায় চিনির যে দাম হবে তা নিঃসন্দেহে ঐ অবস্থা থেকে বেশি হবে যখন বাজারে একাধিক চিনি সরবরাহকারী থাকবে এবং তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা থাকবে। মনে করুন, স্বাধীন প্রতিযোগিতার পরিবেশে চিনির মূল্য কিলোগ্রাম প্রতি আট টাকা। একচেটিয়া পরিবেশে সেটা কিলো প্রতি দশ বা বার টাকা হতে পারে। এখন যদি মানুষ বার টাকায় চিনি ক্রয় করে তাহলে এ লেনদেন তার প্রকৃত চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং এক কৃত্রিম অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে, যা এক চিনি ব্যবসায়ীর একচেটিয়া আধিপত্য দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে একচেটিয়া ইজারাদারি প্রকৃত যোগান ও চাহিদা ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দেয়।

সুতরাং যদিও একথা বলাটা সঠিক ছিল, যোগান ও চাহিদা শক্তির অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর অনেকাংশে সমাধান করা উচিৎ। কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হালাল হারামের পার্থক্য ছাড়াই যখন ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণহীন ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তখন সে একচেটিয়া ইজারাদারি প্রতিষ্ঠা করে নিজে যোগান ও চাহিদা শক্তির সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা সৃষ্টি করে। এভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি মূলনীতি কার্যত তার অন্য মূলনীতিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

৪. পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল ধারণা যদিও এমন ছিল, কায়-কারবার ও ব্যবসা বাণিজ্যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না হোক, কিন্তু ক্রমান্বয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পর কার্যত এ মূলনীতি পুরোপুরি বহাল থাকতে পারে নি। প্রায় সকল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু হস্ত

www.pathagar.com

ক্ষেপ হতে থাকে। যেমন সরকার বিভিন্ন আইনের বিশেষত ট্যাক্সের মাধ্যমে কোনো ব্যবসাকে উৎসাহিত আবার কোনো ব্যবসাকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে। এখন সম্ভবত এমন কোনো ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই যাতে সরকারের পক্ষ থেকে কায়-কারবার ও ব্যবসায়ের উপর কোনো না কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় না। সুতরাং সরকারের হস্তক্ষেপ না করার (Laissez Faire) মূলনীতি সঠিকভাবে পালনকারী কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। কিন্তু সরকারের এসব হস্তক্ষেপ কখনো হয় সরকারি আমলা ও ধনীদের পরস্পর গাঁটছড়া বাধার পরিণতি। যার সুফল শুধু প্রভাবশালী পুঁজিপতিদের কাছেই পৌছে। এ কারণে সামগ্রিক কল্যাণ ও জনস্বার্থ রক্ষিত হয় না। এ বিধি-নিষেধগুলো যদি সরকারি আমলা ও ধনীদের গাঁটছড়া বাধা ও দুর্নীতি থেকে মুক্তও হয়, তবুও তা খাঁটি সেক্যুলার চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার পক্ষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার আলোকে যে বিধি-নিষেধ উপযুক্ত মনে করে তাই আরোপ করে। অথচ নিছক বিবেক সব মানবীয় সমস্যা সমাধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ কারণেই এসব বিধি-নিষেধ অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঠিক প্রতিকার হতে পারে নি।

৫. পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিশেষভাবে সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা বৈষম্যের শিকার থাকে। এ বৈষম্যের এক বিরাট কারণ সুদ ও জুয়া। পরিণামে সম্পদের গতি প্রবাহ ধনীদের দিকে থাকে। দরিদ্র ও জনসাধারণের দিকে থাকে না। এর ব্যাখ্যা ইনশাআল্লাহ সম্পদ বণ্টন সম্পর্কিত আলোচনায় আসবে।

www.pathagar.com

# অর্থনীতির ইসলামী বিধান

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর এখন সংক্ষিপ্তভাবে এ নিবেদন করতে চাই, অর্থনীতির যে চার মৌলিক সমস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছিল সে ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কী? একথা পূর্বেই পরিষ্কার থাকা চাই, ইসলাম কোনো অর্থব্যবস্থার নাম নয়। বরং এটা একটা দ্বীন-জীবনব্যবস্থা। যার বিধান জীবনের প্রত্যেক বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে অর্থনীতিও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কুরআন ও হাদীস প্রচলিত অর্থে কোনো অর্থনৈতিক দর্শন বা মতবাদ পেশ করে নি। যা বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক পরিভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনের অগ্রগন্যতা নির্বাচন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, আয় বণ্টন ও উন্নয়ন শিরোনামে কুরআন হাদীস বা ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে সরাসরি কোনো আলোচনা বিদ্যমান নেই। কিন্তু জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো ইসলাম অর্থনীতির ব্যাপারেও কিছু বিধান দিয়েছে। এসব বিধান সামগ্রিকভাবে অধ্যয়ন করে আমরা উদ্ভাবন করতে পারি, উল্লিখিত চার সমস্যার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী। এখন এ অধ্যয়ন ও উদ্ভাবনের সার-সংক্ষেপ পেশ করা হচ্ছে।

ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান ও শিক্ষার উপর চিন্তা ভাবনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, ইসলাম বাজার শক্তি, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার বিধান মেনে নিয়েছে। ইসলাম অর্থনীতির সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য মোটের উপর যোগান ও চাহিদাবিধি ব্যবহারের সহযোগিতা প্রদান করে। আল-কুরআনের ঘোষণা:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

–আমি তাদের মাঝে তাদের পার্থিব জীবনের জীবিকা বণ্টন করেছি, মর্যাদায় তাদের কাউকে কারো উপর উচ্চস্থান দিয়েছি, যাতে তারা একজন অন্যজন থেকে কাজ নিতে পারে। (সূরা যুখরুফ: ৩২)

উল্লিখিত আয়াতের মর্ম থেকে এ কথা স্পষ্ট, একে অন্যের থেকে কাজ এভাবে নেবে যে, কাজ গ্রহণকারী কাজের চাহিদা এবং কাজ প্রদানকারী কাজের যোগান। এ চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক টানাপড়েন ও মিল থেকে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি অস্তিত্ব লাভ করে। অনুরূপভাবে রাসূল সা.

www.pathagar.com

এর যুগে যখন পল্লীবাসী তাদের কৃষিপণ্য শহরে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসত, তখন কিছু শহুরে মানুষ পল্লীবাসীদের বলত, তুমি তোমার পণ্য নিজে শহরে নিয়ে বিক্রি করো না; বরং এ মাল আমাকে দিয়ে দাও। আমি উপযুক্ত সময়ে বিক্রি করে দেব, যাতে বেশি দাম পাওয়া যায়। রাসূল সা. এমন করতে নগরবাসীকে নিষেধ করেছেন। সাথে একথাও বলেছেন,

دعوا الناس يرزق الله بعضهم عن بعض

–মানুষদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, আল্লাহ তাআলা তাদের কাউকে কারো মাধ্যমে জীবিকা দান করেন।

এভাবে রাসূল সা. বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত ক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করেছেন, যাতে বাজারে যোগান ও চাহিদার সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পল্লীবাসী যখন সরাসরি বাজারে কোনো জিনিস বিক্রি করবে তখন তার নিজের উপযুক্ত মুনাফা ধরেই বিক্রি করবে। কিন্তু তাকে যেহেতু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, তাই তার মজুদ করে রাখার কোনো অবকাশ নেই। আর সে নিজে বাজারে পৌঁছলে যোগান ও চাহিদার এমন মিশ্রণ হবে যা সঠিক মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি তাদের মাঝখানে আসে এবং মালের মজুদ গড়ে তোলে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে, তাহলে তা যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। সুতরাং উপরোল্লিখিত হাদীস থেকেও একথা বুঝা যায়, রাসূল সা. যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন।

তেমনিভাবে যখন তাঁর কাছে আবেদন করা হল, আপনি বাজারে বিক্রীত পণ্যদ্রব্যের দাম সরকারিভাবে নির্দিষ্ট করে দিন, এ অবস্থায়ও রাসূল সা. ঘোষণা করেন:

ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق

-নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলাই মূল্য নির্ধারণকারী। তিনিই পণ্যের যোগানে হ্রাস-বৃদ্ধিকারী এবং তিনিই আহারদাতা।

উল্লিখিত হাদীসে আল্লাহ তাআলাকে মূল্য নির্ধারণকারী স্থির করার সুস্পষ্ট অর্থ, আল্লাহ তাআলা যোগান ও চাহিদার প্রাকৃতিক বিধান নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে দাম নির্ধারিত হয়। এ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ছেড়ে কৃত্রিমভাবে দাম নির্ধারণ করা পছন্দনীয় নয়।

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের এ নির্দেশনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়, ইসলাম বাজার শক্তি, অর্থাৎ যোগান ও চাহিদার বিধানকে মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তেমনিভাবে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা থেকেও মোটামুটিভাবে কাজ নিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য হল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ প্রেরণাকে একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পরিণামে ঐ অনিষ্টগুলো সৃষ্টি হয়েছে যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলাম ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণাকে বহাল রেখে, চাহিদা এবং যোগানের বিধানকে স্বীকৃতি দিয়ে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। এর বাস্তবায়ন হলে ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণা এমন ভুল পথে চলতে পারবে না যা অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করে বা তার থেকে অন্য কোনো নৈতিক বা সামাজিক অনিষ্ট সৃষ্টি হয়। ইসলাম ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণার উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

## ১. খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ

সর্বপ্রথম ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর হালাল হারামের কিছু চিরস্থায়ী বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যা সর্বযুগে সর্বস্থানে কার্যকর। যেমন সুদ জুয়া হুন্ডি মজুদদারি গুদামজাতকরণ এবং অন্যান্য সকল নিষিদ্ধ ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার কারণ, এসব সাধারণত একচেটিয়া ইজারাদারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হয়। উপরন্তু এর দ্বারা অর্থনীতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে ইসলাম এমন সব পণ্যের উৎপাদন এবং ক্রয় বিক্রয় হারাম সাব্যস্ত করেছে যার দ্বারা সমাজ কোনো অনৈতিকতার শিকার হয়, মানুষের নিচু প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে অবৈধ পন্থায় মুনাফা অর্জনের পথ সৃষ্টি হয়।

এখানে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট থাকা দরকার যে, এ খোদায়ী বিধি-নিষেধ নিয়ন্ত্রণ কুরআন হাদীসের আলোকে আরোপ করা হয়েছে। এগুলোকে ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয় নি, যদি তার বিবেক উপযুক্ত মনে করে তাহলে এ বিধি-নিষেধ আরোপ করবে। আর উপযুক্ত মনে না করলে আরোপ করবে না। তার কারণ, কোনো বস্তু ভাল বা মন্দ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কখনো মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় ভিন্নতা এবং মতানৈক্য হয়। কোনো একজন মানুষের বিবেক এক বস্তুকে ভাল এবং অন্য মানুষের বিবেক তাকে মন্দ ভাবতে পারে। সুতরাং এ

www.pathagar.com

বিধি-নিষেধগুলোও যদি শুধু মানবীয় বিবেকের উপর ন্যস্ত করা হত, তাহলে সম্ভাবনা ছিল, মানুষ নিজের বিবেকের আলোকে এসব বিধি-নিষেধগুলো অনুপযুক্ত মনে করে সমাজকে তা থেকে মুক্ত করে দিত। আর যেহেতু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে এসব বিধি-নিষেধ সর্বযুগে ও সর্বস্থানের জন্য জরুরি ছিল, এ কারণে ওহীর মাধ্যমে এসব বিধি-নিষেধকে চিরস্থায়িত্বের গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যাতে মানুষ তার বিবেকপ্রসূত ব্যাখ্যার আশ্রয়ে তার থেকে মুক্ত হয়ে অর্থনীতি এবং সমাজকে বৈষম্যের মধ্যে নিপতিত করতে না পারে।

এখানে একথা স্পষ্ট হয় যে, কুরআন ও হাদীসে আরোপিত এ খোদায়ী বিধি-নিষেধ পালন করা সর্বাবস্থায় অত্যাবশ্যক। তার যৌক্তিক দর্শন মানুষের বুঝে আসুক বা না আসুক।

যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, বর্তমান যুগে বেশিরভাগ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রই ব্যক্তিগত মুনাফার প্রেরণার উপর কিছু না কিছু বিধি-নিষেধ অবশ্যই আরোপ করে। কিন্তু এ বিধিনিষেধ যেহেতু খোদায়ী ওহীনির্ভর নয়, এ কারণে সেটা সুষম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং ঐসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোথাও সুদ জুয়া হুন্ডি ইত্যাদির উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নি যেগুলো অর্থনৈতিক বৈষম্যের অনেক বড় কারণ।

## ২. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

আলোচিত খোদায়ী বিধি-নিষেধগুলো ছিল চিরস্থায়ী প্রকৃতির। তার সাথে ইসলামী শরীয়ত সমকালীন সরকারকে এ অধিকারও প্রদান করেছে, সে কোনো জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে এমন কোনো বস্তু বা কাজের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে, যেগুলো মৌলিকভাবে হারাম নয়; বরং মুবাহ-র আওতাভুক্ত, কিন্তু তা দ্বারা সমাজের কোনো ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা চিরস্থায়ী প্রকৃতির হয় না, যা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে কার্যকর হবে; বরং তার গুরুত্ব সাময়িক নির্দেশের মতো, যা সাময়িক প্রয়োজন অনুযায়ী হয়। তার একটি সরল দৃষ্টান্ত হল, ফুকাহায়ে কিরাম লেখেছেন, যখন কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে তখন সরকার তরমুজের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে আরোপিত এ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তরমুজ খাওয়া এবং তার ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতেও নাজায়েয হয়ে যাবে। এমনিভাবে উসূলে ফিকাহর মধ্যে 'سد ذرائع' (উপায়-উপকরণ প্রতিরোধ) নামের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে। যার অর্থ, কোনো কাজ যদিও মৌলিকভাবে জায়েয, কিন্তু তার আধিক্য যদি কোনো অপরাধ বা বিশৃঙ্খলার কারণ হয়, তাহলে সরকারের জন্য ঐ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা জায়েয।

এ মূলনীতির আলোকে সরকার সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি করতে পারে। যেসব কর্মকাণ্ডের কারণে অর্থনীতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার শংকা দেখা দেয়, সরকার তার উপর উপযুক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। কানযুল উম্মাল গ্রন্থে আছে, হযরত উমর ফারুক রা. একবার বাজারে এসে দেখলেন, এক ব্যক্তি কোনো একটি দ্রব্য প্রচলিত দামের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করছে। তখন তিনি সে লোককে বললেন :

اما ان تزيد فى السعر و اما ترفع عن سوقى

–হয় তোমার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি কর, নইলে আমাদের বাজার থেকে উঠে যাও।

বর্ণনায় একথা স্পষ্ট নয় যে, হযরত উমর রা. কোন্ কারণে তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তার কারণ হতে পারে, সে ভারসাম্যপূর্ণ মূল্য থেকে অনেক কম মূল্যে বিক্রি করে অন্য ব্যবসায়ীদের বৈধ মুনাফা অর্জনের পথ বন্ধ করে দিচ্ছিল। এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাব্য কারণ এও হতে পারে, কম মূল্যে পাওয়ার কারণে লোকেরা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ক্রয় করছিল। যা দ্বারা অপব্যয়ের রাস্তা উন্মুক্ত হয়। অথবা মানুষের জন্য মজুদদারির অবকাশ সৃষ্টি হয়। যাই হোক, এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, শরীয়তের মূল বিধান হল, এক জন মানুষ তার নিজস্ব মালিকানা বস্তু যে দামে ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত ঘটনায় লোকটির নিজের পণ্য কম মূল্যে বিক্রি করা মৌলিকভাবে বৈধ ছিল। কিন্তু কোনো সমষ্টিক স্বার্থে হযরত উমর রা. তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা অবশ্য পালনীয় হওয়ার উৎস কুরআনের এ

www.pathagar.com

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

–হে মুমিনগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের ও নিজেদের মধ্যেকার ক্ষমতাসীন লোকদের আনুগত্য কর।

এ আয়াতে اولى الامر (ক্ষমতাসীন লোকের) আনুগত্যকে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ, যে সব ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করে নি, সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের নির্দেশ অবশ্য পালনীয়।

এখানে উল্লেখ্য, সরকারের মুবাহ বিষয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের এ অধিকার অসীম নয়। বরং তারও কিছু মূলনীতি, কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু দুটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রথমত সরকারের সে নির্দেশই অবশ্য পালনীয় যা কুরআন ও হাদীসের কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। দ্বিতীয়ত সরকার এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার শুধু তখনি পায় যখন কোনো সমষ্টিগত জনস্বার্থ তার আহ্বায়ক হয়। সুতরাং এক প্রসিদ্ধ ফিকহী মূলনীতিতে বিষয়টা এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

تصرف الامام بالرعية منوط بالمصلحة

–জনসাধারণের উপর সরকারের শাসন অধিকার জনস্বার্থের সাথে শর্তযুক্ত।

সুতরাং যদি সরকার কোনো সমষ্টিক স্বার্থ ব্যতীত কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাহলে সেটা জায়েয হবে না। বিচারকের আদালত থেকে তা বাতিল করানো যেতে পারে।

## ৩. নৈতিক বিধি-নিষেধ

যেমন পেছনে বলা হয়েছে, খাঁটি অর্থে ইসলাম কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নাম নয়; বরং একটি দ্বীন বা জীবনবিধানের নাম। এ দ্বীনের শিক্ষা এবং বিধান জীবনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় অর্থনীতি সম্পর্কেও অবশ্যই আছে। কিন্তু এ দ্বীনের শিক্ষায় প্রতিটি পদক্ষেপে এটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং তা থেকে অর্জিত বৈষয়িক উপকার মানুষের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। কুরআন ও হাদীসে সকল জোর একথার উপর দেয়া হয়েছে, পার্থিব জীবন সীমিত কয়েকদিনের

www.pathagar.com

জীবনমাত্র। এরপর এমন এক অনন্ত জীবন আসবে যার কোনো শেষ নেই। মানুষের মূল কাজ হল তার পার্থিব জীবনকে সেই পরকালীন জীবনের জন্য সোপান বানানো। সেখানকার সুখের চিন্তা করা। সুতরাং অন্যের তুলনায় চার পয়সা বেশি উপার্জন করা মানুষের আসল সফলতা নয়; বরং তার সফলতা হল, পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে বেশি বেশি সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করা। যার পথ হচ্ছে পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় এমন কাজ করা যা তার জন্য সর্বাধিক নেকী ও সওয়াবের কারণ হয়।

যখন মানুষের মধ্যে এ মানসিকতা সৃষ্টি হয় তখন তার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় শুধু এটা থাকে না যে, কোন্ অবস্থায় কেমন করে আমার আলমারি বেশি পূর্ণ হবে। বরং কখনো তার অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত এ ভিত্তিতেও হয়, কোন্ কাজে আমার আখেরাতের লাভ বেশি হবে। এভাবে অনেক ব্যাপারে শরীয়ত কোনো অবশ্য পালনীয় নির্দেশ (Mandatory Order) দেয় নি বটে। তবে কোনো বিশেষ বিষয়ের পরকালীন ফযীলত মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছে, যা একজন মুমিনের জন্য অনেক বড় আকর্ষণের কারণ। এর মাধ্যমে মানুষ নিজেই নিজের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নেয়। নৈতিক নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা।

এর একটি সরল দৃষ্টান্ত হল, এক ব্যক্তির কাছে পুঁজি বিনিয়োগের দুটি পথ আছে। একটি হল, সে তার পুঁজি কোনো বৈধ বিনোদনমূলক কিন্তু ব্যবসায়িক প্রকল্পে খাটাতে পারে। এর মধ্যে তার অধিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় হল, সে এ পুঁজি গৃহহীন লোকদের জন্য বাড়ি নির্মাণ করে সস্তায় বিক্রি করার কাজে ব্যয় করতে পারে। এতে তুলনামূলক কম লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। একজন সেক্যুলার চিন্তাধারার মানুষ অবশ্যই প্রথম পথ গ্রহণ করবে। কেননা, তাতে লাভ বেশি। কিন্তু যে ব্যক্তির অন্তরে পরকালের চিন্তা গ্রথিত সে পথের বিপরীত এ চিন্তা করবে, যদিও আবাসন প্রকল্পে আর্থিক লাভ তুলনামূলক কম, কিন্তু গরীব মানুষের জন্য আবাসন ব্যবস্থা করে নিজের জন্য পরকালে বেশি সওয়াব লাভ করতে পারি। এ জন্য আমাকে বিনোদনমূলক প্রকল্প গ্রহণ না করে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিৎ।

এখানে যদিও উভয় পথই শরয়ীভাবে বৈধ ছিল, কোনোটার উপরই

www.pathagar.com

কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না, কিন্তু পরকালীন বিশ্বাসনির্ভর নৈতিক নিয়ন্ত্রণ মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় রেখে ঐ ব্যক্তির অন্তরে এক অভ্যন্তরীণ বাধা সৃষ্টি করে দিয়েছে। যা দ্বারা প্রয়োজনের উত্তম অগ্রগণ্যতা নির্বাচন এবং উত্তম উপকরণ নির্দিষ্টকরণ বিধি কার্যকর হয়েছে। এটা একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষেই কারো অন্তরে ইসলামের পরকালীন বিশ্বাস পরিপূর্ণভাবে বদ্ধমূল হয়ে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে তাহলে সে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের কল্যাণে অনেক বড় অবদান রাখতে পারে।

অনৈসলামী সমাজেও নৈতিকতার একটা অবস্থান আছে, তা আমি অস্বীকার করি না। সে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের উপরও প্রভাব ফেলে। কিন্তু যেহেতু ঐসব নৈতিক ধারণার পেছনে পরকালের মজবুত বিশ্বাস বর্তমান নেই, এ কারণে সেটা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না। পক্ষান্তরে ইসলাম তার যাবতীয় শিক্ষাসহ ব্যাপকভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে কার্যকর হলে অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তার নৈতিক শিক্ষার প্রভাব পড়বে। যেমন অতীতে তার অসংখ্য জীবন্ত দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে। সুতরাং নৈতিক বিধি-নিষেধের এ উপাদান খাঁটি ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে কোনোক্রমেই কোনো দুর্বল উপাদান নয়; বরং তার গুরুত্ব অনেক বেশি।

www.pathagar.com

# বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন

এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তা ছিল অর্থনীতি সংক্রান্ত মৌলিক দর্শনগত আলোচনা। এখন সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চাই যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে মৌলিক দর্শন পেছনে আলোচনা করা হল, তা বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো কী কর্মপন্থা অবলম্বন করে। এ কর্মপন্থা অর্থনীতি শাস্ত্রে সাধারণত চারটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়।

## ১. সম্পদ উৎপাদন (Production of Wealth)

এ শিরোনামের অধীনে সম্পদ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনা হয়। অর্থাৎ এটা বলা হয়, প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে সম্পদ উৎপাদনে কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এতে ব্যক্তি সংস্থা ও সরকার প্রভৃতির কী ভূমিকা থাকে। এ শিরোনামের আরবী নাম 'انتاج الثروة'।

## ২. সম্পদ বণ্টন (Distribution of Wealth)

এ শিরোনামের অধীনে আলোচনা হয়, অর্জিত উৎপাদন তার প্রাপকদের মাঝে কোন্ কর্মপন্থার অধীনে বণ্টিত হবে। তাকে আরবীতে "توزيع الثروة" বলে।

## ৩. সম্পদ বিনিময় (Exchange of Wealth)

এ শিরোনামের অধীনে ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয় যা মানুষ এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু লাভ করার জন্য অবলম্বন করে। তাকে আরবীতে 'مبادلة الثروة' বলা হয়।

## ৪. সম্পদ ভোগ (Consumption of Wealth)

এ শিরোনামের অধীনে অর্জিত উৎপাদন বা সম্পদ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আরবীতে তাকে 'استهلاك الثروة' বলা হয়।

'সম্পদ বিনিময়' ও 'সম্পদ ভোগ' সংক্রান্ত শিরোনামের আলোচনা এখানে পরিত্যাগ করছি। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনের আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ। তবে সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও ইসলামের

www.pathagar.com

তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য সম্পদ উৎপাদন এবং সম্পদ বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ের কিছু মৌলিক আলোচনা জরুরি। এখানে সেগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

## উৎপাদন ও বণ্টনের পুঁজিবাদী দর্শন

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একথা সর্বজনস্বীকৃত, কোনো জিনিসের উৎপাদনে চারটি উপাদান সক্রিয় থাকে। যাকে বাংলায় উৎপাদনের উপাদান এবং আরবীতে 'عوامل الانتاج' এবং ইংরেজিতে Factors of Production বলা হয়।

### ১. ভূমি (Land)

ভূমি অর্থ প্রাকৃতিক উৎপাদন-উপাদান, যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তা সৃষ্টিতে মানুষের কোনো হাত নেই।

### ২. শ্রম (Labour)

শ্রম হল মানুষের সে কাজ, যার মাধ্যমে কোনো নতুন বস্তু উৎপাদিত হয়।

### ৩. মূলধন (Capital)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, মূলধন হল উৎপাদিত উৎপাদন-উপকরণ (Produced Factor of Production)-এর নাম। এ সংজ্ঞাকে সামান্য ব্যাখ্যা করে এভাবে বলা যায়, মূলধন হল এমন উৎপাদন-উপকরণ, যা প্রাকৃতিক নয়; বরং কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, তারপর পরবর্তী কোনো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

### ৪. সংগঠক (Entrepreneur)

সংগঠক হল সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যে কোনো উৎপাদন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে। সংগঠক বা প্রতিষ্ঠান উপরোল্লিখিত চার উৎপাদন-উপাদান একত্র করে তা উৎপাদন কাজে ব্যবহার এবং লাভ-লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ করে। পুঁজিবাদী দর্শন হল, বর্তমান যুগে উৎপাদন কার্যক্রম এ চার উপাদানের সম্মিলিত কর্মকাণ্ডের ফল। যদিও কখনো এ উপাদানগুলো একই ব্যক্তির কাছে একত্র হয়। অর্থাৎ একই ব্যক্তি ভূমির যোগান দেয়,

www.pathagar.com

শ্রম দেয় এবং সে-ই মূলধন সরবরাহ করে। কিন্তু বড় আকারের শিল্পে সাধারণত এ চার উপাদান পৃথক পৃথক ব্যক্তির কাছে থাকে। আর উৎপাদন যেহেতু তাদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হয়, তাই অর্জিত উৎপাদনের হকদারও এরাই। সুতরাং সম্পদ বণ্টনের পুঁজিবাদী দর্শন হচ্ছে, জমির ভাড়া (Rent), শ্রমের মজুরি (Wages), পুঁজির সুদ (Interest) এবং উদ্যোক্তার মুনাফা (Profit) দিতে হবে। এর মধ্যে বণ্টনের প্রথম তিন উপাদান অর্থাৎ ভাড়া মজুরি এবং সুদ আগে থেকে নির্ধারিত হয়। এটা নির্ধারণ হয় যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে। এর ব্যাখ্যা পেছনে করা হয়েছে। তবে বণ্টনের চতুর্থ উপাদান, অর্থাৎ মুনাফা কারবার শুরু করার সময় নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না; বরং এটা নির্ধারিত হয় কারবার ফলপ্রসূ হওয়ার পর। অর্থাৎ প্রথম তিন খাতে সম্পদ বণ্টন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই উদ্যোক্তার মুনাফা।

www.pathagar.com

# সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন

সমাজতন্ত্রের বক্তব্য হল, প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের উপাদান চারটি নয়; বরং দুটি মাত্র। একটি ভূমি, অপরটি শ্রম। এ দুয়ের অংশগ্রহণে উৎপাদন অস্তিত্ব লাভ করে। মূলধনকে উৎপাদনের উপাদান বলা যায় না। কারণ সে নিজেই কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফল। আর উদ্যোক্তাকেও উৎপাদনের স্বতন্ত্র উপাদান নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তার কাজ শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত কোনো ব্যক্তি বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝুঁকি গ্রহণ করার বৈশিষ্ট্য মেনে নেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ কাজ সরকার করে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির কারবারি উদ্যোগের অনুমতিও নেই এবং প্রয়োজনও নেই।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু উৎপাদনের প্রকৃত উপাদান শুধু ভূমি ও শ্রম। আর ভূমি কারো ব্যক্তিমালিকানাধীন নয়। এ কারণে তাকে পৃথকভাবে বিনিময় দেয়ার প্রয়োজন নেই। সুতরাং সম্পদ বণ্টনের শুধু একটি খাত বাকি থাকে। আর সেটা হল মজুরি। যা সরকারি পরিকল্পনার অধীনে সম্পন্ন হয়। কার্ল মার্কসের প্রসিদ্ধ মতবাদ হল, কোনো বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি কেবল শ্রমের মাধ্যমে হয়। এ কারণে মজুরি লাভের অধিকার শুধু শ্রমেরই আছে। মূলধনের সুদ, ভূমির ভাড়া এবং উদ্যোক্তার মুনাফা একটি ফালতু বিষয় যা কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মতবাদকে বলা হয় 'উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব' (Theory of Surplus Value) এবং তার আরবী নাম 'نظرية القدر'।

www.pathagar.com

# ইসলামী শিক্ষা

অর্থনীতির কোনো গ্রন্থে সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ বণ্টনের উপর যে ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়, কুরআন ও হাদীসে সে ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয় নি। কিন্তু অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে কুরআন ও হাদীস যে বিধান প্রদান করেছে তার উপর চিন্তা করলে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়, ইসলামে মূলধন (Capital) ও সংগঠকের (Entrepreneur) ভিন্নতা স্বীকার করা হয় নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারবারের লাভ-লোকসানের ঝুঁকি সংগঠকের উপর ফেলা হয়। আর মূলধনকে নির্ধারিত হারে সুদ দেয়া হয়। ইসলামে যেহেতু সুদ হারাম। এ কারণে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি খোদ মূলধনের উপরই পতিত হয়। সুতরাং কোনো কারবারে মূলধন বিনিয়োগকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে লাভের প্রত্যাশার সাথে লোকসানের ঝুঁকিও গ্রহণ করতে হবে। এটাকে এভাবে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষার আলোকে যদিও মূলধন ও সংগঠক উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান, কিন্তু মূলধন সরবরাহকারী প্রত্যেক ব্যক্তি যেহেতু ঝুঁকিও গ্রহণ করে, এ কারণে সে আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে সংগঠকও। তাই সম্পদ বণ্টনের বেলায় মূলধন ও সংগঠক উভয়েরই মুনাফা প্রাপ্য। অথবা এভাবে বলা যায়, মূলধন ও সংগঠক দুটি ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন-উপাদান নয়। বরং একটাই এবং সম্পদ বণ্টনে সে মুনাফা পায়। যাই হোক, যেমনিভাবে ভূমির নির্দিষ্ট ভাড়া এবং শ্রমের নির্ধারিত মজুরি দেয়া হয়, তেমনিভাবে মূলধনকে নির্ধারিত সুদ দেয়া যায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনকে ভূমির সাথে তুলনা করা হয়। যেমনিভাবে ভূমি সরবরাহ করে এক ব্যক্তি নির্ধারিত ভাড়া উসূল করতে পারে, তেমনিভাবে মূলধন সরবরাহ করে নির্ধারিত সুদও উসূল করতে পারে। কিন্তু ইসলামী বিধানের আলোকে এ তুলনা সঠিক নয়। কেননা নিম্নলিখিত তিনটি কারণে ভূমি ও মূলধনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

১. ভূমি নিজেই লাভজনক বস্তু। তার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সেটা ব্যয় করতে হয় না; বরং অস্তিত্ব ঠিক রেখে তা উৎপাদন- উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তা থেকে অন্য উপকারও পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং ভূমির ভাড়া মূলত সেসব উপকারের বিনিময়, যা সে সরাসরি প্রদান করছে। পক্ষান্তরে মূলধন এমন বস্তু যা নিজে লাভজনক নয়। সে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কোনো উপকার করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যয় করে তার বিনিময়ে উপকৃত হওয়ার যোগ্য কোনো বস্তু ক্রয়

www.pathagar.com

করা না হয়। সুতরাং যে কাউকে অর্থ সরবরাহ করল সে এমন কোনো বস্তু সরবরাহ করল না, যা সরাসরি লাভজনক বস্তু। সুতরাং তার উপর ভাড়া পরিশোধের কোনো প্রশ্ন নেই। কারণ ভাড়া হয় এমন বস্তুর যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে।

২. জমি ও মেশিনারি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এমন বস্তু যা ব্যবহার করলে তার মূল্যমানে ঘাটতি হয়। এ কারণে এসব বস্তু যত বেশি ব্যবহার করা হবে তার মূল্যমান তত বেশি কমতে থাকবে। সুতরাং এসব বস্তুর যে ভাড়া আদায় করা হয় তার মধ্যে অবচয়ের ক্ষতিপূরণও অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে অর্থ এমন জিনিস, কেবল ব্যবহারের কারণে তার মূল্যে কোনো ঘাটতি হয় না।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ভূমি, যন্ত্রপাতি বা যানবাহন ভাড়া নেয়, তাহলে এ বস্তু তার জামানতে (Risk) থাকে না। বরং তার মূল মালিকের জামানতে থাকে। যার অর্থ হচ্ছে, ভাড়া গ্রহণকারীর অবহেলা বা অন্যায় ব্যতিরেকে যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বস্তুটি ধ্বংস হয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতি ভাড়া গ্রহণকারীর নয়; বরং মূল মালিকেরই হবে। আর মূল মালিক যেহেতু তা ধ্বংসের ঝুঁকি গ্রহণ করছে এবং ভাড়া গ্রহণকারীকে এ ঝুঁকি থেকে মুক্ত রেখে নিজের মালিকানা স্বত্ব ব্যবহারের অধিকার প্রদান করছে, এ কারণে সে একটি নির্দিষ্ট এবং যুক্তিসংগত ভাড়ার হকদার। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কাউকে টাকা ঋণ প্রদান করছে সে টাকা তার জামানতে (Risk) থাকে না; বরং ঋণগ্রহীতার জামানতে চলে যায়। যার অর্থ হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার হাতে যাওয়ার পর যদি সে টাকা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নষ্ট হয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় তাহলে ক্ষতি ঋণদাতার নয়; বরং ঋণগ্রহীতার হবে। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা এ অবস্থায় ঋণদাতাকে সে পরিমাণ টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। এখানে যেহেতু ঋণদাতা ঋণ দিয়ে সে টাকার কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করে নি, এ কারণে সে তার কোনো বিনিময় গ্রহণের অধিকার রাখে না।

এ ব্যাখ্যার আলোকে সম্পদ বণ্টনের ইসলামী মূলনীতির সাথে পুঁজিবাদী মূলনীতির একটি মৌলিক পার্থক্য হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূলধনকে নির্দিষ্টহারে সুদ দেয়া হয়। আর ইসলামে মূলধনের অধিকার মুনাফা লাভ করা। যা সে তখনি পাবে যখন সে লোকসানের ঝুঁকিও গ্রহণ করবে। অর্থাৎ মূলধনের মালিক কারবারের লাভ-লোকসান উভয়ের মধ্যে শরিক হবে। যার পদ্ধতি হচ্ছে শিরকাত বা মুদারাবা।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, ধনতন্ত্র হোক বা সমাজতন্ত্র হোক, উভয় ব্যবস্থায় সম্পদের অধিকার শুধু সেসব উৎপাদনের উপাদানের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে যারা বাহ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার সারকথা হল, প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তাআলার। প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টির মূল কার্যক্রম আল্লাহই সম্পাদন করেন। যাঁর তাওফীক ব্যতীত কোনো উৎপাদন-উপাদান একবিন্দু পরিমাণও জন্ম দিতে পারে না। সুতরাং কোনো উৎপাদন-উপাদানই নিজে আয়ের মালিক ও হকদার নয়। বরং আল্লাহ তাআলা যাকে হকদার স্থির করবেন সে-ই হবে হকদার। অতএব আল্লাহ তাআলা যদিও আয়ের প্রাথমিক হকদার উৎপাদনের উপাদানকেই স্থির করেছেন, কিন্তু সে সাথে সম্পদের দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদারের এক লম্বা তালিকা দিয়েছেন। যারা উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে তেমনি হকদার যেমন স্বয়ং উৎপাদনের উপাদান নিজে হকদার। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদাররা সমাজের সেসব ব্যক্তি, যারা সম্পদ স্বল্পতার কারণে যদিও উৎপাদন কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে নি, কিন্তু এ মানব সমাজেরই সদস্য হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার সৃজিত সম্পদে তাদেরও অংশ আছে। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদার পর্যন্ত সম্পদ পৌঁছানোর জন্য ইসলাম যাকাত, উশর, সাদাকাহ, খারাজ, কাফফারা, কুরবানী ও ওয়ারিসী বা উত্তরাধিকার বিধান প্রদান করেছে। যার মাধ্যমে সম্পদের বিরাট একটা অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদারদের কাছে পৌঁছে যায়। সম্পদের প্রাথমিক হকদার অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান তাদের আয়, চাই ভাড়ার মাধ্যমে অর্জিত হোক বা মজুরির মাধ্যমে হোক বা মুনাফার মাধ্যমে হোক, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ দ্বিতীয় পর্যায়ের হকদারদের পর্যন্ত পৌঁছাতে বাধ্য। এটা তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ নয়; বরং প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং কুরআন পাক ঘোষণা করেছে :

وفى اموالهم حق للسائل و المحروم

–আর তাদের সম্পদে অভাবী ও বঞ্চিতদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অধিকার রয়েছে। (সূরা যারিয়াত-১৯) অনুরূপভাবে কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে ঘোষণা করেছে : وأتوا حقه يوم حصاده

–ফসল কাটার সময় তাদের হক আদায় করে দাও। (সূরা আনআম-১৪১)

www.pathagar.com

# সম্পদ উৎপাদনের উপর ব্যবস্থাত্রয়ের সামগ্রিক প্রভাব

উপরে সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় বিধৃত হয়েছে। অর্থনীতির উপর এ তিন ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রভাব অত্যন্ত দীর্ঘ এক আলোচনার বিষয়। এখানে তার দিকে শুধু ইঙ্গিতই করা যেতে পারে। পেছনে আলোচনা করা হয়েছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের প্রেরণাকে একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়ার ফলে কী অনিষ্ট সৃষ্টি হয়। এসব অনিষ্ট অর্থনৈতিকও আবার নৈতিকও। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রেরণাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে উৎপাদনের পরিমাণ (Quantity) ও গুণগত মান (Quality) উভয়ের মধ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। কারণ সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক কর্মীই নির্ধারিত মজুরি পায়। এ কারণে কাজের প্রতি তার ব্যক্তিগত উৎসাহ থাকে না। যেটা তাকে কার্যক্রম সুন্দর করতে উদ্বুদ্ধ করবে। বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে একবার বিভিন্ন শিল্প জাতীয় মালিকানায় প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। এটা ছিল সমাজতান্ত্রিক প্রপাগান্ডারই পরিণাম। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয় মালিকানায় নেয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যেতে থাকে। অবশেষে পুনরায় আবার সেগুলো ব্যক্তিমালিকানায় প্রদান করা হচ্ছে। এর জন্য আজকাল ব্যক্তিমালিকানাকরণ (Privatization) পরিভাষা ব্যবহার হচ্ছে।

রাশিয়ায় এ অবস্থাই হয়েছে। সেখানে উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান এত নিচে নেমে গেছে, যাতে দেশ দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তো পরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছে। কিন্তু এর কয়েক বছর আগে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকগণ কমিউনিজমকে সামলানোর চেষ্টা করছিল, সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ তাঁর গ্রন্থ পেরেস্ট্রয়কায় (Perestroica) দেশ পুনর্গঠনের প্রোগ্রাম পেশ করেছিলেন। সে গ্রন্থে তিনি কমিউনিজমকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন নি। তবে একথার উপর খুব জোর দিয়েছেন, সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আর এ নতুন ব্যাখ্যায় তিনি বার বার

www.pathagar.com

স্বীকার করেন, এখন আমাদের অর্থনীতিকে নতুনভাবে গঠন করার জন্য বাজার শক্তিকে (Market Forces) অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

ইসলাম একদিকে ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের প্রেরণাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির কারণ হয়। অন্যদিকে সে তার উপর এমন সব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে যা তাকে ঐসব অর্থনৈতিক ও নৈতিক স্খলন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুদের অনুমতির আর একটা দিক হল, কোনো কারবারের মূলধন সরবরাহকারী কারবারের সমৃদ্ধি সম্পর্কে পুরোপুরি সম্পর্কহীন থাকে। কারবারে লাভ হল না ক্ষতি হল সে ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা নেই। কারণ সে সর্বাবস্থায় নির্ধারিত হারে সুদ পাবে। তার বিপরীতে ইসলামে যেহেতু সুদ হারাম, এ কারণে কোনো কারবারে বিনিয়োগ (Financing) করার ভিত্তি শিরকাত ও মুদারাবার উপরই হতে পারে। এ অবস্থায় পুঁজি সরবরাহকারীর পূর্ণ কামনা ও চেষ্টা থাকবে, যে কারবারে সে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে তার যেন উন্নতি হয় এবং তার লাভ অর্জিত হয়। স্পষ্টত এর দ্বারা সম্পদ উৎপাদনের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

www.pathagar.com

# সম্পদ বণ্টনের উপর ব্যবস্থাত্রয়ের প্রভাব

সমাজতন্ত্র শুরুতে সম্পদ বণ্টন সম্পর্কে দাবি করেছিল, পরিকল্পিত অর্থনীতিতে আয়ের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যার অর্থ ছিল, সকল ব্যক্তির আয় সমান হবে, কিন্তু এটা ছিল শুধু এক কাল্পনিক স্বপ্ন। পরবর্তীতে কার্যত কখনো সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি শুধু তাই নয়; বরং তাত্ত্বিকভাবেও সাম্যের দাবি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। সেখানেও মজুরির মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। মজুরি নির্ধারণ যেহেতু পুরোটাই সরকার করত, তাই এ ব্যাপারে একজন সাধারণ শ্রমিকের কোনো হাত ছিল না। এ মজুরি নির্ধারণ যদি তার কাছে অন্যায্য মনে হত, তাহলে তার বিরুদ্ধে মুখ খোলারও কোনো অবকাশ ছিল না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অন্তত এতটুকু সুযোগ আছে, শ্রমিক যদি তার মজুরি বৃদ্ধি করাতে চায় তাহলে সে কেবল আওয়াজ তুলতে পারবে তাই নয়; বরং দাবি জানানোর অন্যান্য মাধ্যম যেমন হরতাল ইত্যাদিও অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে এ ধরনের আওয়াজ তোলা বা দাবি আদায়ের মাধ্যম অবলম্বন করারও কোনো অবকাশ নেই। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কার্যত শ্রমিকের বিশেষ কোনো উপকার হয় নি। বরং শেষে পরিণতি দাঁড়াল যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার মান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রমিকদের তুলনায়ও নিচে নেমে গেল। অবশেষে মানুষ বিরক্ত হয়ে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পালায়ন করেছিল, তাকেই পুনরায় স্বাগত জানায়। এ পরিণাম সেসব দেশে বেশি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যেখানে একই দেশের কিছু অংশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আর কিছু অংশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে ছিল। যেমন পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি। পশ্চিম জার্মানি উন্নতি করে কোথায় চলে গেছে। তার তুলনায় পূর্ব জার্মানি থেকে গেছে অনেক পেছনে। সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থাও পশ্চিম জার্মানির তুলনায় শোচনীয় ছিল। এমনকি লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে বার্লিন প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে এবং কার্যত সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয়। তবে তার অর্থ এটা নয়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টন বাস্তবিকই সুষম ছিল। প্রকৃত ব্যাপার হল, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার যেসব দোষ-ত্রুটির বিরোধিতায় সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল, সেগুলো অনেকাংশে আজও বিদ্যমান রয়েছে। ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের প্রেরণাকে বেপরোয়া ছেড়ে দেয়ায় আজও

www.pathagar.com

একচেটিয়া ইজারাদারি জন্ম নেয়। সুদ, জুয়া এবং হুন্ডির বাজার এখনো গরম। যার পরিণতিতে হাজার হাজার জনগণের সম্পদ নিংড়ে নিংড়ে কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। জনগণের কুপ্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে তার থেকে অর্থ উপার্জনের কাজ এখনো অব্যাহত আছে। বহু পুঁজিবাদী দেশে লাখ লাখ লোক এমন আছে যার একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। শীতের রাতে রেল স্টেশনের ঠাণ্ডা মাটিতে আশ্রয় নেয়।

এ অবস্থার দায়-দায়িত্ব অনেকখানি পতিত হয় সুদ, জুয়া ও হুন্ডির উপর। জুয়া ও হুন্ডির ব্যাপার তো পরিষ্কার, এর মাধ্যমে বহু মানুষের পুঁজি গড়িয়ে গড়িয়ে কোনো এক ব্যক্তির পকেটে জমা হয়, কিন্তু সুদের কারণে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় সেদিকে সাধারণত দৃষ্টি দেয়া হয় না। অথচ সুদ সর্বাবস্থায় সম্পদ বণ্টনে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। কারণ যে ব্যক্তি অন্য কারো থেকে ঋণ গ্রহণ করে কারবার চালায়, যদি তার কারবারে লোকসান হয় তাহলে ঋণদাতা যেকোনো অবস্থায় তার সুদের দাবি অব্যাহত রাখে; বরং সুদ চক্র বৃদ্ধি হারে বেড়ে তার পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ অনেক মোটা অংকে উপনীত হয়। এভাবে ঋণগ্রহীতা পুরোপুরি লোকসানের মধ্যে থাকে আর ঋণদাতা থাকে পুরোপুরিভাবে লাভের মধ্যে। অন্যদিকে যে বৃহৎ পুঁজিপতি ব্যাংক থেকে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে বৃহদায়তনের কারবার পরিচালনা করে তার কারবারে বিপুল পরিমাণ লাভ হয়। সে তার খুব সামান্য অংশ সুদ আকারে ব্যাংককে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে আমানতকারী জনগণকে প্রদান করে। আর বাকি সমস্ত লভ্যাংশ সে নিজে রেখে দেয়। এভাবে উভয় অবস্থায় সম্পদ বণ্টন হয় বৈষম্যপূর্ণ।

বিষয়টি একটা সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝার প্রয়োজন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অধিকাংশ সময় এমন হয়, এক ব্যক্তি কোনো কারবারে তার নিজের পকেট থেকে শুধু দশ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করল আর বাকি নব্বই লাখ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করল। এভাবে সে মোট এক কোটি টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। এত বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে যখন ব্যবসা করা হবে তখন তার লাভও হবে অনেক বেশি। মনে করুন, কারবারে পঞ্চাশ শতাংশ লাভ হল। সুতরাং এক কোটি টাকায় হয়ে গেল দেড় কোটি টাকা। এখন পুঁজিপতি পঞ্চাশ লাখ মুনাফা থেকে মাত্র পনের লাখ টাকা সুদ হিসেবে ব্যাংককে প্রদান করবে। এর মধ্য থেকে ব্যাংক

www.pathagar.com

তার নিজের মুনাফা রেখে সর্ব্বোচ্চ দশ থেকে বার লাখ টাকা সেসব জনগণের মধ্যে বণ্টন করবে যাদের আমানত তার কাছে জমা রয়েছে। যার নিরেট ফল হল এই, এ কারবারে যে শত শত মানুষ নব্বই লাখ টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল এবং যাদের পুঁজিই প্রকৃতপক্ষে এত বিপুল পরিমাণের মুনাফা অর্জন সম্ভব করেছে তাদের মধ্যে বণ্টিত হল মাত্র দশ বার লাখ টাকা। আর যে পুঁজিপতি সর্বমোট দশ লাখ টাকার পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল, কারবারের মুনাফা হিসেবে সে পেল পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা। তারপর মজার ব্যাপার হল, এ পনের লাখ টাকা যা ব্যাংককে প্রদান করা হল এবং ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণ পর্যন্ত পৌঁছল তাকে পুঁজিপতি তার শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। যা অবশেষে তার নিজের উপর পড়ে না; বরং সাধারণ ভোক্তাদের উপর গিয়ে পড়ে। কারণ এ কারবারে সে যে দ্রব্য প্রস্তুত করেছে তার মূল্য নির্ধারণের সময় ব্যাংককে প্রদত্ত সুদের টাকাও মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এভাবে মূলত তার নিজের পকেট থেকে কিছুই ব্যয় হল না। কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্ঘটনা ইত্যাদির কারণে যদি কারবারে লোকসান হয় তাহলে এ লোকসানের ক্ষতিপূরণ করিয়ে নেয়া হয় ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মাধ্যমে। আর এ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছেও জমা থাকে এমন হাজার হাজার জনগণের টাকা, যারা মাসে মাসে বা বছরে বছরে নিজের উপার্জনের একটা অংশ কোম্পানিতে জমা করাতে থাকে। কিন্তু তাদের কোনো ব্যবসা কেন্দ্রে আগুনও লাগে না বা অন্য কোনো দুর্ঘটনাও ঘটে না। একারণে সাধারণত তারা টাকা জমাই রাখে, উত্তোলনের সুযোগ হয় খুবই কম।

অপরদিকে যদি এ ধরনের বহু পুঁজিপতি কোনো বড় ধরনের ক্ষতির কারণে তারা ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে না পারে এবং এর পরিণামে ব্যাংক দেওলিয়া হয়ে যায়, তাহলে এ অবস্থায় পুঁজিপতিদের তো অল্প টাকা ক্ষতি হবে। বিপুল পরিমাণের ক্ষতি হবে সে সমস্ত আমানতকারীদের যাদের টাকা দিয়ে পুঁজিপতি কারবার পরিচালনা করে।

মোট কথা হল, এ সুদী ব্যবস্থার কারণে পুরো জাতির পুঁজি কতিপয় বড় পুঁজিপতি নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে, আর তার বিনিময়ে জাতিকে প্রদান করে খুবই সামান্য অংশ। এ সামান্য অংশও দ্রব্যের উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে পুনরায় তা সাধারণ ভোক্তাদের থেকেই উসুল করে নেয়। নিজের লোকসানের ক্ষতিপূরণও আদায় করে

www.pathagar.com

জনসাধারণের সঞ্চয় থেকে। এভাবে সুদের সামগ্রিক গতি এদিকে থাকে যে, জনগণের সঞ্চয়ের ব্যবসায়িক ফায়দা বেশির ভাগ বড় পুঁজিপতির কাছেপৌঁছে। আর সাধারণ জনগণ তার থেকে উপকৃত হয় সবচেয়ে কম। এভাবে সম্পদের গতি প্রবাহ সবসময় উপরের দিকে অর্থাৎ বড় বড় পুঁজিপতির দিকেই থাকে।

দুঃখজনক হল, যখন থেকে পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব সূচিত হয়েছে তখন থেকে কোনো দেশ এমন দৃষ্টান্ত পেশ করতে পারে নি, যেখানে শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানও পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। এ কারণে কোনো বাস্তব নমুনার উদ্ধৃতি দিয়ে একথা বলা যায় না যে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করলে কিভাবে সম্পদ বণ্টনে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু খাঁটি দর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করলে এ ফলাফলে পৌঁছতে বিলম্ব হবে না যে, ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করলে সম্পদের বণ্টন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় কয়েকগুণ বেশি সুষম হবে। কেবল সুদ হারাম হওয়ার বিষয় নিয়ে চিন্তা করলেও একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর কোনো কারবারে পুঁজি বিনিয়োগ কেবল লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতেই হতে পারে। আর তার ফলাফল দাঁড়াবে এরূপ, যদি অর্থ গ্রহণকারীর লোকসান হয় তাহলে অর্থ সরবরাহকারীও তাতে শরিক করবে। আর যদি লাভ হয় তাহলে অর্থ সরবরাহকারী সে লাভের শতকরা নির্দিষ্ট হারের হকদার হবে। সুতরাং উপরোল্লিখিত উদাহরণে যদি পুঁজিপতি ব্যাংক থেকে নব্বই লাখ টাকা নেয়ার সময় শিরকাত বা মুদারাবার ভিত্তিতে লেনদেন করে এবং তার ও ব্যাংকের মধ্যে যদি ষাট শতাংশ ও চল্লিশ শতাংশ হারও ধার্য হয়, তাহলে পঞ্চাশ লাখ মুনাফার মধ্যে কমপক্ষে বিশ লাখ তার ব্যাংককে প্রদান করতে হবে। ব্যাংককে প্রদেয় মুনাফা যেহেতু দ্রব্য বিক্রির পরে নির্ধারিত হবে, এ কারণে তা দ্রব্যের উৎপাদন খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যের মাধ্যমে জনগণ থেকে উসুল করা যাবে না।

তারপর এভাবে পুঁজিপতির যে মুনাফা অর্জিত হবে তার মধ্য থেকেও যাকাত সাদাকাহ ইত্যাদির মাধ্যমে একটা বিরাট অংশ সে গরিব জনগণের দিকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। এর সুস্পষ্ট ফলাফল হল, সম্পদের প্রাচুর্য প্রবাহ কতিপয় পুঁজিপতির স্থলে দেশের সাধারণ জনগণের দিকে যাবে। যে জনগণের সঞ্চয় দ্বারা দেশের শিল্প বাণিজ্য অগ্রগতি লাভ করছে, তার মুনাফায় সে অধিক হারে অংশীদার হবে।

www.pathagar.com

# ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (মালিকানা হিসেবে)

## (Different kinds of Business)

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেহেতু সব অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা সরকারি পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত হয়। এ কারণে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও একক প্রকৃতির ব্যবসায়ের প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং ব্যবসায়ের শ্রেণী বিভাগের উপর এ আলোচনা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রযোজ্য।

মালিকানা হিসেবে ব্যবসায় তিন প্রকার :

১. একমালিকানা ব্যবসায় (Private Proprietorship)।[১]

২. অংশীদারি ব্যবসায় (Partnership)।[২]

৩. যৌথমূলধনী কোম্পানি (Joint Stock Company)।[৩]

যখন থেকে মানুষ কারবার করছে, তখন থেকেই প্রথম দুই প্রকারের কারবার প্রচলিত। ফুকাহায়ে কিরামও তার মৌলিক ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কিত বিধান আলোচনা করেছেন। তার বর্তমান রূপ অতীত থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন নয়। এ কারণে তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হবে না। তবে 'কোম্পানি' কারবারের একটি নতুন প্রকার। পূর্বের ফুকাহায়ে কিরামের যুগে এর অস্তিত্ব ছিল না। তাই এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

## কোম্পানির সংজ্ঞা

---

১. সাধারণত একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে এক-মালিকানা ব্যবসায় বলে।

২. দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে। আমাদের দেশের অংশীদারি আইন অনুযায়ী ন্যূনতম দুই জন এবং সর্বোচ্চ সাধারণ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ২০ জন এবং ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ১০ জন মিলে অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারে।

৩. যৌথমূলধনী কোম্পানি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ২. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। প্রচলিত কোম্পানি আইন অনুযায়ী ন্যূনতম দুই জন এবং সর্বোচ্চ পঞ্চাশ জন ব্যক্তি কর্তৃক সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে অবাধে শেয়ার হস্তান্তর অযোগ্য এবং শেয়ার বিক্রির আহ্বান জানাতে অপারগ কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তাবিশিষ্ট যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। আর কমপক্ষে সাত জন এবং সর্বোচ্চ যে কোনো সংখ্যক (শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ) ব্যক্তি কর্তৃক সীমিত দায়ের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র ও কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা নিয়ে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে।

www.pathagar.com

কোম্পানির আভিধানিক অর্থ 'অংশীদারিত্ব'। কখনো 'কর্মের সাথী'কেও কোম্পানি বলা হয়। কোনো কোনো দোকানে লেখা থাকে 'অমুক এন্ড কোম্পানি'। সেখানে এ আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়, যাকে আরবিতে 'فلان وشركاءه' বলা হয়। সেক্ষেত্রে ঐ অর্থনৈতিক ও পারিভাষিক অর্থ বুঝায় না যার সংজ্ঞা এখানে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যদি কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নামে 'এন্ড' শব্দ ছাড়া শুধু কোম্পানি শব্দ থাকে, যেমন 'তাজ কোম্পানি', তাহলে এর দ্বারা পারিভাষিক কোম্পানি বুঝায়। তার সাথে সাধারণত লিমিটেড শব্দও থাকে। এর ব্যাখ্যা সামনে করা হবে।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের অভ্যুদয়ের পর সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বড় বড় কারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য যখন বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন দেখা দেয়, যা কোনো ব্যক্তি একা বা কয়েকজন মিলে সরবরাহ করতে পারত না, তখন সাধারণ জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলো একত্র করে তা থেকে সমষ্টিক ফায়দা নেয়ার জন্য কোম্পানি ব্যবস্থা চালু হয়। এ ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য হল, অংশীদারিত্বের মধ্যে প্রত্যেক অংশীদারের ভিন্ন ভিন্ন মালিকানা কল্পনা করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থায় কয়েক ব্যক্তির সমষ্টিকে এক আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ। এ আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তাকে 'কর্পোরেশন' বলা হয়, যার এক প্রকার হল কোম্পানি।

আগে সাধারণত আধা সরকারি কোম্পানি হত। সাধারণত সরকারের চার্টারের (অনুমতিপত্র) অধীনে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য আধা সরকারি কোম্পানি গঠন করা হত এবং তাদের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হত। কখনো তাদের ব্যবসায়িক নীতিমালা তৈরি করারও ক্ষমতা দেয়া হত। মুদ্রা প্রচলন, সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী রাখার ক্ষমতাও তাদের থাকত। উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনকারী 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'ও এ ধরনের কোম্পানি ছিল। বর্তমানে এ ধরনের ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন ঔপনিবেশিক কোম্পানির অস্তিত্ব নেই। এখন শুধু ব্যবসায়িক কোম্পানি আছে যা সরকারের অনুমতিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোম্পানি গঠনের অনুমোদন ও তার নিয়ন্ত্রণের কাজ যে সংস্থা করে তাকে আমাদের দেশে কর্পোরেট ল' অথরিটি (Corporate Law Authority) বলে। এটা অর্থমন্ত্রণালয়ের

www.pathagar.com

অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান।[১]

## কোম্পানি গঠন

সর্বপ্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। এতে যে কারবার শুরু করা হবে তার সম্ভাবনা কতটুকু আছে তা নির্ধারণ করা হয়। তার জন্য উপকরণ ও মূলধন কী পরিমাণ লাগবে, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ ব্যবসা কতটুকু লাভজনক হবে, বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুতকৃত রিপোর্টে সে সম্পর্কেও অভিমত থাকে। এ রিপোর্ট বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরি করানো হয়। একে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, 'تقرير الامكانيات' (Feasibility Report) বলা হয়।

তারপর কোম্পানির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরি করা হয়। যার মধ্যে কোম্পানির নাম, ব্যবসায়ের প্রকৃতি, প্রার্থিত মূলধন, পরিচালকবৃন্দ ভবিষ্যতে তাদের নিয়োগ বরখাস্ত ইত্যাদির নীতিমালা লিপিবদ্ধ করা হয়। একে 'مذكرة' (Memorandum) বলা হয়।[২]

তারপর কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা লেখা হয়। যাকে আরবিতে 'نظام الجمعية يا لائحة الجمعية' এবং ইংরেজিতে (Articles of Association) বলে।[৩]

এরপর মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনসহ সরকারের কাছে কোম্পানির অনুমতির জন্য আবেদন পেশ করা হয়। অর্থমন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা কর্পোরেট ল' অথরিটির (Corporate Law Authority) পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর কোম্পানি অস্তিত্ব লাভ করে। এখন আইন তাকে একজন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, যে বেচাকেনা করবে, বাদী বিবাদী হবে, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা হবে।

তাকে 'আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা' (Legal person) বা Juristic person বা Juridical person বলে। কখনো তাকে কৃত্রিম ব্যক্তিও

---

১. বাংলাদেশে যৌথমূলধনী কোম্পানি গঠনের জন্য 'যৌথমূলধনী কোম্পানি নিবন্ধকের কার্যালয়' (Registerer of Joint Stock Company) থেকে অনুমোদন নিতে হয়। এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান।

২. একে বাংলায় স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ বা সংঘস্মারক বলে।

৩. একে বাংলায় পরিমেল নিয়মাবলী বা সংঘবিধি বলা হয়।

www.pathagar.com

(Fictitious person) বলা হয়।

কোম্পানি অস্তিত্ব লাভ করার পর এখন মানুষকে অংশীদার হবার আহ্বান জানানোর জন্য কোম্পানির কার্যপ্রণালী এবং সাংগঠনিক কাঠামোর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা আইনগতভাবে জরুরি। যাতে জনসাধারণেরও কোম্পানির উপর আস্থা তৈরি হয়। জনসাধারণকে কোম্পানির কার্যপ্রণালী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য যে লিখিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়, তাকে বিবরণপত্র, আরবিতে 'نشرة الاصدار' এবং ইংরেজিতে প্রসপেক্টাস (Prospectus) বলে।[১]

## কোম্পানির মূলধন

সরকার কোম্পানির অনুমোদন দেয়ার সময় মূলধনের একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয় যে, এ পরিমাণ মূলধনের শেয়ার ছাড়া যাবে। অথবা এ পরিমাণ মূলধনের মধ্যে জনগণকে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানানো যাবে। তাকে বলা হয়, 'অনুমোদিত মূলধন' 'رأس المال المسموح به المصرح' বা 'رأس المال' (Authorised Capital)।

এর মধ্যে কোম্পানির উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যে মূলধন যোগান দেয়া হবে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তাকে স্পন্সর মূলধন (Sponsors Capital) বলে। তারপর শেয়ার ছাড়ার পর জনগণ বা কোম্পানির উদ্যোক্তাগণ যত মূলধন শেয়ার গ্রহণের অঙ্গীকার করে তাকে 'প্রতিশ্রুত মূলধন' (Subscribed Capital) বলে। এরপর যারা কোম্পানির অংশীদারিত্ব (Subscription) গ্রহণ করেছে এবং মূলধন পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের মূলধন তাৎক্ষণিকভাবে একসঙ্গে পরিশোধ করা জরুরি নয়। কখনো পর্যায়ক্রমিকভাবেও পরিশোধ করা হয়। সুতরাং যে পরিমাণ মূলধন পরিশোধিত হয় তাকে 'পরিশোধিত মূলধন' 'رأس المال المدفوع' (Paid Up Capital) বলে।

কোম্পানি যে মূলধনের শেয়ার জারি করে জনগণকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়, সে মূলধনকে 'বিলিকৃত/ বিলিযোগ্য মূলধন' 'رأس المال

---

১. আমাদের দেশের নিয়মানুযায়ী নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এটি সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানির ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার করতে হয় এবং বিবরণপত্র প্রচারের ১৮০ দিনের মধ্যে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

www.pathagar.com

المعروض' (Issued capital) বলে।

মানুষ ফরম পূরণ করে যত মূলধনের শেয়ার ক্রয়ের অঙ্গীকার করে তাকে 'প্রতিশ্রুত মূলধন' 'رأس المال المساهم' বা 'رأس المال المكتتب' (Subscribed Capital) বলে।

যেমন কোম্পানির একশ মিলিয়ন টাকার কারবারের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এখানে একশ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত মূলধন। এর মধ্যে বিশ মিলিয়ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠাকারীদের দায়িত্বে। তার দশ মিলিয়ন টাকা তারা পরিশোধ করে দিয়েছে। এটা স্পন্সর মূলধনের পরিশোধিত মূলধন। আশি মিলিয়ন জনগণ থেকে উসুল করা হবে। এর মধ্যে বর্তমানে ষাট মিলিয়ন টাকার শেয়ার জারি করা হচ্ছে। বাকিটা ভবিষ্যতের কোনো প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। এ ষাট মিলিয়ন টাকা 'বিলিকৃত মূলধন'। ষাট মিলিয়ন টাকার মধ্যে লোকেরা পঞ্চাশ মিলিয়ন টাকার জন্য ফরম জমা দিয়েছে। এটা 'প্রতিশ্রুত মূলধন'।

যদি আবেদনপত্র বেশি আর জারিকৃত মূলধন কম হয়, তাহলে লটারি করা হয়। যাদের নাম লটারিতে আসে শুধু তাদের আবেদনপত্রই গ্রহণ করে তাদের অংশীদার বানানো হয়। মূলধনের তুলনায় আবেদনপত্র কম জমা হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। যত শেয়ার জারি করা হয়েছিল লোকেরা তার সবগুলো শেয়ার নেয় নি। এর থেকে উদ্ধারের জন্য ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে জামানত নেয়া হয়, যে শেয়ার জনগণ নেবে না সেটা আমরা নিয়ে নেব। এ জামানতকে অবলেখন বা দায় গ্রহণ 'ضمان الاكتتاب' (Under Writing) বলে।

ব্যাংক এ জামানতের উপর কোম্পানি থেকে কমিশনের হার নির্ধারণ করে। যেমন এ জামানতের উপর মোট মূলধনের শতকরা এক ভাগ আমি নেব। সর্বাবস্থায় ব্যাংক এ কমিশন নেয়। কোম্পানির শেয়ার তাকে নিতে হোক বা না হোক। তারপর যদি ব্যাংককে শেয়ার নিতে হয় তাহলে শেয়ার নিয়ে সাধারণত ব্যাংক নিজের কাছে রাখে না; বরং পরে এ শেয়ার বিক্রি করে দেয়।

এ জামানত এক ব্যাংক থেকেও নেয়া যায়। আবার অল্প অল্প মূলধনের উপর কয়েক ব্যাংক থেকেও নেয়া যায়।

www.pathagar.com

## কোম্পানির অংশ (শেয়ার)

মানুষ যখন কোম্পানির অংশ নিয়ে মূলধন পরিশোধ করে দেয় তখন অংশীদারদের কোম্পানি একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে, যেটা এ কথার সনদ হয় যে, এ ব্যক্তির কোম্পানিতে এতটুকু অংশ আছে। এ সার্টিফিকেটকে বাংলায় 'অংশ' আরবিতে 'سهم' এবং ইংরেজিতে Share বলে।

যত মূলধন নিয়ে কারবার চালু করা হয় সে মূলধনকে কতগুলো ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে এক একটি এককে এক অংশের (Share) মূল্য হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। যেমন আজকাল সাধারণত দশ টাকার শেয়ার জারি করা হয়। এ মূল্য শেয়ারের উপর লেখে দেয়া হয়। এটা ঐ অর্থ যা পরিশোধ করায় এ সর্টিফিকেট জারি করা হয়েছিল। এ মূল্যকে নামিক মূল্য বা আংকিক মূল্য, আরবিতে 'القيمة الاسمية' এবং ইংরেজিতে Face Value বা (Par Value) বলে।

শেয়ার জারি করার দুটি পদ্ধতি আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেয়ারের উপর অংশীদারের নাম লেখা থাকে, তাকে নিবন্ধিত শেয়ার 'السهم المسجل' (Registered Share) বলে। কখনো শেয়ার এভাবে জারি হয় যে, তার উপর কারো নাম লেখা থাকে না। যার হাতে থাকবে তাকেই তার মালিক মনে করা হবে। তাকে বাহক শেয়ার 'السهم لحامله' (Bearer Share) বলা হয়।

আমাদের দেশে বেশির ভাগ কোম্পানির শেয়ার রেজিস্টার্ডই হয়, কখনো বিয়ারারও হয়। যেমন এন আই টির[১] মধ্যে দুটো পদ্ধতিই চালু আছে।

অংশীদারদের অধিকার হিসেবে শেয়ারের একটি শ্রেণীবিভাগ আছে। অর্থাৎ লভ্যাংশ উসুল করা বা কোম্পানির পলিসিতে হস্তক্ষেপ করার হিসেবেও শেয়ার দুই প্রকার :

১. السهم العادى (Ordinary Share)।

২. السهم الممتاز (Preference Share) একে 'অগ্রাধিকার শেয়ার'ও

---

[১]. ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট- পাকিস্তানের একটি ঋণদান প্রতিষ্ঠানের নাম।

www.pathagar.com

বলে।

এ দুপ্রকারের শেয়ারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল, 'السهم الممتاز'-এর গ্রাহককে লভ্যাংশ বণ্টন অথবা মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে 'السهم العادى'-এর গ্রাহক থেকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। 'السهم الممتاز'-এর অগ্রাধিকারের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে।

১. 'السهم الممتاز'-এর লভ্যাংশ তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের বিশেষ হার অনুসারে নির্ধারিত হয় (যেমন তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের শতকরা দশভাগ [১০%])। প্রথমে 'السهم الممتاز'-এর গ্রাহকদের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করে তাদের নির্ধারিত লভ্যাংশ দেয়া হয়। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে 'السهم العادى'-এর গ্রাহকরা পায়। অন্যথায় তারা লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত থাকে।

কখনো এমন অবস্থাও হয়, কোনো বছর কোম্পানির কোনো লাভই হল না। এ অবস্থায়ও 'السهم الممتاز'-এর লভ্যাংশ নিশ্চিত থাকে। পরবর্তী বছর যখন লাভ হবে তখন আগে তার লভ্যাংশ দেয়া হবে, তারপর কিছু বাঁচলে 'السهم العادى'-কে প্রদান করা হবে।

২. কখনো অগ্রাধিকারের পদ্ধতি এমন হয় যে, 'السهم الممتاز'-এর লভ্যাংশের হার 'السهم العادى'-এর তুলনায় বেশি ধার্য করা হয়।

৩. কখনো অগ্রাধিকার এভাবে হয় যে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় 'السهم الممتاز'-এর গ্রাহকদের ভোটাধিকার থাকে, আর 'السهم العادى' -এর গ্রাহকদের ভোটাধিকার থাকে না।

৪. কখনো 'السهم الممتاز'-এর গ্রাহকদের বেশি ভোটের অধিকার আর 'السهم العادى'-কে কম ভোটের অধিকার দেয়া হয়। যেমন 'السهم الممتاز'-কে দুই ভোটের আর 'السهم العادى'-কে এক ভোটের অধিকার দেয়া হয় ।

মোটকথা, 'السهم الممتاز' অগ্রাধিকার শেয়ারের নাম। তবে অগ্রাধিকারের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত এর প্রয়োজন তখন হয় যখন বিশেষ কোনো বড় পার্টি (যেমন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি) থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে হয়। এখন সে সাধারণ অংশীদার (শেয়ারহোল্ডার) হিসেবে

www.pathagar.com

পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। কারণ তাতে লভ্যাংশ নির্ধারিত নয়। শুধু ঋণদাতার ন্যায় সুদের উপর ঋণ প্রদান করতেও সে আগ্রহী নয়। কারণ শুধু ঋণদাতা হিসেবে সে কোম্পানির পলিসিতে কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। এমন পার্টি থেকে পুঁজি সংগ্রহ করার জন্য তাকে অগ্রাধিকার শেয়ার প্রদান করা হয়। যাতে সে নির্ধারিত লাভও পায় এবং কোম্পানির অংশীদারও হয়। সুতরাং সে একদিক থেকে ঋণদাতা এবং অন্য দিক থেকে অংশীদার।

## কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কাঠামো

কোম্পানি একটি আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা, যে অস্তিত্ব লাভ করার পর কারবার করবে। যেহেতু সে প্রকৃত ব্যক্তি নয়, তাই এ আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তার প্রতিনিধিত্বের জন্য অংশীদারদের মধ্য থেকেই কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করা হয়, যারা কারবার পরিচালনা করে, তাকে বলা হয় পরিচালনা পর্ষদ 'مجلس الادارة' (Board of Directors)।

সকল শেয়ারহোল্ডারের ভোটের মাধ্যমে তারা নির্বাচিত হয়। এরপর এ বোর্ড অব ডাইরেক্টরস নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে পরিষদের প্রধান নির্বাচন করে, তাকে 'المنتدب العضو' (Chief Executive)[১] বলে।

এ চিফ এক্সিকিউটিভ বোর্ড অব ডাইরেক্টরসের মধ্য থেকেও হতে পারে। বাইরে থেকেও কাউকে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা যায়। তিনি বোর্ডের পলিসির অধীনে কাজ করেন।

শেয়ারহোল্ডারদের একটি বার্ষিক সম্মেলন হয়। একে বার্ষিক সাধারণ সভা 'الجمعية العمومية السنوية' (Annual General Meeting) বলা হয়। এরই সংক্ষিপ্ত নাম এ জি এম (A.G.M)। এর মধ্যে ব্যবসায়ের পলিসি, একাউন্টস (হিসাব), অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি পেশ করা হয়। পরবর্তীকালের জন্য পরিচালকবৃন্দ নির্বাচিত হন। প্রত্যেক শেয়ারের একটি করে ভোট হয়। যেমন কারো দশটি শেয়ার থাকলে তার দশটি ভোট থাকবে। বার্ষিক সভায় ভোট দেয়ার পর কোম্পানির ব্যবসায়ে

---

১. একে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Managing Director) সংক্ষেপে এম ডিও বলা হয়।

www.pathagar.com

শেয়ারহোল্ডারদের কোনো হস্তক্ষেপ চলে না।

কোম্পানি অস্তিত্ব লাভের পর তা বিলুপ্ত হবার মাত্র দুটি পথ আছে।[২] হয় এ জি এম-এর মধ্যে কোম্পানি বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, নয় তো কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তার ঋণ সম্পত্তি থেকে বেড়ে যায়। এ দুঅবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট আইনী প্রতিষ্ঠান থেকে কোম্পানি বিলোপ করার অনুমতি নেয়া জরুরি। আইনগত অনুমোদন ছাড়া কোম্পানির অস্তিত্ব বিলোপ করা যায় না। সাধারণত এমন অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে কোম্পানির সম্পত্তি ঋণদাতা বা শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টন করার জন্য একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হয়। তাকে রিসিভার (Receiver) বা বিলোপকারী (Liquidator) বলে।

## মুনাফা বণ্টন

কোম্পানি সারা বছর ব্যবসা করার পর বার্ষিক লভ্যাংশের হিসাব কষে স্থির করে, কত টাকা লাভ হল। তারপর এ লভ্যাংশের কিছু অংশ সতর্কতা হিসেবে সংরক্ষিত রাখে। যাতে পরবর্তীতে কোম্পানির কোনো লোকসান হলে তা দিয়ে ক্ষতি পোষানো যায়। তাকে আরবিতে 'احتياطى' এবং ইংরেজিতে Reserve বলে। এ সংরক্ষিত লভ্যাংশ সাধারণত বোর্ড অব ডাইরেক্টরস নির্ধারণ করে। তবে আইনগতভাবে তার একটা সীমা নির্ধারিত থাকে। কারণ সংরক্ষিত লভ্যাংশ নির্ধারণ করার পর বাকি লভ্যাংশের উপর ট্যাক্স আরোপিত হয়। ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্য কোনো কোম্পানির অতিরিক্ত লভ্যাংশ সংরক্ষিত লভ্যাংশের মধ্যে রেখে দেয়ার আশংকা থাকে। এ কারণে আইনগতভাবেও তার সীমা নির্ধারিত থাকে।

রিজার্ভ বের করার পর বাকি লভ্যাংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। কোম্পানির মূলত যে মুনাফা তা হচ্ছে লাভ 'الربح' (Profit)। আর যা সতর্কতামূলক সংরক্ষণ করা হল তা সংরক্ষিত তহবিল 'احتياطى' (Reserve)। অবশিষ্ট যে লভ্যাংশ বণ্টিত হবে তা বণ্টিত মুনাফা 'الربح الموزع' (Dividend)। প্রফিট (Profit) ও ডিভিডেন্ড (Dividend)-এর

---

[২]. আমাদের দেশে কোনো কোম্পানির বিলোপ সাধনের ৩টি পদ্ধতি আছে: ১. স্বেচ্ছাকৃত বিলোপ সাধন, ২. আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন, ৩. আদালতের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাকৃত বিলোপ সাধন।

www.pathagar.com

মধ্যে পার্থক্য হল, সর্বমোট লাভ হচ্ছে প্রফিট এবং সংরক্ষিত রাখার পর যা বণ্টিত হবে তা ডিভিডেন্ড। প্রফিট আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা কোম্পানির মুনাফা আর ডিভিডেন্ড শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা।

Dividend বণ্টনের দুটি রীতি চালু আছে। কখনো নগদ মুনাফা লোকদের প্রদান করা হয়। কখনো এ লভ্যাংশের দ্বিতীয়বার শেয়ার জারি করা হয়। এ ধরনের শেয়ারকে বোনাস শেয়ার (Bonus Share) বলে। বোনাস শেয়ার জারি করায় কোম্পানির মূলধন আরো বৃদ্ধি পায়। সাধারণত কোম্পানির ক্যাশ পজিশন দুর্বল হলে এমন করা হয়। অর্থাৎ তার কাছে নগদ টাকা কমে গেলে নগদ মুনাফা দেয়ার পরিবর্তে অতিরিক্ত শেয়ার জারি করা হয়। যেমন কোনো শেয়ারহোল্ডারকে দশ টাকা দেয়ার পরিবর্তে দশ টাকার শেয়ার প্রদান করা হয়। তবে অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে তার অবকাশ থাকতে হবে। যেমন আশি মিলিয়ন অনুমোদন হয়ে গেছে। তার মধ্যে ইতিপূর্বে ষাট মিলিয়ন জারি করা হয়েছিল। এখন বিশ মিলিয়নের অবকাশ আছে। অনুমোদিত মূলধনের মধ্যে যদি অতিরিক্ত করার অবকাশ না থাকে তাহলে আবার আবেদন করে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বোনাস শেয়ার জারি করার জন্য এটাও জরুরি যে, ঐ কোম্পানির শেয়ারের বাজারমূল্য (Market Value) 'قيمة اسمية' নামিক মূল্য (Face Value) থেকে কম হতে পারবে না। যদি বাজারে মূল্য কমে যায় তাহলে বোনাস শেয়ার জারি করলে শেয়ারহোল্ডারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন দশ টাকার শেয়ারের মূল্য যদি বাজারে নয় টাকা হয় তাহলে অংশীদাররা দশ টাকার স্থানে পাবে নয় টাকার শেয়ার। তাদের এক টাকা লোকসান হবে।

## 'লিমিটেড' কোম্পানির ধারণা

লিমিটেড কোম্পানিকে 'الشركة المحدودة' বলা হয়। তার অর্থ 'مسئولية' (Liability), অর্থাৎ দায় সীমিত হওয়া। লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার গ্রাহকগণের দায় তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন পর্যন্ত সীমিত থাকে। অর্থাৎ যদি কোম্পানি লোকসান দেয় তাহলে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষতি এতটুকু হবে যে, তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি নষ্ট হবে। কোম্পানির উপর ঋণ যদি বেশি হয় তাহলে শেয়ার গ্রাহকদের থেকে তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির বেশি

www.pathagar.com

দাবি করা যাবে না। তেমনিভাবে কোম্পানির দায়ও তার সম্পত্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। ঋণ পরিশোধের জন্য বেশির বেশি কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করানো যেতে পারে। সম্পত্তির অধিক দাবি করা যাবে না। এ কারণে লিমিটেড কোম্পানির নামের সাথে 'লিমিটেড' লেখা জরুরি। যাতে ঋণদাতা একথা জেনেই ঋণ দেয়, এ ঋণগ্রহীতার দায় সীমাবদ্ধ।

সাধারণভাবে কোম্পানি লিমিটেডই হয়। কিন্তু কখনো অংশীদারিত্বও (Partnership) লিমিটেড হয়।

## প্রাইভেট কোম্পানি

কোম্পানি দু প্রকার। ১. পাবলিক কোম্পানি 'شركة عامة', ২. প্রাইভেট কোম্পানি 'شركة خاصة'। এ পর্যন্ত যে বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তা পাবলিক কোম্পানির আলোচনা। প্রাইভেট কোম্পানিও একটি আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা, কিন্তু তার অংশীদারদের সংখ্যা হয় সীমিত (যেমন আমাদের দেশে কমপক্ষে দুই এবং সর্বাধিক পঞ্চাশ অংশীদার হতে পারে)। এখানে মূলধনের শেয়ার জারি করা হয় না, প্রসপেক্টাস প্রকাশ করা হয় না। শেয়ার বাজারে (স্টক এক্সচেঞ্জ) তার শেয়ার বিক্রি হয় না। আইনগতভাবে প্রাইভেট কোম্পানির নামের সাথে 'প্রাইভেট' লেখা জরুরি।

## অংশীদারিত্ব ও কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য

অংশীদারিত্বকে Partnership আরবিতে 'الشركة' (শীন যের এবং রা সাকিন বিশিষ্ট) বা 'شركة الاشخاص', আর কোম্পানিকে 'شركة المساهمة' (শীন যবর ও রা যের বিশিষ্ট) বলে। অংশীদারিত্ব ও কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে :

১. অংশীদারিত্বের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যৌথভাবে (مشاع) কারবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। প্রত্যেক অংশীদার অন্য অংশীদারের উকিল হয়। সকলের দায়িত্ব হয় একই রকম। যেমন কোনো ঋণ আরোপিত হলে সকল অংশীদার সমানভাবে দায়বদ্ধ হবে, কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। কোম্পানি একটি 'আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা'। তার একটি পৃথক অস্তিত্ব এবং অংশীদারদের পৃথক অস্তিত্ব আছে। শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির সম্পত্তির অংশীদার ঐ সীমা পর্যন্ত যে, যদি কোম্পানি বিলোপ হয় এবং তার সম্পত্তি বণ্টন হয় তাহলে সে আনুপাতিকহারে অংশ পাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু কোম্পানি বিলোপ হওয়ার আগে আইন শেয়ারহোল্ডারদের সে কোম্পানির সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয় না। এ কারণে যদি কোনো শেয়ারহোল্ডার ঋণগ্রস্ত হয় এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় তাহলে তার হাতে যে শেয়ার আছে সেগুলো বাজেয়াপ্ত হবে, কিন্তু তার শেয়ার অনুপাতে কোম্পানির সম্পত্তিতে সে যে অংশ পাবে সেটা বাজেয়াপ্ত হবে না। কারণ আইনগতভাবে কোম্পানির সম্পত্তির উপর তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

২. অংশীদারিত্বের মধ্যে কারবারের পক্ষ থেকে কারো উপর অভিযোগ করা হলে বা অন্য কারো পক্ষ থেকে কারবার অভিযুক্ত হলে সব অংশীদার অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত হবে। কিন্তু কোম্পানি নিজেই একটি আইনসম্মত সত্তা। সুতরাং কোম্পানি নিজেই অভিযোগকারী বা অভিযুক্ত হবে। শেয়ারহোল্ডারগণ হবে না। আদালতে এ আইনসম্মত সত্তার প্রতিনিধিত্ব করবে ব্যবস্থাপনা পরিষদের কোনো লোক।

৩. অংশীদারিত্বের পৃথক কোনো আইনগত অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু কোম্পানির পৃথক আইনগত অস্তিত্ব থাকে। যাকে বলা হয় আইসম্মত ব্যক্তিসত্তা।

৪. অংশীদারিত্বের মধ্যে কোনো অংশীদার অংশীদারিত্ব প্রত্যাহার করে নিজের মূলধন ফেরৎ নিতে চাইলে নিতে পারবে, কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে নিজের মূলধন ফেরৎ নেয়া যায় না। তবে শেয়ার বিক্রি করা যেতে পারে।

৫. অংশীদারিত্বের মধ্যে সাধারণত দায়দায়িত্ব কারবারের সম্পত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু কোম্পানির ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব হয় সীমিত।

## কোম্পানির তহবিল সংগ্রহ

কোম্পানির মধ্যে প্রাথমিকভাবে কিছু মূলধন Sponsers অর্থাৎ কোম্পানির উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে থাকে। মূলধনের বিরাট অংশ শেয়ার ছেড়ে জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু সাধারণত এ মূলধন কোম্পানির জন্য যথেষ্ট হয় না। সময়ে সময়ে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজনও দেখা দেয়। এর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

১. কখনো অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করার জন্য কোম্পানি অতিরিক্ত শেয়ার ছাড়ে। অনুমোদিত (Authorised) মূলধনে তার অবকাশ থাকলে ভাল, নইলে পুনরায় অনুমতি নিতে হয়। এখন জারিকৃত শেয়ারের

www.pathagar.com

ব্যাপারে পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তারা নতুন শেয়ার নিতে চাইলে নিতে পারবে। যে নতুন শেয়ারের মধ্যে পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের অগ্রাধিকার থাকে তাকে বলা হয় অধিকার বা রাইট শেয়ার 'سهام الاولوية' (Right Shares)।

শুফআর অধিকারের সাথে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এতে পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের দুটো লাভ হয়। ক. সাধারণত কোম্পানি ব্যবসা শুরু করার পর শেয়ারের বাজারমূল্য (Market Value) নামিক মূল্যের (Face Value) থেকে বেশি হয়। এ কারণে তা কিনলে লাভ হয়। পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের এ লভ্যাংশ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। যেমন ধরুন, নামিক মূল্য আছে দশ টাকা আর বাজারমূল্য বিশ টাকা। তাহলে শেয়ার পাওয়া যাবে দশ টাকায় আর বিক্রি হবে বিশ টাকায়। সুতরাং শেয়ার গ্রহণকারীদের দশ টাকা লাভ হবে। খ. দ্বিতীয় লাভ হচ্ছে, বর্ধিত মূলধনের শেয়ার জারি করায় শেয়ারহোল্ডারদের অংশীদারিত্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। তাদেরকে তাদের আংশিক পরিমাণ বহাল রাখার জন্য নতুন শেয়ার ক্রয় করার অগ্রাধিকার দেয়া হয়। যেমন ধরুন, প্রথমে কোম্পানির এক লাখ টাকার মূলধন বিনিয়োগ হয়েছিল, যার মধ্য থেকে একজন দুই হাজার টাকার শেয়ার কিনেছে। তাহলে তার অংশীদারিত্বের অনুপাত হয় শতকরা দুই ভাগ। এখন যদি কোম্পানি বর্ধিত আরো এক লাখ টাকার শেয়ার জারি করে তাহলে কোম্পানির মূলধন হবে দু লাখ। তখন দুই হাজারের অনুপাত দুই লাখের মধ্যে শতকরা এক ভাগ হবে। এ কারণে তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় আরো দুহাজার টাকার শেয়ার গ্রহণ করে পুনরায় দুই শতাংশ অনুপাত বহাল রাখতে।

২. অতিরিক্ত শেয়ার জারি করার মধ্যে কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন মূলধন অনুমোদনের নির্ধারিত সীমা ও শর্ত থাকে, অংশীদার বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের অসুবিধার কারণে অনেক কোম্পানি বর্ধিত শেয়ার জারি করার পদ্ধতি পছন্দ করে না; বরং বর্ধিত মূলধন সংগ্রহের জন্য ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ গ্রহণের দুটি প্রক্রিয়া আছে।

ক. ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়, যা সাধারণত সুদের উপর নেয়া হয়।

www.pathagar.com

খ. জনসাধারণকে শেয়ার গ্রহণ নয়; বরং ঋণ প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এর জন্য কোম্পানি দু-ধরনের সনদ জারি করে, যেগুলো গ্রহণ করে জনগণ ঋণ প্রদান করে।

## ১. সনদ (Bond)[১]

বন্ড নির্ধারিত মেয়াদের জন্য জারি করা হয়। সে সময় পর্যন্ত তার উপর বার্ষিক সুদ পাওয়া যায়। মেয়াদ কখনো বেশি হয় কখনো কম হয়। এমনও দেখা গেছে, বন্ড নিরানব্বই বছরের জন্য জারি করা হয়েছে। বন্ড গ্রাহক মেয়াদ পূরণ হওয়ার আগে তা বিক্রিও করতে পারে।

## ২. ডিবেঞ্চার 'شهادة الاستثمار' (Debenture)[২]

বন্ড ও ডিবেঞ্চারের মধ্যে এতটুকু ব্যাপারে মিল রয়েছে যে, এ দুটোর গ্রাহক কোম্পানির অংশীদার হয় না, শুধু ঋণদাতা হয়, কোম্পানির পক্ষ থেকে যাকে বার্ষিক সুদ প্রদান করা হয়। আর ফেরৎ চাইলে তার টাকা ফেরত দেয়া হয়। এ দুয়ের মধ্যে দুদিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এক তো হল এই, বন্ড শুধু ঋণের দলিল। কখনো ঋণের বন্ডকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য একটি সনদ জারি করা হয়। তার মধ্যে ঐ বন্ডকে কোম্পানির কোনো একটি সম্পত্তি বা অনেকগুলো সম্পত্তির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়, যদি এ ঋণ পরিশোধ না হয় তাহলে ঐ সম্পত্তি থেকে পরিশোধ করা হবে। একে ডিবেঞ্চার (Debenture) বলে। যেন বন্ড ঋণের দলিল আর ডিবেঞ্চার তার জামানতের প্রমাণপত্র। দ্বিতীয় পার্থক্য হল, কোম্পানি যদি দেউলিয়া হয়ে যায় তাহলে সম্পত্তির উপর যেসব মানুষের প্রাপ্য থাকে তাদের প্রাপ্যসমূহ পরিশোধের আইনগত পর্যায়ক্রম থাকে। এ বিন্যাসে ডিবেঞ্চার ঐ সম্পত্তির মধ্যে অগ্রাধিকার পাবে যাকে জামানত বানানো হয়েছিল। বন্ডের ঋণ পরিশোধ হবে তার পরে।

এক প্রকার বন্ড আছে যার মধ্যে গ্রাহকের এ অধিকার থাকে, সে বন্ডকে শেয়ারে পরিবর্তন করতে পারবে। প্রথমে সে ঋণদাতা ছিল, এখন কোম্পানির অংশীদার হবে। তার জন্য কখনো সময় নির্ধারিত থাকে, এতদিন পরে শেয়ারে পরিবর্তন করতে পারবে। আবার কখনো সময়

---

১. বাংলায় একে সাধারণ ঋণপত্র বা জামানতবিহীন ঋণপত্র বলে।

২. একে বাংলায় বন্ধকী ঋণপত্র বলে।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট থাকে না, কখনো বিশেষ শর্তারোপ করা হয়, কখনো করা হয় না। এরূপ বন্ডকে রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র 'سندات قابلة للتحويل' (Convertible Bonds) বলে।

## ৩. ইজারা

মূলধন সংগ্রহের জন্য আরো একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে, যাকে 'ইজারা' বা লিজ (Leasing) বলা হয়। লিজ দু-ধরনের হয়। এক. অপারেটিং লিজ (Opearting Leas), যা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে। এতে প্রকৃতপক্ষে লিজদাতা ও লিজগ্রহীতা উভয় পক্ষের সম্পর্ক থাকে। এ ইজারা পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যম নয়। পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যম হয় অন্য প্রকারের ইজারা, যাকে ফাইন্যান্সিয়াল লিজ (Financial Lease) বলে। তার ব্যাখ্যা হল, ইজারার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এখানে আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং কোম্পানির স্থাবর সম্পত্তির (যেমন মেশিনারি) প্রয়োজন। এখন কোম্পানি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজে মেশিনারি ক্রয় করার পরিবর্তে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বলল, এ মেশিনারি ক্রয় করে আমাকে ভাড়া দাও। এ সময়ে সে যন্ত্রপাতির মালিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হবে এবং কোম্পানি সেটা ব্যবহার করবে ভাড়াগ্রহণকারী হিসেবে। একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য এমন হারে ভাড়া নির্ধারিত হয়, যাতে তা দ্বারা যন্ত্রপাতির মূল্যও পরিশোধ হয়ে যায় এবং এ মেয়াদের জন্য যদি এ অর্থ ঋণ দেয়া হত তাহলে তার উপর যে সুদ পাওয়া যেত তাও পরিশোধ হয়ে যায়। এ মেয়াদ অতিবাহিত এবং ভাড়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হারে সুদসহ যন্ত্রপাতির মূল্য পরিশোধ হয়ে গেলে এ মেশিনপত্র আপনা আপনি কোম্পানির মালিকানায় চলে আসবে। একথা কখনো চুক্তিপত্রে লেখা থাকে আবার কখনো লেখা থাকে না, তবে এভাবেই প্রচলিত আছে।

ঋণের বদলে ইজারার এ পদ্ধতি গ্রহণের দুটি উদ্দেশ্য থাকে। ১. এর কারণে কোনো কোনো অবস্থায় ট্যাক্স থেকে বাঁচা যায় বা ট্যাক্স কম আসে। ২. ঋণ পরিশোধের জন্য ইজারা পদ্ধতি ঋণের তুলনায় অধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ ইজারায় মেশিনপত্র ইজারাদাতার মালিকানায় থাকে। তার উপর তারই লেভেল লাগানো থাকে। টাকা যদি ফেরৎ না পাওয়া যায় তাহলে লিজদাতার কোনো ভয়ের কারণ থাকে না। কারণ মেশিনপত্র তার মালিকানায় রয়েছে।

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ্য, ফাইন্যান্সিয়াল লিজিং দ্বারা এক অর্থে যেহেতু মূলধন সংগ্রহে সাহায্য নেয়াই উদ্দেশ্য, তাই একে ফান্ড সরবরাহের একটা পদ্ধতি গণ্য করে 'تمويل' (Financing)-এর অধীনে আনা হয়েছে। না হয় প্রকৃতপক্ষে এটা 'تمويل' (Financing) নয়। কারণ ফাইন্যান্সিং হল, যার মধ্যে কোনো বস্তু কোম্পানির মালিকানায় আসে। আর এখানে ঐ মেশিনপত্র এখনো কোম্পানির মালিকানায় আসে নি।

## কোম্পানির হিসাব-নিকাশ

প্রত্যেক কোম্পানি নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করে। হিসাব সংরক্ষণের নীতিমালাও রয়েছে। হিসাবরক্ষণ একটি নিয়মতান্ত্রিক শাস্ত্র। তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও জরুরি। কারণ লেনদেন বুঝার জন্য তারও যথেষ্ট প্রয়োজন পড়ে।

## ব্যালান্স শিট (Balance Sheet)

কোম্পানির মালিকানাধীন অর্থ-সম্পদকে বাংলায় 'সম্পত্তি', আরবিতে 'موجودات' বা 'اصول' এবং ইংরেজিতে Assets বলে। অন্যের যে হক কোম্পানির উপর আরোপিত হয় তাকে 'দায়', আরবিতে 'ديون' বা 'حقوق' বা 'مطلوبات' এবং ইংরেজিতে Liabilities বলে।

কোম্পানি বছরে একবার অথবা কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক কার্যক্রমকালে তার সব দায় ও সম্পত্তির বিবরণ তৈরি করে। তাকে 'لائحة الرصيد' (Balance Sheet) বলে। ব্যালান্স শিটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল, একদিকে কোম্পানির সম্পত্তি এবং অন্যদিকে দায়সমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়। 'সম্পত্তি' বলতে কোম্পানির সম্পদ এবং আদায়যোগ্য (Receivable) মাল বুঝায়। আর দায় বলতে বুঝায় ঐসব আর্থিক দেনা যা কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হবে। তারপর উভয়ের মাঝে আনুপাতিক পরিমাণ দেখা হয়। এ আনুপাতিক পরিমাণের উপর কোম্পানির সুনাম ও প্রতিষ্ঠা বিবেচিত হয়।

দায় ও সম্পত্তির মধ্যে কী অনুপাত হওয়া উচিৎ, এ ব্যাপারে সাধারণত মনে করা হয়, অনুপাত যদি ১ঃ২, অর্থাৎ সম্পত্তি দায়ের তুলনায় দ্বিগুণ হয় তাহলে সে কোম্পানিকে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি মনে করা হয়। সুতরাং এরূপ কোম্পানিকে ব্যাংক ইত্যাদি ঋণ দিতে বেশি আগ্রহী হয়।

www.pathagar.com

ব্যালান্স শিট তৈরি করার নিয়মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এরূপ : একদিকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কোম্পানির সম্পত্তি লেখা হয়।

## সম্পত্তিসমূহ

একে আরবিতে 'موجودات' এবং ইংরেজিতে Assets বলে।

সম্পত্তি তিন প্রকার–

**১. চলতি মূলধন (Current Assets) :** তাকে আরবিতে 'موجودات متداولة' বলা হয়। যা হয় নগদ অর্থ বা সহজে নগদায়ন করা যায় এমন বস্তু। এর মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ক. নগদ অর্থ (Cash), খ. কোম্পানির আদায়যোগ্য অর্থ (Accounts Receivable)। যেমন কোম্পানি কোনো বস্তু বিক্রি করেছে, তার মূল্য এখনো উসুলাধীন। গ. কোম্পানি যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে তার দলিল ও রসিদ নিজের কাছে সংরক্ষণ করে থাকে তাহলে সেটাও তার সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হবে, যেমন বন্ড প্রভৃতি। তাকে বলে Notes Receivable। ঘ. অন্য কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে যে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং সেখানকার অর্থ আদায় নিশ্চিত (Investments)।

**২. স্থাবর সম্পত্তি (Fixed Assets) :** আরবিতে তাকে 'موجودات ثابتة' বলা হয়। এর অর্থ অনগদ সম্পত্তি, যা সহজে নগদায়নযোগ্য নয়। যেমন– যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং ইত্যাদি।

**৩. অবস্তু সম্পত্তি (Intangible Assets) :** যাকে আরবিতে 'موجودات غيرمادية' বলা হয়। এমন বস্তু যাকে বস্তুগতভাবে চেনা যায় না, যেমন– গুডউইল (সুনাম)। তার মূল্যও হিসাব করা হয় এবং বেচাকেনাও হয়। কিন্তু এটা কোনো অনুভবযোগ্য বস্তুগত জিনিস নয়। অথবা কোনো ব্যবসায়ের এডভারটাইজিংয়ে (প্রচার) অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ প্রচার দ্বারা কয়েক বছর পর্যন্ত উপকার হবে। এটাও অবস্তু সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হবে।

সম্পত্তির বিবরণ লেখার পর তা সংগ্রহের মাধ্যম এবং তার জন্য মূলধন সংস্থানের (Financing) উৎসও লেখা হয়।

সম্পত্তির মূল্য বিভিন্ন রকমের হয়। এক রকম মূল্য হল, ক্রয় করার সময়ের মূল্য। তারপর ব্যবহারের পর পুরাতন হওয়ার কারণে তার মূল্য কমে যায়। সময় অতিবাহিত হলে মূল্য বৃদ্ধিও পায়, কিন্তু যেহেতু এ মূল্য

www.pathagar.com

পরিবর্তনের সঠিক পরিমাণ অনুমান করা কঠিন। এ কারণে ব্যালান্স শিটে সম্পত্তির সে মূল্য ধরা হয় যে মূল্যে তা ক্রয় করা হয়েছিল। তাকে বলা হয় বইয়ের মূল্য (Book Value)। যেহেতু এ সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য সাধারণত বিভিন্ন রকম হয়, এ কারণে সাধারণত ব্যালান্স শিট থেকে কোম্পানির অবস্থার প্রকৃত রূপ ফুটে উঠে না; বরং আনুমানিক ও সম্ভাব্য ধারণা হয় মাত্র। এর ভিতর ধোঁকা-প্রতারণাও চলে।

ব্যালান্স শিটের দ্বিতীয় অংশে 'দায়সমূহ' লেখা হয়, অর্থাৎ যে অর্থ কোম্পানির পরিশোধ করতে হবে। দায়ের মধ্যে কর্মচারীদের বেতন, কোনো ক্রয়কৃত জিনিসের মূল্য যা পরিশোধ করতে হবে, ধারকৃত মূলধন যা পরিশোধ করতে হবে এবং এ ধরনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দায় লেখার রীতি হল, প্রথমে দীর্ঘমেয়াদী দায় লেখা হয়। যেমন ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে যা পাঁচ বছর পর পরিশোধ করতে হবে, এমন দায়কে Long Time Liabilities বলে। তারপর চলতি দায়সমূহ লেখা হয়, যা অল্প দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। যেমন কর্মচারীদের বেতন, ট্যাক্স, ক্রয়কৃত কোনো জিনিসের বিল যা পরিশোধ করতে হবে, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যে অংশ এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে ইত্যাদি। এমন দায়কে বলা হয় Current Liabilities।

## নিট মূলধন

সম্পত্তির মধ্যে থেকে দায়সমূহ বাদ দিয়ে যে অবশিষ্টাংশ উদ্বৃত্ত থাকে তাকে নিট মূলধন 'المالية الصافية' (Net Worth) বলে। প্রকৃতপক্ষে অংশীদারগণ এ অর্থেরই মালিক হয়।

## লাভ-লোকসানের পরিমাপ

ব্যালান্স শিট তো কোম্পানির আর্থিক সামর্থ্য জানার জন্য তৈরি হয়। এর সাথে কোম্পানির কত লাভ বা ক্ষতি হল তার কোনো সম্পর্ক নেই। লাভ-ক্ষতির বিবরণ দেয়ার জন্য যে রিপোর্ট তৈরি করা হয় তাকে আয়-বিবরণী, আরবিতে 'اللائحة المالية' বা 'البيان المالي' এবং ইংরেজিতে Income Statement বলে। তার বিন্যাস নিম্নরূপ :

মোট বিক্রয় (Gross Sales)
ফেরত (Returns)
নিট বিক্রয় (Net Sales)
প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Expenses)

www.pathagar.com

মোট লাভ (Gross Profit)
পরোক্ষ ব্যয় (Indirect Expenses)
নিট লাভ (ট্যাক্সের পূর্বে) [Net Profit (Pre Tax)]
ট্যাক্স (Tax)
নিট মুনাফা (ট্যাক্সের পর) [Net Profit (After Tax)]
সংরক্ষিত তহবিল (Reserve)
বণ্টনযোগ্য মুনাফা (Dividend)

'ফেরত' হল বিক্রির পর যে পণ্য ফেরত নিতে হয়। যেহেতু সেগুলো বিক্রীত পণ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, তাই তা বাদ দিয়ে যা বিক্রীত থাকবে সেগুলোই নিট 'বিক্রয়'। 'প্রত্যক্ষ ব্যয়' বলতে সে বস্তু প্রস্তুত করতে যে ব্যয় হয়েছে তা বুঝায়, যা কোম্পানির মূল ব্যবসায়িক পণ্য। যেমন, যদি মিল হয় তাহলে তার কাঁচা মাল ক্রয়ের জন্য যে ব্যয় হবে তা প্রত্যক্ষ ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হবে। যদি কোনো পত্রিকা হয় তাহলে তার ছাপা ও কাগজের ব্যয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। 'নিট বিক্রি' থেকে এ ব্যয় বাদ দিলে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা কোম্পানির 'মোট লাভ'। 'পরোক্ষ ব্যয়' হল বিক্রীত বস্তু তৈরির সাথে যে ব্যয় সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। যেমন অফিসের জন্য বিল্ডিং ভাড়া, সম্পাদকের বেতন ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ ব্যয় আর পরোক্ষ ব্যয়ের মধ্যে কার্যত পার্থক্য হল, প্রত্যক্ষ ব্যয় তখন হবে যখন পণ্য প্রস্তুত হবে। যদি পণ্য প্রস্তুত না হয় তাহলে ব্যয় হবে না। তারপর পণ্য বেশি তৈরি হলে খরচও বেশি হবে, আর কম তৈরি হলে খরচও কম হবে। আর পরোক্ষ ব্যয় সর্বাবস্থায় চালু থাকবে, প্রোডাকশন হোক বা না হোক অথবা কম হোক বা বেশি হোক। 'মোট লাভ' থেকে এ ধরনের ব্যয় বাদ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা 'নিট মুনাফা' (ট্যাক্সপূর্ব)। এর থেকে সরকারকে প্রদেয় ট্যাক্স বাদ দেয়ার পর বাকিটা 'নিট মুনাফা' (ট্যাক্স পরবর্তী)। এ নিট মুনাফার কিছু অংশ সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তর করার পর যে মুনাফা অবশিষ্ট থাকে তাকে 'বিতরণযোগ্য মুনাফা' (Distributable Profit) বলে।

ইনকাম স্টেটমেন্টে যে নিট মুনাফা দেখানো হয় তা নগদ ক্যাশ আকারে থাকা জরুরি নয়। কখনো এমন হয়, কোম্পানি প্রচুর মুনাফা দেখায়, কিন্তু তার কাছে নগদ টাকা সে পরিমাণ থাকে না, বরং সেটা প্রোডাকশনে লাগানো থাকে। এরূপ অবস্থায়ই 'বোনাস শেয়ার' জারি করার প্রয়োজন হয়।

www.pathagar.com

# শেয়ার বাজার

# (Stock Exchange)

কোম্পানির বিধানগুলো বুঝার জন্য 'শেয়ার বাজার'-এর মৌলিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়াও গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি।

## পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

যখন কোনো ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করে তার অংশীদার হয়ে যায়, তখন আর তার পক্ষে নিজের অর্থ ফেরত নিয়ে অংশীদারিত্ব বাতিল করা সম্ভব নয়। বরং যতদিন পর্যন্ত কোম্পানির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন তা থেকে শেয়ারের টাকা ফেরত নেয়া যাবে না। কিন্তু যেহেতু অনেক অংশীদার তার অংশীদারিত্ব শেষ করে নিজের অংশ নগদ অর্থে পরিবর্তন করতে চায়, তাই এ জামানত প্রদান করা জরুরি যে, অর্থ লাগানোর পর প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজের শেয়ার নগদ অর্থে পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। এর জন্য শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে শেয়ার বেচা যায়। অর্থাৎ কোম্পানির অংশীদার তার অংশ প্রত্যাহার করে কোম্পানি থেকে নিজের মূলধন ফেরত আনতে পারবে না। কিন্তু শেয়ার বাজারে সে নিজের শেয়ার অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে। যার ফলে ক্রেতা তার স্থলে কোম্পানির অংশীদার হয়ে যাবে। যেখানে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে 'শেয়ার বাজার' (Stock Exchange) বলে।

শেয়ার কেনাবেচার দুটি পদ্ধতি আছে। এক হল– দুব্যক্তির কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম ছাড়া শেয়ার কেনাবেচা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শেয়ার কেনাবেচা হওয়া। সে প্রতিষ্ঠানটিই 'স্টক এক্সচেঞ্জ'। সে শেয়ার কেনাবেচার তত্ত্বাবধান করে এবং মাধ্যমও হয়। তাকে আরবিতে 'بورصة' বলে। স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যম ছাড়া শেয়ারের যে কারবার হয় তাকে 'عمليات من وراء المنصة' (Over The Counter Transactions) বলে। এ ধরনের কেনাবেচার কোনো বিশেষ নিয়ম নেই, তাই তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানারও প্রয়োজন নেই। যে কেনাবেচা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হয় তার কিছু ব্যাখা জানা জরুরি।

www.pathagar.com

স্টক এক্সচেঞ্জ একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান।[১] যা সরকারের অনুমতি ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচার কাজ করে। তবে যেসব কোম্পানি নির্ভরযোগ্য এবং কিছু না কিছু সুনাম থাকে, স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের শেয়ারের কারবার করে। যেসব কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় স্টক এক্সচেঞ্জে হয় তাকে তালিকাভুক্ত কোম্পানি (Listed Companies) বলে। এরূপ কোম্পানির শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় স্টক এক্সচেঞ্জেও হতে পারে আবার 'ওভার দ্য কাউন্টারে'ও হতে পারে। কোনো কোম্পানির লিস্টিং বা তালিকাভুক্তি কখনো তার অস্তিত্ব লাভের পর হয়। কখনো কোম্পানির অনুমোদন পাওয়ার পর তার কারবার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে; বরং কখনো শেয়ার ফ্লোট হওয়ারও পূর্বে কোম্পানির লিস্টিং হয়ে যায়, তাকে সাময়িক (Provisional) লিস্টিং বলে। তার কাউন্টারও ভিন্ন হয়। যে কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ গ্রহণ করে না তাকে অতালিকাভুক্ত কোম্পানি (Unlisted Companies) বলে। তাদের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শুধু 'ওভার দ্য কাউন্টারে' হতে পারে, স্টক এক্সচেঞ্জে হতে পারে না।

## মেম্বারশিপ

স্টক এক্সচেঞ্জে প্রত্যেক ব্যক্তিই শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করতে পারে না, তার জন্য সদস্য হওয়া জরুরি। সদস্য হওয়ার জন্য ফিসও দিতে হয়। সদস্য হওয়া এজন্য জরুরি, স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের ব্যবসায় অত্যন্ত ব্যাপক, জটিল ও শাস্ত্রিক ধরনের। সেখানের বিশেষ পরিভাষা থাকে। একজন অনভিজ্ঞ লোক এ ব্যবসায়ে ভুলও করতে পারে। আর সেখানে অনুষ্ঠিত সকল লেনদেন পরিশোধের জিম্মাদার হয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে তার কর্মকাণ্ডের জিম্মাদার সে হতে চায় না। এ কারণে মেম্বার হওয়া অত্যাবশ্যক করা হয়েছে।

## স্টক এক্সচেঞ্জে দালালি

স্টক এক্সচেঞ্জের একজন সদস্য নিজের জন্যও শেয়ার ক্রয় করে। আবার দালাল হিসেবে কমিশন নিয়ে অন্যের জন্যও ক্রয় করে। সদস্য নয়

---

[১]. আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ' এবং ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ' পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

www.pathagar.com

এমন কাউকে শেয়ার ক্রয় করতে হলে কোনো দালালের মাধ্যমে ক্রয় করতে হবে। শেয়ার ক্রয়ের জন্য দালালকে অর্ডার দেয়ার তিনটি পদ্ধতি আছে :

**১. মার্কেট অর্ডার (Market Order) :** যে অর্ডারে দালালকে বলা হয়, মার্কেটে যে রেটই থাকুক সে রেটে অমুক কোম্পানির শেয়ার কিনুন।

**২. লিমিটেড অর্ডার (Limited Order) :** একটি মূল্য নির্দিষ্ট করে অর্ডার দেয়া হয়, যদি এ মূল্যে শেয়ার পাওয়া যায় তাহলে কিনুন। এর চেয়ে বেশি মূল্যে কিনবেন না।

**৩. স্টপ অর্ডার (Stop Order) :** শেয়ারের মালিক তার শেয়ার বিক্রয়ের শর্তযুক্ত অর্ডার দিল, যদি এর মূল্য স্থির থাকে বা বাড়তে থাকে তাহলে শেয়ার বিক্রি করবেন না। আর যদি মূল্য কমতে থাকে তাহলে বিক্রি করে দেবেন।

## শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ

বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের মূল্য কম বেশি হয়। এর মধ্যে কোম্পানির সম্পত্তিরও প্রভাব থাকে। সম্পত্তি বাড়লে মূল্য বাড়ে, কিন্তু সম্পত্তি ছাড়া আরো কয়েকটি সাময়িক কারণেও মূল্য প্রভাবিত হয়। যেমন মুনাফার সম্ভাবনা, যোগান ও চাহিদার প্রভাব, রাজনৈতিক অবস্থা, পরিবেশগত অবস্থা, অবস্তুক কারণ যেমন বিভিন্ন গুজব ও অনুমান থেকেও মূল্য প্রভাবিত হয়। যেহেতু মূল্যের উঠা-নামায় সাময়িক কারণও প্রভাব ফেলে, এ কারণে শেয়ারের মূল্য দ্বারা কোম্পানির সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না। কোনো কোম্পানির শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সে শেয়ারের মার্কেটকে স্টক এক্সচেঞ্জের পরিভাষায় Bull Market বলে। আর কম হলে তাকে বলে Bear Market।

## শেয়ার ক্রেতার শ্রেণীবিভাগ

দুধরনের শেয়ার ক্রেতা আছে :

১. কিছু লোক কোম্পানির অংশীদার হওয়ার জন্য শেয়ার ক্রয় করে এবং শেয়ার নিজের কাছে রেখে বার্ষিক লভ্যাংশ অর্জন করে, তবে এমন লোক খুব কম।

www.pathagar.com

২. অধিকাংশ লোক শেয়ারকেই সরাসরি ব্যবসায়িক পণ্য গণ্য করে তার ক্রয়-বিক্রয় করে। যখন শেয়ারের মূল্য কম হয় তখন ক্রয় করে আর যখন মূল্য বাড়ে তখন বিক্রি করে ফেলে। উভয় মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য হয় তাই তাদের মুনাফা। মূল্য বৃদ্ধির কারণে যে মুনাফা অর্জিত হয় তাকে Capital Gain বলে। এ ব্যবসায়ে প্রথমে আন্দাজ অনুমান করতে হয়, কোন্ শেয়ারের মূল্য ভবিষ্যতে কমতে এবং কোন্ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এ ধারণাকে বলা হয় Speculation। এ ধারণা কখনো সঠিক আবার কখনো ভুলও হয়।

# শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রক্রিয়া

শেয়ার বিক্রির তিনটি পদ্ধতি আছে :

**১. নগদ বিক্রি (Spot Sale) :** এটা বেচাকেনার সাধারণ প্রক্রিয়া। কোনো ব্যক্তি শেয়ার দিয়ে তার মূল্য আদায় করে নেয়। এ নগদ বিক্রিতেও শেয়ারের সার্টিফিকেট সাধারণত এক সপ্তাহ পর হস্তগত হয়।

**২. Sale On Margin :** এর অর্থ শেয়ারের এমন বেচাকেনা, যার মধ্যে শেয়ারের মূল্যের শতকরা কিছু অংশ সাথে সাথে পরিশোধ করতে হয় আর বাকিটা ঋণ থাকে। যেমন দশ শতাংশ মূল্য পরিশোধ করে দিল আর বাকি নব্বই শতাংশ ঋণ। সাধারণত এর প্রক্রিয়া হয় এমন, সচরাচর যে শেয়ার কিনে তার সাথে দালালদের সম্পর্ক থাকে। কোনো ব্যক্তি দালালকে বলল, অমুক কোম্পানির শেয়ার Margin-এর উপর ক্রয় করে দাও। যার হার নির্ধারণ করে নেয়া হয়। যেমন শতকরা দশ শতাংশ। এ পরিমাণ অর্থ ক্রেতা প্রদান করে। বাকি নব্বই শতাংশ দালাল তার নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করে। দালাল এ অর্থ ক্রেতাকে ঋণ প্রদান করে। দালাল কখনো তার সুদ নেয় আবার কখনো নেয় না। কখনো এমন হয়, কিছুদিন পর্যন্ত বিনা সুদে সুযোগ দেয়। তারপর সুদ পরিশোধ করা জরুরি। যেমন বাকি মূল্য তিন দিনের মধ্যে পরিশোধ করলে সুদ দিতে হবে না, কিন্তু তারপর সুদ দিতে হবে। এর মধ্যে দালালের আসল লাভ কমিশন। নিজের ব্যবসায় চালু রাখা এবং কমিশন গ্রহণের জন্য সে ঋণ দিতেও প্রস্তুত থাকে।

www.pathagar.com

**৩. Short Sale :** শর্ট সেল মূলত 'অমালিকানা বস্তু বিক্রির' নাম। অর্থাৎ বিক্রেতা এমন শেয়ার বিক্রি করে দেয় যা এখনো তার মালিকানায় আসে নি, কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে, শেয়ার হাতে পেয়ে তা ক্রেতাকে প্রদান করবে।

## নগদ ও অগ্রিম ক্রয়

শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় নগদ ও অগ্রিম– এ দুভাবেই হয়। একটাকে নগদ বিক্রয় (Spot Sale) এবং অন্যটাকে অগ্রিম বিক্রয় (Forward Sale) বলে।

নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শেয়ারের বিক্রি তাৎক্ষণিক হয়ে যায় এবং অধিকারও সাথে সাথে স্থানান্তরিত হয়। ক্রেতা তখন থেকেই শেয়ার নেয়ার হকদার হয়ে যায়, কিন্তু কিছু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অপারগতার কারণে শেয়ার সার্টিফিকেট হস্তান্তরে (ডেলিভারি) দেরি হয়। শেয়ার সার্টিফিকেট হস্তান্তর সাধারণত এক থেকে তিন সপ্তাহ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়, কিন্তু এ বিলম্ব বেশি হয় রেজিস্ট্রার্ড শেয়ার হস্তান্তরের বেলায়। যার উপর গ্রাহকের নাম লিখিত থাকে। গ্রাহকের নাম পরিবর্তনের জন্য কোম্পানির দ্বারস্থ হতে হয়, এ কারণেই বিলম্ব বেশি হয়। বিয়ারার শেয়ারের বেলায় বেশি বিলম্ব হয় না। নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও যেহেতু শেয়ার হস্তগত করতে বিলম্ব হয়ে যায়, এ কারণে এখানেও ক্রেতা শেয়ার সার্টিফিকেট নিজের হাতে পাওয়ার পূর্বে অন্য জনের কাছে বিক্রি করে দেয়। কখনো হাতে আসতে আসতে তা কয়েকবার বিক্রি হয়ে যায়।

নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শেয়ার বিক্রি হওয়ার পর হস্তগত হওয়ার আগে যদি কোম্পানি মুনাফা বণ্টন করে, তাহলে কোম্পানি বিক্রেতার নামেই মুনাফা বণ্টন করে। কিন্তু রীতি এটাই, যেহেতু বিক্রি হওয়ার পর মুনাফা বণ্টন হয়েছে, তাই বিক্রেতা এ মুনাফা ক্রেতাকে দিয়ে দেয়।

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বিক্রি তখনি হয়ে যায়, কিন্তু প্রযুক্ত হয় ভবিষ্যতের সাথে। যেমন শেয়ার বিক্রি এখনি হয়ে গেছে কিন্তু দখল ইত্যাদির অধিকার পাবে অমুক তারিখে। অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শেয়ার পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ আসলে তখন কোনো সময় শেয়ার ক্রেতাকে হস্তান্তর করা হয়। কোনো সময় এমনও করা হয়, বিক্রেতা ও ক্রেতা শেয়ার গ্রহণের পরিবর্তে বিক্রির তারিখের মূল্য এবং পরিশোধের

www.pathagar.com

তারিখের মূল্যের পার্থক্য পরস্পর সমান করে নেয়। যেমন ৩০ মার্চ পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করে ১ জানুয়ারি অগ্রিম বিক্রয় এবং প্রতি শেয়ার দশ টাকা মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল, কিন্তু ৩০ মার্চ তারিখ যখন আসল তখন শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে বার টাকা হয়ে গেল। এখন বিক্রেতা ক্রেতাকে শেয়ার না দিয়ে শেয়ার প্রতি দুটাকা করে পরিশোধ করে দিল। অথবা মূল্য যদি আট টাকা হয় তাহলে ক্রেতা বিক্রেতাকে দশ টাকা দিয়ে তার থেকে শেয়ার আদায় করার পরিবর্তে তাকে শেয়ার প্রতি দুটাকা করে দিয়ে দিল এবং শেয়ার আদায় করল না। তারপর অগ্রিম বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রির তারিখের পর থেকে পরিশোধের তারিখ আসা পর্যন্ত কখনো কয়েক দফা ক্রয়-বিক্রয় হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম ক্রেতা দ্বিতীয় ব্যক্তিকে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তিকে এভাবে বিক্রি করতে থাকে। আবার কখনো শেষে শেয়ার লেনদেনের পরিবর্তে মূল্যের পার্থক্য সমান করে নেয়।

## পণ্যদ্রব্যের মধ্যে নগদ ও অগ্রিম বিক্রি

কোনো কোনো দেশে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে যেমন শেয়ার নগদ ও অগ্রিম বিক্রি হয়, তেমনি পণ্যদ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্যও নগদ ও অগ্রিম বিক্রয় হয়। এ বিক্রয় নির্বাচিত কিছু বড় বড় পণ্যের বেলায় হয়ে থাকে। যেমন গম, কার্পাস ইত্যাদি।

দ্রব্যের নগদ বিক্রি হচ্ছে, কোনো বস্তু এখনি বিক্রি হল এবং অধিকারও স্থানান্তরিত হল। আর ক্রেতা এখন থেকেই তা দখলের হকদার হিসেবে স্বীকৃতি পেল। কোনো ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অপারগতার কারণে দখলে বিলম্ব হওয়া ভিন্ন কথা, কিন্তু সে দখলের অধিকারী হয়ে গেছে।

অগ্রিম বিক্রি হচ্ছে, বিক্রি হয়ে গেল ঠিক, কিন্তু দখলের জন্য ভবিষ্যতের কোনো তারিখ নির্ধারিত হয়। আইনগতভাবে তাকে Forward Sale এবং Future Saleও বলে। কিন্তু আজকাল কার্যত এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হয়। অগ্রিম বিক্রির মধ্যে উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য যদি নির্দিষ্ট তারিখে নেয়া দেয়াই হয় অর্থাৎ ক্রেতার উদ্দেশ্য দ্রব্য উসুল করা এবং বিক্রেতার উদ্দেশ্য মূল্য গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে Forward Sale বলে। আর যদি উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট তারিখে নেয়া দেয়া না হয়; বরং দ্রব্যকে শুধু লেনদেনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে তাকে Future Sale

www.pathagar.com

বলে। আরবীতে তাকে 'مستقبليات' বলে। এর মধ্যে দ্রব্য গ্রহণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এ দুটো বিষয়ের যে কোনো একটা।

**১. ফটকাবাজি (Speculation) :** নির্ধারিত তারিখে পণ্যদ্রব্য লেনদেনের পরিবর্তে মূল্যের পার্থক্য সমান করে মুনাফা অর্জন করা হয়। যেমন ১ ডিসেম্বরে চুক্তি স্থির হল, ১ জানুয়ারি একশ গাঁট কার্পাস একলাখ টাকা মূল্যে প্রদান করতে হবে। কিন্তু না বিক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে কার্পাস প্রদান করার না ক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে কার্পাস নেয়ার; বরং নির্ধারিত তারিখ আসলে দুজনেই পরস্পর লাভ ক্ষতি সমান ভাগ করে নেয়। যদি ১ জানুয়ারি একশ গাঁটের মূল্য এক লাখ দশ হজার টাকা হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে চুক্তি শেষ করে ফেলবে। আর ১ জানুয়ারি যদি মূল্য নব্বই হাজার টাকা হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে দশ হাজার টাকা আদায় করে চুক্তি শেষ করবে।

২. Future Sale-এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। তাকে Hedging আরবীতে 'تأمين ضد الخسارة' বলা হয়। এর সারকথা হল, কেউ কোনো পণ্য আগাম ক্রয় (Forward Sale) করে এবং প্রকৃতপক্ষে পণ্য গ্রহণ করাই তার উদ্দেশ্য থাকে, ফটকাবাজি উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু ক্রেতা আশংকা বোধ করে, নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত এ পণ্যের মূল্য কমে গেলে তার ক্ষতি হবে। সে এ ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঐ পণ্য Future Market-এ সে তারিখের জন্য Future-এর উপর বিক্রি করে দেয়। যাতে পণ্যের মূল্য যদি কমে যায় তাহলে প্রথম লেনদেনে যত ক্ষতি হবে তত দ্বিতীয় লেনদেনে উসুল হয়ে যায়।

যেমন যায়েদ ১ ডিসেম্বর একশ গাঁট কার্পাস এক লাখ টাকা দিয়ে ক্রয় করল। ১ জানুয়ারি হস্তগত হওয়ার সিদ্ধান্ত হল। তার আশা, ১ জানুয়ারি একশ গাঁট কার্পাস নিয়ে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবে, কিন্তু আশংকা হল, ১ জানুয়ারি কার্পাসের মূল্য কমে গেলে তার ক্ষতি হয়ে যাবে। যায়েদ এ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য একশ গাঁট কার্পাস ১ জানুয়ারি পর্যন্ত Future মার্কেটে খালেদের কাছে এক লাখ টাকায় বিক্রি করে দিল। এখন ১ জানুয়ারি একশ গাঁট কার্পাসের মূল্য যদি নব্বই হাজার টাকা হয়ে যায়, তাহলে যায়েদের দশ হাজার টাকা ক্ষতি হবে, কিন্তু এ পরিমাণ গাঁট যেহেতু সে খালেদের কাছে Futures মার্কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। এ

www.pathagar.com

কারণে ১ জানুয়ারি সে নব্বই হাজার টাকায় অন্য গাঁট খরিদ করে খালেদের কাছে এক লাখ টাকায় বিক্রি করবে। এভাবে প্রথম লেনদেনে যায়েদের যে দশ হাজার ক্ষতি হয়েছিল তা সে খালেদের সাথে কৃত লেনদেনের মাধ্যমে আদায় করে নিল। এভাবে 'ফিউচার সেল' ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যও হয়ে থাকে, তাকে হেজিং (Hedging) বলে।

Futures ইত্যাদির কারবার কোনো কোনো দেশে স্টক এক্সচেঞ্জেই হয় আবার কোনো কোনো দেশে তার জন্য ভিন্ন বাজার থাকে।

## بيع الخيارات (Options)

কোনো বিশেষ পণ্য বিশেষ মূল্যে বিক্রয় বা ক্রয়ের অধিকার প্রদানকে 'خيارات' (Options) বলে। এক ব্যক্তি অন্য একজনের কাছে অঙ্গীকার করে, যদি তুমি চাও তাহলে আমি অমুক পণ্য এত দামে এত সময়ের মধ্যে ক্রয় করার চুক্তি করতে পারি। তুমি যখন ইচ্ছা বিক্রি করতে পার, তাকে বিক্রির অপ্‌শন বলে।

Option-দাতা এ অধিকার দেয়ার কারণে ফিস গ্রহণ করে। Option-দাতা নির্ধারিত মেয়াদের ভিতর ঐ পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য, কিন্তু Option গ্রাহক বিক্রি করতে বাধ্য নয়। তেমনি এর বিপরীতে কখনো এক ব্যক্তির সাথে অঙ্গীকার করে, আমি তোমার কাছে অমুক পণ্য অমুক তারিখ পর্যন্ত এত মূল্যে বিক্রি করার চুক্তি করছি। এ তারিখ পর্যন্ত তুমি যখন ইচ্ছা আমার থেকে এ দামে এ পণ্য কিনে নিতে পার, এটা ক্রয়ের অপ্‌শন। Option- কারেন্সির উপরও হয় আবার পণ্যের উপরও হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, Option-দাতা গ্রহীতাকে ঐ কারেন্সি বা পণ্যের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে নিশ্চিত করে এবং এ নিশ্চয়তা দেয়ার বিপরীতে সে কমিশন নেয়।

যেমন এক লোক পঁচিশ টাকা দিয়ে একটি ডলার ক্রয় করল। সে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, যদি এটা নিজের কাছে রাখি তাহলে তার মূল্য কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার যদি এখনি বিক্রি করে দেই তাহলে ভবিষ্যতে এর মূল্য বেড়ে গেলে লাভ থেকে বঞ্চিত হব। এখন অন্য এক ব্যক্তি তাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে বলল, ডলার তোমার কাছে রাখ। আমি তোমার সাথে অঙ্গীকার করছি, তিন মাস পর্যন্ত আমি এ ডলার পঁচিশ টাকায় ক্রয় করব, আর এ অঙ্গীকারের বিনিময়ে এত টাকা ফিস

www.pathagar.com

নেব। এ কারণে সে ব্যক্তি মূল্য হ্রাস পাওয়ার আশংকা থেকে নিশ্চিত থাকবে। আর যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেবে। মূল্য কমে গেলে Option বিক্রেতাকে পঁচিশ টাকায় বিক্রি করে দেবে।

Option-কে স্বতন্ত্র ব্যবসায়িক পণ্য মনে করা হয়। এর অগ্রিমও বিক্রি হয়ে যায়। এ কারবার অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে হচ্ছে। আর এর প্রক্রিয়াও দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

## পুঁজিবাজার السوق المالية (Financial Market)

স্টক এক্সচেঞ্জ একটি বড় বাজারের অংশ। যাকে আরবীতে 'السوق المالية', ইংরেজিতে Financial Market বা Capital Market এবং বাংলায় 'পুঁজি বাজার' বলে। এর মধ্যে শুধু কোম্পানির শেয়ারই নয়; বরং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরকার ইত্যাদি) জারিকৃত আর্থিক সনদাদির ক্রয়-বিক্রয়ও হয়। যদিও এ বাজারের কোনো পৃথক ভৌগোলিক অস্তিত্ব জরুরি নয়। কার্যত এ সব কাজ স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যেই হতে পারে, কিন্তু পরিভাষায় তার একটা অর্থগত ধারণা আছে। এ Financial Market-এ 'সরকারি ঋণপত্রের'ও (Government Securities) কেনাবেচা হয়। যে সনদ সরকার বিভিন্ন সময়ে জনসাধারণ থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য জারি করে তাকে 'সরকারি ঋণপত্র' বলে। সরকারের আয়ের উৎস (ট্যাক্স ইত্যাদি) বাজেটের জন্য যখন অপর্যাপ্ত হয়, তখন সরকার জনগণ থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য এ আর্থিক সনদ জারি করে। যেমন :

১. প্রাইজ বন্ড : এর মধ্যে প্রত্যেক বন্ডের উপর লাভ হয় না। সব বন্ড থেকে প্রাপ্য অর্থের উপর সমষ্টিগতভাবে মুনাফা হয়, যা বণ্টিত হয় লটারির মাধ্যমে।

২. ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট।

৩. বিশেষ ডিপোজিট সার্টিফিকেট।

৪. ফরেন এক্সচেঞ্জ বিয়ারার সার্টিফিকেট।[১] আগে জনসাধারণের জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ (বৈদেশিক মুদ্রা) রাখার অনুমতি ছিল না। পরিণামে কারো

---

[১]. এগুলো পাকিস্তান সরকারের প্রবর্তিত ঋণপত্র। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ঋণপত্রগুলো হচ্ছে,

www.pathagar.com

যখন ফরেন এক্সচেঞ্জের প্রয়োজন হত তখন তাতে বহু আইনি জটিলতা দেখা দিত। এ অবস্থার এক ক্ষতি ছিল, মানুষ অবৈধ মাধ্যমে ফরেন এক্সচেঞ্জ লাভ করত এবং নিজের কাছে রাখত। দ্বিতীয় ক্ষতি ছিল, লোকজন বাইরে থেকে ফরেন এক্সচেঞ্জ যেমন ডলার আনত, কিন্তু সে সরকারকে প্রদান করত না। অথচ সরকারের তা প্রয়োজন। সুতরাং তাকে আইনগত বৈধতা দিয়ে লোকদের থেকে ঋণ হিসেবে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেয়ার জন্য যে সনদ সরকার জারি করে, তাকে 'ফরেন এক্সচেঞ্জ বিয়ারার সার্টিফিকেট' (F.E.B.C) বলে। এর পদ্ধতি হল, সরকার ডলার নিয়ে তখনকার মূল্য অনুযায়ী দেশীয় টাকার সার্টিফিকেট জারি করে দেয়। যেমন এখন ডলারের মূল্য পঁচিশ[২] টাকা। বাইরে থেকে কেউ একশ ডলার নিয়ে আসল। সরকার তার থেকে একশ ডলার নিয়ে তাকে দুই হাজার পাঁচশ দেশীয় টাকার সার্টিফিকেট জারি করবে। যার অর্থ হবে সরকার সার্টিফিকেটধারীর কাছে দেশীয় আড়াই হাজার টাকা ঋণী।

এফ.ই.বি.সি.এর উপর বার্ষিক শতকরা বার ভাগ হারে বর্ধিত পাওয়া যায়। গ্রাহক যখন ইচ্ছা এ সার্টিফিকেট পেশ করে পুনরায় ডলার নিতে পারে। আবার সে এ সার্টিফিকেট বিক্রিও করতে পারে। এগুলো সব সরকারি দলিল। এর মধ্যে আসল লেনদেন তো সরকার ও ঋণদাতার (সার্টিফিকেটধারী) মধ্যে হয়। কিন্তু জনসাধারণের সুবিধার জন্য তাকে বিক্রিরও অবকাশ দেয়া হয়েছে। পুঁজি বাজারে (Financial Market) তার ক্রয়-বিক্রয় হয়। সনদধারী যখন এটা বিক্রি করে দেবে তখন আর সে ঋণদাতা থাকবে না। সরকারের সাথে তার লেনদেন চুকে যাবে। এখন ক্রেতা হবে ঋণদাতা এবং সরকারের লেনদেন ক্রেতার সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেখানে শেয়ার বা ঋণের সনদাদি ইস্যুকারী ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা হয়, সে বাজারকে 'সেকেন্ডারি মার্কেট' (Secondary Market) বলে। যে সনদের কোনো দ্বিতীয় বাজার থাকে, অর্থাৎ তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে বিক্রি করা যায়, তাকে বেশি আকর্ষণীয় মনে করা হয়। লোক টাকার বিনিময়ে এ সনদ নেয়ার জন্য এ কারণে বেশি আগ্রহ দেখায়, সে যখন ইচ্ছা তা সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করে নগদ টাকা লাভ করতে পারবে।

---

[২]. এ মূল্য ছিল পাকিস্তানী মুদ্রার মান অনুযায়ী। বর্তমানে বাংলাদেশী মুদ্রায় এক ডলারের মূল্য প্রায় সত্তর টাকার মত।

www.pathagar.com

# শরীয়তের দৃষ্টিতে কোম্পানি

এ পর্যন্ত কোম্পানি সংক্রান্ত প্রচলিত রীতির ব্যাখ্যা আলোচনা করা হল। কোম্পানির এ স্বরূপ জানার পর এখন তার শরয়ী ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা যুক্তিসংগত হবে। এ সংক্রান্ত আলোচনাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক অংশ মৌলিক ও নীতিগতভাবে কোম্পানি জায়েয নাজায়েয হওয়ার আলোচনা। আর দ্বিতীয় অংশ কোম্পানি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা।

প্রথম অংশের আলোচনায় এতটুকু কথা পূর্বেই পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোম্পানির যে বৈশিষ্ট্য সামনে এসেছে সে আলোকে কোম্পানি অংশীদারিত্বের প্রসিদ্ধ প্রকারসমূহের কোনোটির মধ্যে পড়ে না। ফুকাহায়ে কিরাম অংশীদারিত্বের চার প্রকার উল্লেখ করেছেন। মুদারাবাকেও তার সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে পাঁচ প্রকার হয়। কোম্পানি ব্যবস্থা এ পাঁচ প্রকারের কোনোটার মধ্যেই পুরোপুরিভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন পূর্বে অংশীদারিত্ব এবং কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সমকালীন আলেমদের তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এক. যেহেতু শরয়ীভাবে অংশীদারিত্ব এ পাঁচ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর কোম্পানি তার কোনোটার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এটা জায়েয নয়। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, কোম্পানি এ পাঁচ প্রকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়– শুধু একথার ভিত্তিতে তাকে নাজায়েয বলা যায় না। কারণ ফুকাহায়ে কিরাম যে প্রকারসমূহ বর্ণনা করেছেন তা নছ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং ফকীহগণ অংশীদারিত্বের প্রচলিত পদ্ধতিগুলো অনুসন্ধান করে তার আলোকে শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাছাড়া কোনো নছের মধ্যে বা ফকীহগণের বক্তব্যে কোথাও একথা স্পষ্ট নেই, যে পদ্ধতি এ প্রকারসমূহের বাইরে হবে সেটা জায়েয হবে না। সুতরাং অংশীদারিত্বের কোনো পদ্ধতি যদি এ প্রকারসমূহের মধ্যে না পড়ে এবং নছ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অংশীদারিত্বের মূলনীতির পরিপন্থীও না হয়, তাহলে সেটা জায়েয হবে।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রাহ. এর। তিনি বলেন, কোম্পানি তার প্রকৃত সত্তা হিসেবে অংশীদারিত্বে অন্তর্ভুক্ত। -(ইমদাদুল

www.pathagar.com

ফাতাওয়া, পৃ. ৪৬৪, খ. ৩)। যদিও কোম্পানির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রসিদ্ধ অংশীদারী বন্ধনের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কারণে বন্ধনের প্রকৃতি পরিবর্তন হয় না। এখন কোম্পানির শরয়ী ভিত্তির উপর আলোচনার জন্য তার বৈশিষ্ট্যের উপর ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, তা শরীয়তসম্মত কিনা। শরয়ীভাবে আপত্তিকর নয় এমন বৈশিষ্ট্যের বেশির ভাগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। তবে কোম্পানির মধ্যে দুটি বিষয় শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশেষভাবে বিবেচ্য এবং সংশয়ের কারণ। এসব ব্যাপারে অধম তার সমকাল পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনার সারসংক্ষেপ আলেমদের কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করছে।

১. প্রথম বিষয় হল, অংশীদারিত্বের পৃথক কোনো আইনগত অস্তিত্ব হয় না, কিন্তু কোম্পানির নিজস্ব স্বতন্ত্র আইনগত অস্তিত্ব হয়। একে বলা হয় আইনসম্মত ব্যক্তিসত্তা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আইনগত সত্তার ধারণা শরীয়তে বৈধ কিনা। অনুসন্ধান করে এমন মনে হয়, শরীয়তে আইনগত সত্তার পরিভাষা বর্তমান না থাকলেও তার নজির বিদ্যমান আছে।

## শরীয়তে 'আইনগত সত্তার' দৃষ্টান্ত

১. وقف (ওয়াকফ) : এর জন্য যদিও আইনগত সত্তার পরিভাষা ব্যবহার হয় নি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা আইনগত সত্তা। কারণ ওয়াক্ফ মালিক হয়। মসজিদ বা ওয়াক্ফকে চাঁদা দেয়া হলে বা অন্য কোনো বস্তু দান করা হলে সে চাঁদা বা অন্যান্য দান ওয়াক্ফ হয় না, যতক্ষণ তা ওয়াক্ফ হওয়ার কথা স্পষ্ট করা না হয়; বরং তা ওয়াক্ফের মালিকানাধীন হয় এবং ওয়াক্ফ মালিক হয়। ওয়াক্ফ ঋণদাতাও হয় । যেমন কোনো ব্যক্তি ওয়াক্ফের জমি ভাড়ায় গ্রহণ করল, এ ভাড়া ওয়াক্ফের ঋণ এবং ওয়াক্ফ ঋণদাতা। তেমনি ওয়াক্ফ ঋণীও হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি ওয়াক্ফের কর্মচারী, তার বেতন ওয়াক্ফের দায়িত্বে ঋণ। আদালতে মামলা হলে ওয়াক্ফ বাদী বা বিবাদীও হতে পারে আর মুতাওয়াল্লী তার প্রতিনিধিত্ব করে। মালিক হওয়া, ঋণদাতা হওয়া, ঋণী হওয়া, বাদী বিবাদী হওয়া ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং বুঝা গেল, ফুকাহায়ে কিরাম এ পরিভাষা ব্যবহার না করলেও ওয়াক্ফে আইনগত সত্তার বৈশিষ্ট্যাবলী স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

২. بيت المال (রাজকোষ) : বাইতুল মালের সম্পদে সকল জনসাধারণের অধিকার তো সংশ্লিষ্ট, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি সে সম্পদে মালিকানার দাবি করতে পারে না। সে সম্পত্তির মালিক বাইতুল মালই হয়। বুঝা গেল বাইতুলও একটি আইনগত সত্তা; বরং ফুকাহায়ে কিরামের ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়, বাইতুল মালের প্রতিটি বিভাগ একটি স্বতন্ত্র আইনগত সত্তা। বাইতুল মালের দুটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। বাইতু মালিস সাদাকাহ (সাদাকাহ ফাণ্ড) ও বাইতু মালিল খারাজ (ট্যাক্স ফাণ্ড)। ইমাম যাইলায়ী রাহ.[১] মাসআলা লেখেছেন, যদি এক বিভাগে অর্থ না থাকে তাহলে প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য বিভাগ থেকে ঋণ গ্রহণ করা যাবে। তখন যে বিভাগ থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে সে ঋণদাতা এবং যে বিভাগের জন্য ঋণ গ্রহণ করা হবে সে ঋণী হবে। ঋণদাতা ও ঋণগ্রস্ত মানুষই হয়। বুঝা গেল, এ ক্ষেত্রে বাইতুল মালকেও ব্যক্তি মনে করা হয়েছে।

৩. تركة مستغرقة بالدين (পুরোপুরি ঋণে জর্জরিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি) : কোনো মৃতের সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পদ ঋণের দায়ে দায়গ্রস্ত হলে মৃত ব্যক্তি ঋণদাতাদের ঋণী নয়। কারণ মৃত্যুর পর কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় না। আবার উত্তরাধিকারীরাও ঋণগ্রস্ত নয়। কারণ, তারা তো সম্পত্তিই পায় নি। সুতরাং এখানে ঋণগ্রস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি, যা আইনগত সত্তা।

৪. خلطة الشيوع (যৌথমালিকানা সম্পত্তি) : এ দৃষ্টান্ত হানাফী মাযহাব মুতাবেক নয়; বরং অন্য তিন ইমামের মাযহাব অনুযায়ী। তাঁদের মতানুসারে যাকাতের সম্পত্তি কয়েক ব্যক্তির মধ্যে যৌথভাবে যৌথমালিকানায় থাকলে যাকাত ব্যক্তিগত অংশের উপর নয়; বরং সমষ্টির উপর ফরয হয়। এতে বুঝা যায়, তিন ইমামের নিকট সমষ্টি এক আইনগত সত্তা। এখানে উল্লেখ্য, خلطة الشيوع এবং কোম্পানি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে خلطة الشيوع-এর মধ্যে ইমামত্রয় রাহ. এর মতে সমষ্টির উপর যাকাত হয়। প্রত্যেক অংশীদারের ব্যক্তিগত মালিকানায় যাকাত আসে না। আর কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় কোম্পানির উপর পৃথক ট্যাক্স এবং শেয়ারহোল্ডারের উপর পৃথক ট্যাক্স বসে।

---

১. تبيين الحقائق، كتاب السير: قبيل باب المرتدين٣: ٢٨٣

www.pathagar.com

এসব নজির থেকে বুঝা যায়, আইনগত সত্তার ধারণা মৌলিকভাবে কোনো নাজায়েয ধারণা নয়। ইসলামী ফিকাহের জন্য কোনো অপরিচিত ধারণাও নয়। তবে এ পরিভাষা অবশ্যই নতুন।

## সীমিত দায়ের শরয়ী ভিত্তি

কোম্পানির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যা শরয়ীভাবে বিবেচ্য, তা হল Limited Liability অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দায়। এর ব্যাখ্যা পেছনে করা হয়েছে। শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গিতে শেয়ার মালিকদের সীমাবদ্ধ দায়ের একটি নজির বর্তমান আছে। কারণ মূলধন সরবরাহকারী যতক্ষণ ব্যবসায়ীকে অন্যের থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেবে, মুদারাবার মধ্যেও মূলধন সরবরাহকারীর দায় তার মূলধনের মধ্যে সীমিত থাকে। সুতরাং মূলধন সরবরাহকারী যদি ব্যবসায়ীকে মূলধন যোগান দেয় এবং অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের অনুমতি না দেয় আর ব্যবসায়ী ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে এ অবস্থায় মূলধন সরবরাহকারীর সর্বাধিক তার মূলধনের সীমা পর্যন্ত ক্ষতি হবে। তার চেয়ে বেশি মূলধন সরবরাহকারীর কাছ থেকে দাবি করা হবে না; বরং তার চেয়ে অতিরিক্তটার দায় বর্তাবে ব্যবসায়ীর উপর। কারণ সে মূলধন সরবরাহকারীর অনুমতি ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করেছে। এ কারণে সে-ই তার জিম্মাদার হবে। তেমনি শেয়ারহোল্ডার যে নিজে ব্যবসা করছে না, তার দায় সীমাবদ্ধ হওয়ার শর্ত মুদারাবার মূলনীতির ভিত্তিতে সঠিক বলে মনে হয়। তবে এখানে সন্দেহ হতে পারে, প্রায় সকল কোম্পানির প্রসপেক্টাসে একথা উল্লেখ থাকে, কোম্পানি প্রয়োজনে ব্যাংক ইত্যাদি থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং যে ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হয় তার এটা জানা থাকে। সুতরাং যখন সে প্রসপেক্টাস দেখে কোম্পানির অংশীদার হয় তখন তার পক্ষ থেকে ব্যবসার জন্য ঋণ গ্রহণের একটা নীরব অনুমতি থাকে। মূলধন সরবরাহকারী ব্যবসায়ীকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিলে তখন আর তার দায় সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু এ সংশয়ের একটা উত্তর এই হতে পারে, প্রসপেক্টাসে একথাও উল্লেখ থাকে, শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমাবদ্ধ হবে। যার অর্থ দাঁড়ায়, অংশীদারদের পক্ষ থেকে কোম্পানিকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি এ শর্তে দেয়া হয়, আমাদের উপর এ ঋণের দায়ভার বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে বেশি হতে পারবে না। সুতরাং তার সঠিক দৃষ্টান্ত হল, মূলধন সরবরাহকারী তার ব্যবসায়ীকে এ শর্তসাপেক্ষে ঋণ

www.pathagar.com

গ্রহণের অনুমতি দেয়, তার দায়ভার সে নিজে বহন করবে।

এখানে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মূল আপত্তি হল, মুদারাবার মধ্যে মূলধন সরবরাহকারীর দায় তো সীমাবদ্ধ, কিন্তু ব্যবসায়ীর দায় সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং ঋণদাতাগণ মূলধন সরবরাহকারীর মূলধন থেকে অতিরিক্ত ঋণ ব্যবসায়ী থেকে আদায় করতে পারে। অতএব ঋণদাতাদের ঋণ নষ্ট হয় না, কিন্তু কোম্পানিতে ডাইরেক্টরদের দায়ও সীমাবদ্ধ। স্বয়ং যে কোম্পানি আইনগত সত্তা তার দায়ও সীমাবদ্ধ। পরিণামে কোম্পানির সম্পত্তির অতিরিক্ত ঋণদাতাদের যে ঋণ থাকবে তা পরিশোধের কোনো পথ থাকবে না, ফলে ঋণদাতাদের ঋণ নষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে 'خراب الذمة' ফুকাহায়ে কিরামের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, ঋণদাতাদের ঋণশোধের কোনো উপায় না থাকা।

এ আপত্তির কারণে সমকালীন কিছু আলেমের অভিমত হল, সীমাবদ্ধ দায়ের ধারণা শরয়ীভাবে সঠিক নয়। কারণ এর দ্বারা মানুষের অধিকার নষ্ট হয়। কমপক্ষে পরিচালকদের দায় অসীম হওয়া উচিৎ, কিন্তু এ বিষয়টা যদি অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে, কোম্পানির সীমাবদ্ধ দায়ের ধারণার ভিত্তি মূলত আইনগত সত্তার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনগত সত্তার বাস্তবতা স্বীকার করার পর সীমাবদ্ধ দায় মেনে নেয়ায় সমস্যা থাকে না। প্রকৃত ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে ঋণদাতাগণ কেবল তার সম্পত্তি থেকেই ঋণ আদায় করতে পারে। তার থেকে অতিরিক্ত দাবি করতে পারে না। হযরত মুআয বিন জাবাল রা.কে দেউলিয়া ঘোষণার পর হুযুর সা. ঋণদাতাদের বলেছিলেন, 'خذوا ماوجدتم ليس لكم الا ذلك'[১] (যা পাও তাই গ্রহণ কর, এছাড়া আর কিছুই পাবে না)। তবে যদি সে পুনরায় ধনী হয়ে যায় তাহলে পুনরায় তার কাছে দাবি করা যেতে পারে, কিন্তু যদি গরীব থাকা অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে 'خراب الذمة' হয়ে যায়। তার ঋণ পরিশোধের কোনো পথ থাকে না। বুঝা গেল, যদি প্রকৃত ব্যক্তি গরীব হয়ে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার দায় সম্পত্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে এবং ঋণদাতাদের ঋণ নষ্ট হয়ে যায়। যখন

---

১. صحيح مسلم ص: ٢١٩ ج١ ادارة القران كتاب باب وضع الجوائح .

www.pathagar.com

কোম্পানিকেও ব্যক্তি স্বীকার করে নেয়া হল তখন সেও যদি দেউলিয়া হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে তার দায়ও সম্পত্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। কারণ কোম্পানির বিলুপ্ত হওয়াই এ আইনগত সত্তার মৃত্যু।

বিশেষত কোম্পানির সাথে লেনদেনকারী যখন এটা দেখে লেনদেন করে, এ কোম্পানি লিমিটেড। আমার অধিকার শুধু কোম্পানির সম্পত্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ কারণে লিমিটেড কোম্পানির সাথে লিমিটেড লেখা জরুরি। তারপর কোম্পানির ব্যালান্স শিটও প্রকাশ হতে থাকে। ঋণদাতা ব্যালান্স শিটের মাধ্যমে কোম্পানির আর্থিক সামর্থ্য দেখে ঋণ প্রদান করে। মোটকথা, যে ব্যক্তি লিমিটেড কোম্পানির সাথে লেনদেন করে সে জেনে-বুঝেই করে। তাতে কোনো ধরনের ধোঁকা প্রতারণা থাকে না। এ কারণে সমকালীন অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হল, সীমাবদ্ধ দায়ের ধারণার কারণে অংশীদারিত্বকে ফাসেদ বলা যায় না।

## লিমিটেড কোম্পানির ফিকহী দৃষ্টান্ত

ফিকাহ শাস্ত্রে লিমিটেড কোম্পানির একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত আছে। যা লিমিটেড কোম্পানির খুবই কাছাকাছি। সেটা হল 'عبد ماذون فى التجارة' (ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস)। সে তার মনিবের মালিকানাধীন থাকে এবং মনিবের পক্ষ থেকে তাকে ব্যবসায়ের অনুমতি দেয়া হয়। সে যে ব্যবসা করে তাও মনিবের মালিকানাধীন হয়। সে যদি ঋণগ্রস্ত হয় তাহলে সেটা তার মূল্যের সীমা পর্যন্ত সীমিত হবে। তার চেয়ে অতিরিক্ত ক্রীতদাস থেকেও দাবি করা যায়, না মনিব থেকেও না। এখানেও ঋণদাতার ঋণ নষ্ট হয়ে যায়। এ দৃষ্টান্ত লিমিটেড কোম্পানির খুব কাছাকাছি। কারণ, যেমন কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারের জীবিত থাকা অবস্থায়ও ঋণ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি এখানেও মনিবের জীবিত থাকা অবস্থায় ঋণদাতার ঋণ নষ্ট হয়ে যায়।

## কোম্পানির কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়

### অবলেখন (Under Writing)-এর শরয়ী ভিত্তি

'ضمان الاكتتاب' (Under Writing) বা অবলেখনের ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনার সারকথা হচ্ছে, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি নতুন প্রতিষ্ঠিত কোনো কোম্পানিকে এ জামানত প্রদান করে, মানুষ তার

www.pathagar.com

জারিকৃত শেয়ার গ্রহণ না করলে জামানত প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান তা গ্রহণ করবে। আর সে এ জামানতের উপর বিনিময় আদায় করে। এর মধ্যে দুটি বিষয় বিবেচ্য। এক. Under Writer যে জামানত গ্রহণ করে তার ভিত্তি কী? এ জামানত ফিকহী দৃষ্টিতে জামানত বা কাফালত নয়। কারণ জামানত বা কাফালত হয় এমন ঋণের ক্ষেত্রে যা ওয়াজিব (অত্যাবশ্যক)। অথচ শেয়ার গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক কিছু নয়। এ কারণে শেয়ার গ্রহণের জামিন হওয়া জামানত বা কাফালত নয়; বরং একটি অঙ্গীকার, যা মালেকী মাযহাব অনুসারীদের পরিভাষায় তাকে ইলতেযাম (অপরিহার্যকরণ) বলা যেতে পারে (ইলতেযাম হল নিজের উপর কোনো বিষয় অপরিহার্য করে নেয়া। মালেকীদের কাছে এটা একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়)। আর হানাফীদের মতে অঙ্গীকার দিয়ানাতান অত্যাবশ্যক হয়, কাযাআন অত্যাবশ্যক হয় না। তবে মালেকীদের মতে কোনো কোনো অবস্থায় অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। সুতরাং বেশির বেশি এটা বলা যায়, মালেকীদের মত গ্রহণ করে এ অঙ্গীকার অত্যাবশ্যক হবে।

দ্বিতীয় বিষয় হল, অবলেখনের (Under Writing) উপর যে কমিশন গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে। এ কমিশন গ্রহণ জায়েয হওয়ার কোনো পন্থা নেই। কারণ, এ কমিশন নেয়া হচ্ছে কোনো বিনিময় ব্যতীত, যাকে ফিকাহর পরিভাষায় ঘুষ বলা হয়। যখন সে শেয়ার গ্রহণ করবে তখন সে কোম্পানির অংশীদার হয়ে যাবে। আর অংশীদার হওয়ার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করার কোনো বৈধতা নেই। তা সত্ত্বেও কিছু বিষয় এমন আছে যার উপর অবলেখক (Under Writer) পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারে। যেমন 'ضمان الاكتتاب' এর পূর্বে জামিনদারকে কোম্পানির ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়। যেমন কোম্পানি কী কারবার করবে, কোন লোক দ্বারা কোম্পানি পরিচালিত হবে, লাভ-লোকসানের কী সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি, একে বলা হয় 'অনুসন্ধান' (Studies)। জামিনদার এ অনুসন্ধানের প্রকৃত খরচ নিতে পারে। তেমনি এ জামানতের ধরনকে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। সেটা এরূপ, ব্যাংক তার শেয়ার কিনে নেয়ার জামানত দেয়ার পরিবর্তে চুক্তি করবে, যে শেয়ার বিক্রি হবে না আমি তার ক্রেতা জোগাড় করে দেব। এটা এমন কাজ যা দালালির পর্যায়ে পড়ে। তার উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। এ পরিবর্তনের

www.pathagar.com

মধ্যে বিশেষ কোনো কর্মজটিলতাও নেই। কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায়ও ব্যাংক কার্যত এটাই করে। শেয়ার নিজের কাছে রাখে না; বরং অন্য মানুষের কাছে বিক্রি করে দেয়।

উল্লেখ্য, সমকালীন কিছু আলেম অবলেখনের 'ضمان الاكتتاب' (Under Writing) উপর পারিশ্রমিক গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করেছেন, অবলেখককে 'ضامن الاكتتاب' (Under Writer) পারিশ্রমিক দেয়ার পরিবর্তে তার কাছে কম মূল্যে শেয়ার বিক্রি করবে। যেমন দশ টাকার শেয়ার সাড়ে নয় টাকায় প্রদান করবে, কিন্তু এ পন্থাও প্রকৃতপক্ষে শরয়ীভাবে জায়েয হবে না। কেননা, শেয়ার নেয়ার অর্থ কোম্পানির সাথে অংশীদারিত্ব কায়েম করা। যদি দশ টাকার শেয়ার সাড়ে নয় টাকায় প্রদান করা হয় তাহলে তার পরিণতি হবে, জামিনদার সাড়ে নয় টাকায় দশ টাকার সম্পদের মালিক হবে, যা অংশীদারিত্বের সূচনাতেই জায়েয নয়।

# শেয়ারের শরয়ী ভিত্তি ও তার ক্রয়-বিক্রয়

সমকালীন কিছু আলেমের (যাদের সংখ্যা অনেক কম) অভিমত হল, শেয়ার কোম্পানির সম্পত্তিতে শেয়ার মালিকের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং এটা শুধু এ কথার প্রামাণ্য দলিল, এ ব্যক্তি কোম্পানিকে এত টাকা প্রদান করেছে। যেমন বন্ড ইত্যাদি অন্যান্য ঋণের দলিলাদি হয়ে থাকে। তেমনি এটাও একটা সনদ বা দলিল। পার্থক্য শুধু এতটুকু, বন্ড ইত্যাদির উপর নির্ধারিত হারে সুদ আরোপিত হয়, কিন্তু শেয়ারের উপর সুদের হার নির্ধারিত থাকে না; বরং কোম্পানির যে মুনাফা হয় তারই একটি আনুপাতিক অংশ তাকে প্রদান করা হয়। যদি শেয়ার কোম্পানির সম্পত্তিতে মালিকানার প্রতিনিধিত্বকারী হত তাহলে শেয়ার মালিক দেউলিয়া হয়ে পড়লে যেখানে তার অন্যান্য সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, সেখানে কোম্পানির মধ্যে তার আনুপাতিক অংশও বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিৎ, কিন্তু তা হয় না। সুতরাং বুঝা গেল, কোম্পানির সম্পত্তির মধ্যে শেয়ারহোল্ডারের মালিকানা হয় না।

www.pathagar.com

এ বিবেচনার ভিত্তিতে শেয়ার নেয়াও জায়েয নয় এবং কমে বা বেশিতে তা ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয নয়। আর যেহেতু শেয়ার হোল্ডারের সম্পত্তির মধ্যে মালিকানা নেই, এ কারণে তাদের নিকট শেয়ারের উপর যাকাতও ওয়াজিব হবে না।

এ দৃষ্টিভঙ্গির উপর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা হয়েছে, কিন্তু এ যুক্তি সঠিক মনে হয় না। কোম্পানির বাহ্যিক ধারণার ভিত্তিতে এবং এ বিষয়ের উপর যে বই পুস্তক রচিত হয়েছে তার আলোকে বাস্তবিকই বুঝা যায়, কোম্পানির সম্পত্তিতে শেয়ারহোল্ডারের আনুপাতিক মালিকানা থাকে। এর কারণেই যদি পরস্পর চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানি বিলুপ্ত হয় তাহলে শেয়ারহোল্ডারদের শুধু তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত দেয়া হয় না; বরং কোম্পানির সম্পত্তির আনুপাতিক অংশ প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারকে প্রদান করা হয়। অথচ অন্যান্য আর্থিক দলিলাদি যেমন বন্ড ইত্যাদির উপর কোম্পানি বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থায় শুধু সুদসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত দেয়া হয়। এ দ্বারা বুঝা যায়, শেয়ার শুধু ঋণের সনদ নয়; বরং এ শেয়ার কোম্পানির সম্পত্তিতে শেয়ারহোল্ডারের আনুপাতিক মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।

শেয়ারের এ স্বরূপ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর বুঝা যায়, শেয়ার নিজে কোনো বস্তু নয়; বরং তার বিপরীতে যে অর্থ ও সম্পত্তি আছে সেটাই আসল বস্তু। সুতরাং শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় মূলত কোম্পানির সম্পত্তি থেকে আনুপাতিক মালিকানার ক্রয়-বিক্রয়। কোম্পানির সম্পত্তি বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। নগদ আদায়যোগ্য, ঋণ, স্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসায়িক সরঞ্জাম ইত্যাদি। এর প্রতিটি প্রকারের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারের আনুপাতিক অংশ থাকে। সুতরাং শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ হচ্ছে নগদ, ঋণ, স্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যবসায়িক সরঞ্জাম প্রত্যেকটির মধ্য থেকে নিজের আনুপাতিক অংশের মালিকানাস্বত্ব বিক্রি করা। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের এ প্রকৃতি অনুযায়ী তা ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত ও বিবরণ নিম্নরূপ :

## শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলী

১. শেয়ার কম-বেশি দামে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার একটি শর্ত হল, কোম্পানির সম্পত্তি শুধু নগদ ও ঋণ আকারে না হওয়া। যদি কোম্পনি কোনো স্থাবর সম্পত্তি (যেমন বিল্ডিং যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বা ব্যবসায়িক

www.pathagar.com

সরঞ্জাম না কিনে; বরং তার কাছে কেবল নগদ অর্থ বা কারো কাছে ঋণ থাকে, তাহলে এ অবস্থায় শেয়ারের নামিক মূল্য (Face Value) থেকে কম-বেশি দামে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কারণ শেয়ার এখন শুধু নগদ অর্থের প্রতিনিধিত্ব করছে। যেমন দশ টাকার শেয়ার শুধু দশ টাকার প্রতিনিধিত্ব করছে। যদি তা এগার টাকায় বিক্রি করা হয় তাহলে দশ টাকা বিক্রি হল এগার টাকার বিনিময়ে, এটা জায়েয নেই।

যখন নগদ অর্থ ছাড়া কোম্পানির অন্যান্য সম্পত্তিও অর্জিত হয় তখন তার সম্পত্তি মিশ্রিত হয়ে যায়। তার মধ্যে নগদ-অনগদ উভয়টা অন্তর্ভুক্ত হয়। এখন শেয়ার বিক্রির অর্থ, কোম্পানির সম্পত্তিতে প্রত্যেকের আনুপাতিক অংশ বিক্রি হচ্ছে। এ মাসআলার ভিত্তি এখন 'مدعجوة'-এর মাসআলার উপর হবে। 'مدعجوة' ইমাম আবু হানিফা রাহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর মাঝে একটি ইখতেলাফী মাসআলার শিরোনাম। যাকে 'سيف محلى' এবং 'منطقة مفضضة' হিসেবেও ব্যক্ত করা হয়। এ মাসআলার সারকথা হল, সুদযুক্ত মাল ও সুদমুক্ত মালে মিশ্রিত কোনো সম্পদ খাঁটি সুদযুক্ত সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করা। যেমন তরবারির উপর স্বর্ণ লাগানো। তরবারি সুদমুক্ত মাল ও স্বর্ণ সুদযুক্ত মাল। তা যদি দিনারের বিনিময়ে বিক্রি হয় তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয়ের কী হুকুম? এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর মতে এরকম মিশ্রিত মাল খাঁটি সুদের মালের বিনিময়ে বিক্রি জায়েয নেই, যতক্ষণ মিশ্রিত মাল থেকে সুদের মাল পৃথক করা না হবে। ইমাম আবু হানিফা রাহ. এর মতে বেচাকেনা জায়েয হবে। শর্ত হল, খাঁটি সুদযুক্ত মাল মিশ্রণে অবস্থিত সুদের মাল থেকে বেশি হতে হবে। সুদের মালের মুকাবেলায় সুদের মাল হবে এবং অতিরিক্ত খাঁটি সুদের মাল সুদমুক্ত মালের মুকাবেলায় হবে। তবে কিছু শাফেয়ী ও হাম্বলীর অভিমত হল, যদি মিশ্রণের মধ্যে সুদের মাল বেশি হয় তাহলে খাঁটি সুদের মাল দ্বারা বিক্রি নাজায়েয হবে। আর যদি মিশ্রণের মধ্যে সুদমুক্ত মাল বেশি হয় এবং সুদের মাল কম হয়, তাহলে খাঁটি সুদের মালের বিনিময়ে বিক্রি জায়েয হবে।

ঠিক একই অবস্থা এখানেও। নগদ ও অনগদের বিক্রি শুধু নগদ দ্বারা হচ্ছে। সুতরাং ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর মতানুসারে এরূপ অবস্থায় শেয়ার

www.pathagar.com

বিক্রি জায়েয নেই। আর কিছু শাফেয়ী ও হাম্বলীর মতানুসারে যদি কোম্পানির সম্পত্তি অধিক হয় আর নগদ অর্থ কম হয়, তাহলে শেয়ার বিক্রি জায়েয হবে। যদি নগদ অর্থ বেশি এবং আন্যান্য সম্পত্তি কম হয়, তাহলে শেয়ার বেচাকেনা নাজায়েয হবে। আজকাল আরব দেশের উলামায়ে কিরামের অধিকাংশ এ ফতোয়াই দিচ্ছেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে শেয়ার ক্রয়ের আগে কোম্পানির সম্পত্তির এবং তার নগদ অর্থ বেশি না অনগদ বেশি, তার খোঁজ-খবর নেয়া জরুরি, কিন্তু হানাফীদের মতে এ তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। যখন এতটুকু জানা যাবে, কোম্পানির কিছু সম্পত্তি অনগদও আছে, তখন নামিক মূল্য (Face Value) থেকে বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। তবে প্রত্যেক শেয়ারের ভাগে কোম্পানির নগদ অর্থ ও ঋণের যে পরিমাণ আসে, যদি শেয়ারের মোট মূল্য তার সমান বা তার থেকে কম হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। যেমন দশ টাকার শেয়ারে যদি আট টাকা হয় নগদ ও ঋণের মুকাবেলায়, আর দুই টাকা হয় স্থাবর সম্পত্তির মুকাবেলায়, তাহলে আট টাকা বা তার চেয়ে কম দামে শেয়ার বিক্রি জায়েয হবে না। তবে নয় টাকা বা তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি জায়েয় হবে।

২. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হওয়ার জন্য এটাও শর্ত, কোম্পানিকে হালাল কাজ করতে হবে। যদি কোম্পানির আসল ব্যবসাই হয় হারাম, তাহলে তার শেয়ার নেয়া জায়েয হবে না। যেমন কোনো কোম্পানি মদের কারবার করে বা কোম্পানির আসল কারবারই সুদের উপর, যেমন ব্যাংক ইত্যাদি।

৩. কখনো এমন হয়, কোম্পানি মৌলিকভাবে হালাল ব্যবসাই করে, কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তা সুদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। যেমন ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে। অথবা অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে রেখে তার উপর সুদ গ্রহণ করে। এটা কোম্পানির আসল কারবার নয়; বরং একটি আনুষঙ্গিক ও অন্তর্বর্তী কাজ। বর্তমানে অধিকাংশ কোম্পানি এ ধরনের। এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার গ্রহণের কী হুকুম? এ বিষয়ে সমকালীন উলামায়ে কিরামের মতভেদ আছে। কিছু আলেমের দৃষ্টিভঙ্গি হল, কোম্পানি সুদী কারবার মৌলিকভাবে করুক বা প্রাসঙ্গিকভাবে করুক, সুদী কারবার কম হোক বা বেশি হোক, সর্বাবস্থায়; যেহেতু সুদী কারবার

www.pathagar.com

করে এবং কোনো ব্যক্তি যদি কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করে, তাহলে সে কোম্পানিকে সুদী কারবারের উকিল বানায়। সুতরাং কোম্পানির সুদী লেনদেন তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। তাই যে কোম্পানি কোনো না কোনোভাবে সুদী লেনদেনে যুক্ত থাকে, তার প্রকৃত ব্যবসা সঠিক হলেও তার শেয়ার গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

কিন্তু এটাই সঠিক বলে মনে হয়, কোম্পানির সুদী লেনদেনের দুটি প্রক্রিয়া আছে। এক. কোম্পানি ঋণ গ্রহণ করে তার উপর সুদ প্রদান করে। এ অবস্থায় কোম্পানির আয়ের মধ্যে কোনো হারাম উপাদান মিশ্রিত হয় না। কারণ, যখন কোনো ব্যক্তি সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করে তখন এ কাজটি হারাম ও কঠিন পাপাচার হবে ঠিক, কিন্তু সে ঋণের মালিক হয়ে যাবে। তা দ্বারা ব্যবসা করে যে আয় হবে সেটাও হালাল হবে। এ অবস্থায় বেশির বেশি এ অভিযোগ করা যায়, কোম্পানি যেহেতু শেয়ারহোল্ডারের উকিল, এ কারণে সুদী ঋণ গ্রহণের সংশ্লিষ্টতা তার সাথে যুক্ত হবে এবং তাকে সুদী ঋণ গ্রহণে সম্মত মনে করা হবে। তার উত্তর হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রাহ. দিয়েছেন । তিনি বলেছেন, শেয়ারহোল্ডার কোনোভাবে এ আওয়াজ উঠাবে, আমি সুদী কারবারে সম্মত নই, তাহলে সে তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কোম্পানির দায়িত্বশীলদের কাছে এ বিষয়ে চিঠি লেখে দেওয়াও যথেষ্ট হতে পারে[১] (আজকাল তার উত্তম পদ্ধতি হল বার্ষিক সাধারণ সভায় (A.G.M) আওয়াজ উঠানো যেতে পারে)। আর একটা বিষয়ের উপরও আপত্তি হতে পারে যা হযরত থানবী রাহ. উল্লেখ করেন নি। সেটা হল, কোম্পানির পরিচালকগণ অংশীদারিত্বের কারণে তার উকিল তো ঠিক আছে। আর এটাও জানা কথা, যে আওয়াজ তোলা হচ্ছে তা কার্যকর হবে না। তাহলে ওকালতি ক্ষমতা থাকা অবস্থায় এরূপ অকার্যকর আওয়াজ তোলা দ্বারা সে দায়মুক্ত হয় কি করে? তার উত্তর হল, কোম্পানির ওকালতি ক্ষমতা অংশীদারিত্বের (Partnership) ওকালতি ক্ষমতা থেকে ভিন্ন। অংশীদারিত্বের মধ্যে প্রত্যেক অংশীদারের ওকালতি ক্ষমতা এ পরিমাণ শক্তিশালী হয় যে, এক অংশীদারও যদি কোনো কারবারে দ্বিমত করে বসে তাহলে সে কারবার আর করা যায় না।

---

১. امداد الفتاوى ج ٣ ص٤١٩

www.pathagar.com

অংশীদারিত্বের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় সর্বসম্মত রায়ের মাধ্যমে। অথচ কোম্পানির মধ্যে উকিল এবং মক্কেলের সম্পর্ক এতটা শক্তিশালী নয় যে, একজন শেয়ারহোল্ডার যদি ভিন্ন মত পোষণ করে বসে তাহলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না। কোম্পানির মধ্যে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত রায় দ্বারা গৃহীত হয় না এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্তমূলে কাজ করাও সম্ভব হয় না। এখানে সিদ্ধান্ত হয় অধিকাংশের মতানুসারে। এখন যেখানে অধিকাংশের মতানুসারে সিদ্ধান্ত হয়, সেখানে কোনো ব্যক্তি সুদী লেনদেনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাল, কিন্তু সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে তা কার্যকর হল না এবং সুদী লেনদেন স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত থাকল। তাহলে এখানে এটা বলা যায় না, এ সুদী লেনদেন তার বিরুদ্ধে আওয়াজ উচ্চারণকারীর ওকালতি ক্ষমতা ও সন্তুষ্টিতে হচ্ছে। সুতরাং এটাই সঠিক মনে হয়, যখন কোম্পানির আসল কারবার জায়েয হয় আর আনুষঙ্গিকভাবে কখনো সে সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করে তাহলে তার শেয়ার নেয়া জায়েয হবে। শর্ত হল, সুদ থেকে দায়মুক্তির আওয়াজ উচ্চারণ করতে হবে।

কোম্পানির সুদী লেনদেনের দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, কোম্পানির কাউকে ঋণ দিয়ে সুদ গ্রহণ করা। যেমন বর্তমানে অধিকাংশ কোম্পানিগুলো অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকের সেভিং একাউন্টে জমা রেখে তার উপর সুদ গ্রহণ করে। এখানে দুটি আপত্তি আছে। এক. সুদী লেনদেনের মধ্যে শেয়ারহোল্ডারও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। উপরের আলোচনাটি এর সমাধান। দ্বিতীয় আপত্তি হল, কোম্পানি যে মুনাফা (Dividend) বণ্টন করবে তার মধ্যে সুদও অন্তর্ভুক্ত হবে। আয়ের যে অংশ সুদের মাধ্যমে অর্জিত হবে তা হারাম। এ ব্যাপারে হযরত থানবী রাহ. দুটি কথা বলেছেন। এক. প্রত্যেক কোম্পানি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, সে সুদ গ্রহণ করছে। অনুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমরা আদিষ্ট নই। দ্বিতীয় কথা হল, সুদ গ্রহণ করে থাকলেও তা পরিমাণে অল্প, যা হালাল মালের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে গেছে। সুদ মিশ্রিত মালের বেশির ভাগ হালাল হলে তা ব্যবহারের অবকাশ আছে। কিন্তু এর উপর একটি আপত্তি উঠে। কোনো ব্যক্তি সুদ মিশ্রিত মাল থেকে হাদিয়া প্রদান করল এবং সে মিশ্রিত মালে হারাম অংশ খুব সামান্য, তখন হাদিয়া গ্রহণ করা এজন্য জায়েয আছে, মনে করা হবে সে হালাল মাল থেকে প্রদান করছে। কিন্তু কোম্পানির লাভের

www.pathagar.com

(Dividend) অবস্থাটা তার থেকে ভিন্ন ধরনের। কারণ কোম্পানির যতগুলো খাত থেকে আয় হয়, প্রত্যেক খাতের আয়ের একটি আনুপাতিক অংশ সে লাভের (Dividend) সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং সুদের একটা আনুপাতিক অংশও লাভের (Dividend) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যদি কোম্পানির আয়ের শতকরা দশ ভাগ অংশ সুদী একাউন্ট থেকে অর্জিত হয়, তাহলে লাভেরও (Dividend) শতকরা দশ ভাগ অংশ সুদযুক্ত হবে। সুতরাং মুনাফার (Dividend) যে অংশ সুদযুক্ত তা সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সাদাকাহ করা জরুরি। আয়ের কতটুকু অংশ সুদী তা কোম্পানির (Income Statements) থেকে জানা যেতে পারে। যদি তাতে এ বিবরণ না থাকে তাহলে কোম্পানির পরিচালকদের থেকেও জানা যেতে পারে।

সারকথা, কোনো কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চারটি শর্ত আছে :

১. কোম্পানির মূল ব্যবসায় হালাল হওয়া।

২. নামিক মূল্য (Face Value) থেকে কম বা বেশি দামে বিক্রির জন্য কোম্পানির সম্পত্তি শুধু নগদ অর্থ আকারে না থাকা জরুরি।

৩. সুদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে।

৪. কোম্পানির আয়ে সুদ মিশ্রিত থাকলে লভ্যাংশের সে পরিমাণ সাদাকাহ করতে হবে।

## শেয়ার ব্যবসার (Capital Gain) হুকুম

এতক্ষণ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে যে আলোচনা করা হল তা ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যখন শেয়ার ক্রেতা কোম্পানির অংশীদার হয়ে পুঁজি বিনিয়োগ করাই উদ্দেশ্য হয়। ক্রেতার উদ্দেশ্য যদি পুঁজি বিনিয়োগ না হয়; বরং এ উদ্দেশে ক্রয় করে, তার মূল্য বৃদ্ধি পেলে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবে। এ পদ্ধতিতে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম কী? এর মধ্যেও দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ফিকাহ, বিশেষত ফিকহুল মুআমালাতের ব্যাপারে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুসলিম বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ মুহাম্মদ ছিদ্দিক আদ দারিরের মত হল, এ প্রক্রিয়ার ভিত্তিমূল কেবল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাকে (Speculation) বলে, এ কারণে এটা জায়েয হবে না। তাঁর বক্তব্য হল, অনুমানভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান ফটকাবাজির পথ খুলে দেয়। তাঁর মতে শেয়ার শুধু সে অবস্থায় ক্রয় করা জায়েয হবে যখন

www.pathagar.com

ক্রেতা কোম্পানির লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণ করে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ক্রয় করে।

মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ক্রেতা কী উদ্দেশে বা কোন্ নিয়তে ক্রয় করছে সেটা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, মৌলিকভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তু কিনা। যখন এটা স্বীকার করা হল, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। শেয়ার বিক্রয় মূলত কোম্পানির সম্পত্তির আনুপাতিক অংশের বিক্রয়। তখন যে নিয়তেই ক্রয় করুক ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে। শেয়ার নিজের কাছে রেখে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য হোক বা মূল্য বৃদ্ধির পর বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের জন্য হোক। কোনো বস্তু ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য স্বীকার করে নেয়ার পর শুধু নিয়তের কারণে জায়েয নাজায়েযের পার্থক্যের কোনো ফিকহী কারণ নেই। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী শর্তগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এ শর্তগুলো মেনে চললে ফটকাবাজির পথ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

একটা কথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, আন্দাজ অনুমানভিত্তিক লেনদেন, যাকে (Speculation) বলে, সেটা মৌলিকভাবে হারাম। এ ধারণা ভুল। অনুমান (Speculation) হল, কোন্ বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোন্ বস্তুর মূল্য কমছে, এ জরিপ চালানো। যার মূল্য কমে যাওয়ার আশংকা হয় তা বিক্রি করে দেয়া এবং যার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা রেখে দেয়া। এটা মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ নয়। এটা তো প্রত্যেক ব্যবসায়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। নিষিদ্ধ হল, ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী শর্তসমূহ রক্ষা না করা। যেমন অমালিকানা বস্তু বা অদখলকৃত বস্তু বিক্রি করা অথবা বিক্রয়-জুয়ার আকৃতি ধারণ করা। জুয়া হয় দুটি বিষয় মিলে। এক. এক পক্ষ থেকে প্রদেয় নির্ধারিত হওয়া এবং অপর পক্ষ থেকে আনুমানিক হওয়া। দ্বিতীয় হল, যার পক্ষ থেকে প্রদেয় আদায় হয়ে গেছে তার অর্থ দুটি বিষয়ের মধ্যে আবর্তিত হবে। হয় এ অর্থ নিজেই চলে যাবে, নয় তো আরো অর্থ টেনে আনবে।

এ ব্যাখ্যার আলোকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর চিন্তা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সামনে আসে :

১. পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, কোনো কোম্পানির অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই স্টক এক্সচেঞ্জে তা লিস্টিং হয়ে যায়। এরূপ

www.pathagar.com

(Provisionally Listed) কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই। কারণ শেয়ার বিক্রি মূলত কোম্পানির সম্পত্তি বিক্রি। আর এক্ষেত্রে এখনো কোম্পানির মালিকানায় কোনো সম্পত্তিই অর্জিত হয় নি। সুতরাং এটা অমালিকানা বস্তুর বিক্রি, যা জায়েয নেই। কার্যত এরূপ শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় স্টক এক্সচেঞ্জে হয়। এরূপ দৃষ্টান্তও বর্তমান আছে, একটি কোম্পানির অস্তিত্ব লাভের পূর্বে তার দশ টাকার শেয়ার একশ আশি টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে।

২. Future Sales অর্থাৎ শেয়ারের এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে যেখানে শেয়ার নেয়া বা দেয়া উদ্দেশ্য নয়, কেবল লাভ-লোকসান সমান করে মুনাফা অর্জন উদ্দেশ্য, এটাও শরয়ীভাবে জায়েয নেই।

৩. অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়– যাতে বিক্রয় ভবিষ্যতের সাথে সংযুক্ত করা হয়, এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কারণ, বিক্রিকে ভবিষ্যৎকালের সাথে সংযুক্ত বা সম্পৃক্ত করা সকল ফুকাহায়ে কিরামের মতেই নাজায়েয। তবে ভবিষ্যতে বিক্রির প্রতিশ্রুতি দেয়া যেতে পারে, কিন্তু সময় আসলে স্বাভাবিক বিক্রি সম্পাদন করতে হবে।

৪. শেয়ার নগদ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয, পুঁজি বিনিয়োগের নিয়তে হোক বা বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের নিয়তে হোক।

৫. নগদ কেনাবেচায়ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কিছু অপারগতার কারণে শেয়ার হাতে আসতে এক থেকে তিন সপ্তাহ বিলম্ব হয়। নগদ বিক্রি হয়ে যাবার পর শেয়ার হস্তগত করার আগে তা অগ্রিম বিক্রি করা জায়েয আছে কি না? এ মাসআলার ভিত্তি এর উপর যে, এ বিক্রি দখলের আগে কিনা? যদি বিক্রি দখল করার আগে হয় তাহলে জায়েয নেই, অন্যথায় জায়েয আছে। এটা দখলের পূর্বে না পরে বিক্রি তা নির্ধারণ করার জন্য আগে জানতে হবে, শেয়ারের দখল বলা হবে কোন্ জিনিসকে। যেমন উপরে আলোচনা করা হয়েছে, 'শেয়ার' মূলত কোম্পানির মালিকানাধীন সম্পত্তির মধ্যে আনুপাতিক অংশীদারিত্বের নাম, আর 'শেয়ার সার্টিফিকেট' মূলত এ অংশীদারিত্বের লিখিত দলিল। সুতরাং বিক্রয়যোগ্য বস্তু লিখিত দলিল নয়; বরং কোম্পানির মালিকানাধীন সম্পত্তির একটি যৌথ অংশ। এ যৌথ অংশ বিক্রি পূর্ণ হওয়া মাত্রই ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। যেহেতু এটা যৌথ অংশ, তাই তার উপর বাহ্যিক দখল সম্ভব নয়। সুতরাং তার

www.pathagar.com

মধ্যে কৃত্রিম দখলই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিৎ। এখন দুটি অবস্থা হল। হয় এটা বলতে হবে, কৃত্রিম দখল তখনি হবে যখন সার্টিফিকেট হাতে আসবে। অথবা বলা হবে, যখন সে যৌথ অংশ ক্রেতার জামানতে আসবে তখন কৃত্রিম দখল মনে করা হবে। এ বিষয়টি স্থির করার জন্য দখলপূর্ব বিক্রির স্বরূপ জানা জরুরি। দখলপূর্ব বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞার দুটো কারণ– ১. দখলের আগে বিক্রীত বস্তু হস্তান্তরযোগ্য হয় না। সুতরাং এটা নিশ্চিত নয় যে, বিক্রেতা অবশ্যই ক্রেতাকে বিক্রীত বস্তুর দখল বুঝিয়ে দেবে। এটা ধোঁকা মাত্র, একারণে বিক্রি জায়েয নেই। বিক্রির বহু অবস্থা এমন আছে যার মধ্যে এ ধোকার কারণ পাওয়া যায় না। বিক্রীত বস্তু বাহ্যিক দখল না হওয়া সত্ত্বেও তা আইনগতভাবে ক্রেতার অধিকারে চলে আসে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় দখলপূর্ব বিক্রি পাওয়া যাবে না। ২. দখলপূর্ব বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, দখলের পূর্বে বিক্রীত বস্তু বিক্রেতার জামিনে আসে না। আর 'ربح مالم يضمن' (অর্থাৎ যার জামিন হয় নি তার থেকে লাভ হাসিল করা) জায়েয নেই।

অতএব যেখানে বাহ্যিক দখল হয় নি কিন্তু ক্রেতার আইনগত দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ বিক্রীত পণ্য থেকে উপকৃত হওয়ার বিষয়টা ক্রেতার অধিকারে এসে গেছে এবং তার জামিনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেখানে তার বিক্রয় জায়েয হবে। স্টক এক্সচেঞ্জের লোকদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে এ বিষয়গুলো জানা গেছে, নগদ বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর শেয়ারের সকল অধিকার ও দায়দায়িত্ব ক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে সেটা ক্রেতার জামিনে প্রবেশ করে। সুতরাং নগদ বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর শেয়ারের উপর বাহ্যিক দখলের পূর্বে যদি কোনো দুর্ঘটনায় কোম্পানি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতি মনে করা হবে ক্রেতার। স্টক এক্সচেঞ্জ বিক্রেতাকে টাকা প্রদান করিয়ে দেবে। এরূপভাবে দখলের পূর্বে মুনাফা (Dividend) বণ্টন হলে কোম্পানি বিক্রেতার নামে ঠিকই মুনাফা জারি করবে। কারণ, কোম্পানি রেকর্ডে এখনো পর্যন্ত বিক্রেতার নামই লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু কারবারী রীতিনীতি অনুযায়ী সে শেয়ারের সাথে মুনাফাও ক্রেতাকে প্রদান করতে বাধ্য। এসব কথা দ্বারা বুঝা গেল, বাহ্যিক দখলের পূর্বেও সে শেয়ার ক্রেতার জামিনে চলে আসে। এখন শুধু শেয়ারের মালিকানার লিখিত প্রমাণপত্র ক্রেতার হাতে আসা বাকি থাকে।

www.pathagar.com

আর শুধু এতটুকু ব্যাপার দিয়ে দখল বাধাগ্রস্ত হয় না। এ অবস্থার দাবি হল, সার্টিফিকেট হস্তগত হওয়ার আগেও শেয়ারের বিক্রি জায়েয হবে, কিন্তু অন্যদিকে যদি চিন্তা করা হয়, প্রত্যেক বস্তুর দখল প্রক্রিয়া প্রচলিত রীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, আর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শেয়ারের দখল পাওয়া গেছে তখনি মনে করা হয় যখন সার্টিফিকেট হাতে আসে। সুতরাং জায়েয না হওয়ার হুকুম দেয়া উচিৎ। বিশেষত যখন এভাবে ফটকাবাজি কারবারের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণও হতে পারে। সুতরাং এ বিপরীত দিক বর্তমান থাকায় সতর্কতা হল, সার্টিফিকেট হস্তগত না হওয়ার আগে অগ্রিম বিক্রি না করা।

## শেয়ারের উপর যাকাত

কোম্পানির শেয়ারের উপর যাকাতের কী হুকুম? এ ব্যাপারে তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

১. কোম্পানি হিসেবে কোম্পানির উপর (যা আইনগত সত্তা) যাকাত ওয়াজিব নয়। এর ভিত্তি হচ্ছে 'خلطة الشيوع' এর মাসআলার উপর। ইমামত্রয় রাহ. এর নিকট 'خلطة الشيوع'-গ্রহণযোগ্য এবং সমষ্টির উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। ইমাম শাফেয়ী রাহ. এর সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, 'خلطة الشيوع'-এর গ্রহণযোগ্যতা কেবল মুক্তভাবে বিচরণকারী পশুর ক্ষেত্রেই নয়; বরং ব্যবসায়িক পণ্যের মধ্যেও আছে। এ কারণে তাঁদের মতে কোম্পানির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যদিও কোম্পানি কোনো মুকাল্লাফ (নির্দেশিত) ব্যক্তি নয় এবং যাকাত একটি ইবাদত, যা মুকাল্লাফের উপর ওয়াজিব হয়, কিন্তু শাফেয়ীদের মূলনীতি হল, যাকাত মানুষের উপর নয়; বরং সম্পদের উপর ওয়াজিব হয়। এ কারণে তাঁদের মতে নবালেগের সম্পদেও যাকাত ওয়াজিব হয়। অথচ সে মুকাল্লাফ নয়। সুতরাং তাঁদের মতে কোম্পানির উপর যাকাত ওয়াজিব, কিন্তু শেয়ার মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

কারণ হাদীসে মূলনীতি বর্ণিত আছে : 'لاثنى فى الاسلام'

অর্থাৎ এক সম্পদে দুবার যাকাত ওয়াজিব হয় না। হানাফীদের নিকট 'خلطة الشيوع'-এর গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাদের মতে যাকাত ওয়াজিব হবে মানুষের উপর। এ কারণে হানাফীদের মতে আইনগত ব্যক্তিসত্তা হিসেবে

www.pathagar.com

কোম্পানির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়; বরং শেয়ারমালিকের উপর ওয়াজিব হবে ।

২. শেয়ারের যাকাত কোন্ হিসেবে প্রদান করা হবে? এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিবেচ্য। প্রথমত শেয়ারের মূল্য তিন রকমের হয়ে থাকে। ক. ফেস ভ্যালু, অর্থাৎ সার্টিফিকেটে লিখিত মূল্য। খ. মার্কেট ভ্যালু অর্থাৎ বাজারমূল্য, যার উপর বাজারে শেয়ার বিক্রি হয়। গ. ব্রেক আপ ভ্যালু (Break Up Value) অর্থাৎ যদি কোম্পানি বিলুপ্ত হয় তাহলে প্রত্যেক শেয়ারের মুকাবেলায় কোম্পানির সম্পত্তির যে অংশ আসবে তাই ব্রেক আপ ভ্যালু। এ তিন ধরনের মূল্যের মধ্য থেকে কোন্ মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে? যদি কোনো কোম্পানির ব্রেক আপ ভ্যালু সহজে জানা সম্ভব হয় তাহলে সম্ভবত যাকাতের হিসেবের ভিত্তি হওয়ার জন্য এটাই সর্বাধিক উপযুক্ত, কিন্তু ব্রেক আপ ভ্যালু নির্ধারণ করা খুব কঠিন। আর সাধারণ অংশীদারদের জন্য তো আরো কঠিন। সুতরাং সমকালীন প্রায় সকল আলেম এ বিষয়ে একমত, বাজারমূল্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, নামিক মূল্য যদিও শুরুতে পুঁজি বিনিয়োগের সময় প্রকৃত অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু যখন পুঁজি কোম্পানির সম্পত্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে তখন আর ফেস ভ্যালু প্রকৃত অবস্থার খুব কাছাকাছি নয়। কারণ, সম্পত্তির মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে থাকে। মার্কেট ভ্যালুতে সম্পত্তি ছাড়া অন্য উপাদান প্রভাব ফেললেও সেটা প্রকৃত অবস্থার বেশি কাছাকাছি।

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হল, শেয়ার কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তির মধ্যে আনুপাতিক হারে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানির কিছু সম্পত্তি হয় যাকাত প্রদানযোগ্য। যেমন নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদি। আবার কিছু যাকাত প্রদানযোগ্য নয়। যেমন বিল্ডিং, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। শেয়ারের যাকাত আদায় করতে যাকাতযোগ্য ও যাকাত অযোগ্য মালের মধ্যে পার্থক্য করা হবে কিনা? এ ব্যাপারে বর্তমান ফকীহদের দুটি অভিমত রয়েছে। মিসরের শায়খ আবু যুহরা মরহুমের অভিমত হল, শেয়ার নিজে ব্যবসায়ের উপাদান হয়ে গেছে। এ কারণে তার পুরো মার্কেট ভ্যালুর উপর যাকাত দিতে হবে। কী পরিমাণ সম্পত্তি যাকাতযোগ্য আর কী পরিমাণ সম্পত্তি যাকাতযোগ্য নয়, এটা অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। অন্য উলামায়ে কিরামের অভিমত হল, শেয়ার যেহেতু কোম্পানির

www.pathagar.com

সম্পত্তির মধ্যেই মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে, তাই সম্পত্তির যাকাতযোগ্য হওয়া বা যাকাতযোগ্য না হওয়ার অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আমি এ দুটি অভিমতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় বিধান করেছি, যদি কোনো ব্যক্তি কোম্পানির মুনাফায় অংশগ্রহণ করার জন্য শেয়ার নেয় তাহলে তাকে ব্যবসায়ের উপাদান হিসেবে গণ্য করা কঠিন। এক্ষেত্রে অবকাশ আছে, যদি কারো পক্ষে যাকাতযোগ্য এবং যাকাত অযোগ্য সম্পত্তির অনুসন্ধান সম্ভব হয় তাহলে সে অনুসন্ধান করে শুধু যাকাতযোগ্য সম্পত্তির যাকাত প্রদান করবে। আর যে ব্যক্তি অনুসন্ধান করতে না পারবে সে সতর্কতামূলক পুরো বাজার মূল্যের উপর যাকাত প্রদান করবে। আর যদি কেউ শেয়ার ব্যবসায়ের (Capital Gain) এবং ভবিষ্যতে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশে ক্রয় করে, তাহলে এটা ব্যবসায়ের পণ্য হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, সে যেন কোম্পানির সম্পত্তির একটা আনুপাতিক অংশ পরে বিক্রির জন্য ক্রয় করেছে। তাই পূর্ণ মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

৩. ফিকহী মূলনীতি হল, কারো উপর ঋণ থাকলে ঋণ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু বর্তমানে এটা একটা বিবেচনার বিষয়, অধিকাংশ বড় বড় পুঁজিপতি ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এত ঋণ নিয়ে রাখে যে, তাদের ঋণ সাধারণত যাকাতযোগ্য পুঁজি থেকে বেশি থাকে। সাধারণত অবস্থা এমন হয়, যদি তাদের ঋণ বাদ দেয়া হয় তাহলে তাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়া তো দূরের কথা; বরং কখনো তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব করা হয়, মেশিনারির উপর যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত করা যেতে পারে, কিন্তু মেশিনারিকে যাকাতের মাল সাব্যস্ত করা যায় না বিধায় একথা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা নছ দ্বারা স্বীকৃত। এর সঠিক সমাধান হল, যাকাত থেকে ঋণ বাদ দেয়া ফুকাহায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত নয়। হানাফী ও হাম্বলীদের মতে ঋণ বাদ হয়। শাফেয়ীদের মতে বাদ হয় না। আর মালেকীদের মতে নগদ অর্থের বেলায় বাদ হয়, কিন্তু অনগদ সম্পত্তির বেলায় বাদ হয় না।[১] এ ব্যাপারে অধমের ক্ষুদ্র অভিমত

---

[১]. كتاب الفقه على المذاهب الاربعة للجزرى ١: ٦٠٢- ٦٠٥ مبحث زكاة الدين، وفقه الاسلام وادلة ٢: ٧٤٧

www.pathagar.com

হল, দেখতে হবে, যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে সেটা কোথায় ব্যয় করা হয়েছে। যদি এ ঋণ দ্বারা এমন বস্তু ক্রয় করা হয় যা নিজে যাকাতযোগ্য, তাহলে এ ঋণ যাকাত থেকে বাদ পড়বে। আর যদি ঋণ দ্বারা এমন বস্তু ক্রয় করা হয় যা যাকাতযোগ্য নয়, তাহলে এ ঋণ বাদ পড়বে না। এমন ঋণের ব্যাপারে মালেকী ও শাফেয়ীদের বক্তব্যের উপর আমল করা হবে। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর হাফেজ মারদীনী রাহ.-এর গ্রন্থ 'الجوهر النقى' তে নজরে পড়ল, ইমাম মালেক রাহ. এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। তিনি বলেন:

ان كان عنده عروض، تفى بدينه عليه زكاة العين (الجوهر النقى حاشية بيهقى ص ١٤٩ ج ٤ باب الدين مع الصدقة)

-অর্থাৎ যদি তার কাছে পণ্যদ্রব্য থাকে যা তার ঋণকে পরিবেষ্টন করে, তাহলে তার উপর নগদ টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

# অর্থব্যবস্থা

## (Monetary System)

### অর্থের (Money) সংজ্ঞা

যে বস্তু প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার হয় এবং মূল্যমানের পরিমাপক হয়, যার মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষণ করা যায়, তাকে অর্থ বলে। এ তিন বৈশিষ্ট্য যে বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় তাকে অর্থনীতির পরিভাষায় আরবীতে 'نقد', বাংলায় 'অর্থ' এবং ইংরেজিতে Money বলে। সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ হচ্ছে কারো কাছে পণ্যদ্রব্য আছে, তার মূল্য কম বেশি হতে থাকে। তাছাড়া যে কোনো সময় তার কোনো ক্রেতা পাওয়া নিশ্চিত নয়। এ কারণে তার সম্পদ পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত নয়। তার পরিবর্তে যদি অর্থ রাখা হয় তাহলে সাধারণ অবস্থায় তা দ্বারা সম্পদ সংরক্ষিত থাকে। অর্থাৎ অস্বাভাবিক অবস্থা ব্যতিরেকে তার নিজস্ব মূল্য একরকম থাকে। তা দ্বারা যে কোনো বস্তু যখন ইচ্ছা ক্রয় করা যেতে পারে।

### অর্থ ও মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য

যে জিনিস দ্বারা বিনিময় করা যায়, মূল্যের পরিমাপ করা যায় এবং মূল্যের সংরক্ষণও হয়, তাকে অর্থ বলে। তবে আইনগতভাবেও তাকে বাধ্যতামূলক বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে স্থির করা জরুরি নয়। যেমন চেক বা প্রাইজবন্ড ইত্যাদি দলিল দ্বারা মানুষ বিনিময় করে থাকে। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি প্রাইজবন্ডের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করে আর অন্যজন তার প্রাপ্য প্রাইজবন্ডের মাধ্যমে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে আইনগতভাবে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায় না। আর মুদ্রা হল এমন অর্থ, যা বিশেষ কোনো দেশে আইনগতভাবে বিনিময়-মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে, যেমন টাকা। যদি কোনো ব্যক্তি টাকা পরিশোধ করে তাহলে আইনগতভাবে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে। এরূপ আইনগত মুদ্রাকে আরবিতে 'عملة قانونية' বাংলায় বিহিত মুদ্রা এবং ইংরেজিতে Legal Tender বলে। এগুলো আবার দুপ্রকার। এক প্রকার মুদ্রা, যা দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আইনগতভাবে পরিশোধ করা যায়। তার চেয়ে

www.pathagar.com

অতিরিক্ত প্রদান করা হলে গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না, যেমন পঁচিশ পয়সার মুদ্রা।[১] যদি কেউ পঁচিশ পয়সার মুদ্রা দ্বারা বড় ঋণ পরিশোধ করতে চায় তাহলে গ্রহীতা আইনগতভাবে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তার ঋণ টাকায় পরিশোধ করার দাবি করতে পারে। তাকে আরবিতে 'عملة قانونية محدودة' বাংলায় সসীম বিহিত মুদ্রা এবং ইংরেজিতে Limited Legal Tender বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হল, যাতে আইনগতভাবে ঋণ পরিশোধের কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। একে আরবিতে 'عملة قانونية غير محدودة', বাংলায় অসীম বিহিত মুদ্রা এবং ইংরেজিতে Unlimited Legal Tender বলে, যেমন ধাতব বা কাগজী মুদ্রা।[২]

## মুদ্রার ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা

প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রির প্রথা চালু ছিল, যাকে বিনিময়, 'مقايضة' বা Barter বলা হয়,[৩] কিন্তু তাতে কতগুলো সমস্যা ছিল। যেমন পণ্য স্থানান্তর বা পরিবহন ছিল একটা বড় সমস্যা। এ পদ্ধতিতে একই স্থানে যোগান ও চাহিদার সম্মিলন কম হত। যেমন এক ব্যক্তি গম দিয়ে কাপড় কিনতে চায়, কিন্তু কাপড়ওয়ালা গম নিতে আগ্রহী নয়। পণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে তা কারবারের ভিত্তি বানানো ছিল কঠিন। 'مقايضة' (Barter)-এর পরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বস্তুকেই অর্থ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন গম যব চামড়া ইত্যাদি। এরপর স্বর্ণ ও রুপা অর্থ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কারণ এটা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য ছিল, তা পরিবহন এবং স্থানান্তরও ছিল সহজসাধ্য। প্রাচীন যুগে মুদ্রাঙ্কন ছাড়াই স্বর্ণের পরিমাণের ভিত্তিতে বিনিময় হত। তারপর মুদ্রা প্রস্তুত প্রথার সূচনা হয়। প্রথম দিকে প্রত্যেক ব্যক্তিরই মুদ্রা বানানোর অনুমতি ছিল। সে যুগের ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান, আরবিতে 'قاعدة الذهب' এবং ইংরেজিতে Gold

---

১. আমাদের দেশে ৫ পয়সা, ১০ পয়সা, ২৫ পয়সা, ৫০ পয়সা সসীম বিহিত মুদ্রা। এরূপ সসীম বিহিত মুদ্রা আমাদের দেশের মানুষ ১০ টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করতে বাধ্য, কিন্তু তার বেশি গ্রহণ করতে বাধ্য নয়।

২. আমাদের দেশে ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা।

৩. বিভিন্ন গ্রন্থে এ কথাই লেখা রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস একথার সমর্থন দেয় না। কারণ ঐতিহাসিকভাবে এমন কোনো যুগ পাওয়া যায় না যেখানে মুদ্রা বা অর্থ হিসেবে কোনো বস্তু প্রচলিত ছিল না।

www.pathagar.com

Standard বলা হয়। এরপর স্বর্ণ ছাড়া রূপার মুদ্রাও তৈরি শুরু হয়। যে মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণ ও রুপা উভয় ধরনের মুদ্রা তৈরি করা হত তাকে দ্বি-ধাতু মান বা Bi-Metallic Standard এবং আরবিতে 'نظام المعدنين' বলা হয়। তারপর এমন এক যুগ আসে, মানুষ স্বর্ণ রুপার মুদ্রা মহাজনদের নিকট আমানত রেখে দিত। আর মহাজন আমানতের দলিল হিসেবে রসিদ লেখে দিত। প্রয়োজনের মুহূর্তে সে রসিদ দেখিয়ে মহাজন থেকে তার স্বর্ণ ফেরত নিয়ে নিত। তারপর আস্তে আস্তে লোকেরা মহাজনের দেয়া রসিদ দিয়ে পণ্য ক্রয় শুরু করে দিল। অর্থাৎ ক্রেতা আগে মহাজন থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করে বিক্রেতাকে দেয়া এবং বিক্রেতা স্বর্ণ নিয়ে পুনরায় মহাজনের কাছে রাখার পরিবর্তে ক্রেতা বিক্রেতাকে স্বর্ণের রসিদ প্রদান করত। যার অর্থ দাঁড়াত, রসিদের স্বর্ণ বিক্রেতার কাছে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। এভাবে রসিদের মাধ্যমে লেনদেন শুরু হয়ে যায় এবং মহাজনদের থেকে স্বর্ণ ফেরত আনার অবকাশ কমতে থাকে। মহাজনরা যখন দেখল, মানুষ সচরাচর স্বর্ণ ফেরত নিতে আসে না, তখন তারা মানুষের গচ্ছিত রাখা স্বর্ণ অন্যকে ঋণ দিতে আরম্ভ করল। এভাবে নোট ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয়। অর্থাৎ মহাজনদের জারিকৃত রসিদ হয়ে গেল নোট। ব্যাংকিংয়ের আলোচনার সময় এ বিষয়েও আলোচনা করা হবে। পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তি নোট প্রচলন করতে পারত। কিন্তু সে সময় বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) ছিল না। শুধু মানুষের পারস্পরিক ব্যবহারের কারণে গ্রহণযোগ্য ছিল। এ গ্রহণযোগ্যতা ও সহজসাধ্যতার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে নোটকে বিহিত মুদ্রা (Legal Tender) স্থির করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির বিহিত মুদ্রার মানসম্পন্ন নোট প্রচলন করার অনুমতি ছিল না। সরকারের অনুমোদিত (Authorised) প্রতিষ্ঠানই (ব্যাংক) তা প্রবর্তন করতে পারত। আগে সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকও নোট প্রবর্তন করতে পারত। পরে এ অধিকার শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়।

নোট (Legal Tender) হওয়ার পর তার উপর কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। এক যুগ এমন ছিল যখন নোটের বিপরীতে শতভাগ স্বর্ণ থাকত। যত স্বর্ণ থাকত আইনগতভাবে তত নোট জারি করার বাধ্যবাধকতা ছিল। এ ব্যবস্থাকে স্বর্ণপিণ্ড মান, আরবিতে 'قاعدة

www.pathagar.com

'سبائك الذهب' এবং ইংরেজিতে Gold Bullion Standard বলে। তারপর যখন দেখা গেল স্বর্ণ নেয়ার জন্য মানুষ খুব কম আসে, তখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণের হার কমিয়ে দেয়া হল। এতে আনুপাতিক হার পরিবর্তিত হতে অর্থাৎ নোটের বিপরীতে রাখা স্বর্ণের শতকরা হার কমতে থাকে। যে নোটের বিপরীতে শতভাগ স্বর্ণ না থাকে তাকে 'نقود الثقة' বা Fiduciary Money বলে। তারপর স্বর্ণের হার কমতে কমতে শূন্যের কোটায় ঠেকে। অন্তত দেশীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে নোটের বিপরীতে স্বর্ণের মজুদ থাকা জরুরি থাকে নি। এমন নোটকে প্রতীক মুদ্রা 'النقود الرمزية' (Token Money) বলে। এ মুদ্রার আইনসম্মত মূল্য প্রকৃত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। যেমন একশ টাকার নোটের আইনসম্মত মূল্য একশ টাকা, কিন্তু তার নিজস্ব মূল্য কিছুই নয়। কিছুকাল ধরে 'النقود الرمزية'-এর প্রচলন এত ব্যাপক ছিল যে, বেশির ভাগ দেশ তার নোটগুলোকে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছিল, যেন তাদের নোটের বিপরীতে ডলার ছিল। আর যেহেতু আমেরিকা ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দেয়ার স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, এ কারণে ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ ছিল। এভাবে অন্য দেশের নোটও পরোক্ষভাবে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে আমেরিকাও স্বর্ণের সাথে ডলারের সম্পৃক্ততা শেষ করে দেয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। এভাবে এখন আর কোনো নোটের বিপরীতে কোনো স্বর্ণ রুপা নেই। এখন নোট শুধু একটা পারিভাষিক মূল্য, যা কেবল ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে।

www.pathagar.com

# বিনিময় হার নির্ধারণ

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরস্পর বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? এরও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ১৮৮০ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীতে স্বর্ণমান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যদিও এ সময়কালের পূর্বেও স্বর্ণমান ব্যবস্থা চালু ছিল, কিন্তু এ যুগে যেমন পূর্ণাঙ্গভাবে চালু ছিল, তেমনটি আগে ছিল না।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় প্রত্যেক দেশের কারেন্সি স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রতিনিধিত্ব করত। যেমন ইংল্যান্ড স্থির করেছিল, এক পাউন্ডের বিপরীতে এ পরিমাণ স্বর্ণ থাকবে। আমেরিকাও স্থির করেছিল, আমেরিকান ডলারের বিপরীতে এ পরিমাণ স্বর্ণ থাকবে। যখন এ স্বর্ণমান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তখন দুদেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হত মুদ্রার বিপরীতে বিদ্যমান স্বর্ণের পরিমাণের আনুপাতিক হারে। অর্থাৎ দেখা হত, প্রত্যেক দেশের মুদ্রার বিপরীতে কী পরিমাণ স্বর্ণ আছে। দুদেশের মুদ্রার বিপরীতে প্রাপ্ত স্বর্ণের পরিমাণের মধ্যে যে অনুপাত হত, সেই আনুপাতিক হারে কারেন্সির বিনিময় হত। যেমন ইংল্যান্ডের পাউন্ডের বিপরীতে যদি চার তোলা স্বর্ণ থাকে আর আমেরিকান ডলারের বিপরীতে দু তোলা স্বর্ণ থাকে, তাহলে পাউন্ড ও ডলারের মধ্যে অনুপাত হল ১ঃ২। সুতরাং এক পাউন্ডে দুই ডলার বিনিময় হবে।

এরপর ক্রমান্বয়ে স্বর্ণমান ব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়। তারপর বিনিময় হার নির্ধারণের কোন্ পদ্ধতি চালু হয়? এটা বুঝার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন এসেছে তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দরকার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ১৯৩০ সালে বিশ্ববাজার মন্দা হয়ে পড়ে এবং সব দেশ নোটের উপর স্বর্ণ দেয়া বন্ধ করে দেয়। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। কিন্তু আমেরিকা ছিল অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ মজুদ ছিল। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার সহযোগিতায় ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য কয়েকটি দেশের এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকার ব্রেটন উডস (Bretton Woods) শহরে। এ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল কিভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চাঙ্গা করা

www.pathagar.com

যায়, কি করে পুঁজি বিনিয়োগ (Investment) উৎসাহিত করা যায়, কিভাবে নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়, যার মধ্যে স্বর্ণমান ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটিগুলো থাকবে না। এ সম্মেলন তিনটি প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একটি নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। আগে এ তিন প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল, তারপর নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

## ব্রেটন উডস সম্মেলনের তিন সংস্থা

১. এ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রথম প্রতিষ্ঠান হল 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা' (International Trade Organization), একে আরবিতে বলা হয় 'منظمة التجارة الدولية'। এর পেক্ষাপট হল, ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ নীতি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল যে, প্রত্যেক দেশ তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বর্ণ বৃদ্ধি করবে, রপ্তানি উৎসাহিত এবং আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, এ নীতিকে বলা হয় মার্কেন্টালিজম (Mercantilism) এবং আরবিতে বলা হয় 'مذهب التجاريين', কিন্তু এ নীতি সফল হয় নি, পরে তার স্থলে এ নীতি গৃহীত হয়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে হবে এবং আমদানির উপর এমন বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাবে না যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করে। এ নীতির প্রেক্ষাপটে এ সম্মেলনে উল্লিখিত সংস্থাটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, এ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার ব্যবস্থা করবে, কিন্তু আমেরিকা ছিল এ সংস্থা গঠনের বিরোধী। কারণ, আমেরিকা একটি কৃষিনির্ভর দেশ, যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উৎসাহিত হয় তাহলে ইউরোপের পণ্য কম দামে আমেরিকায় প্রবেশ করবে, আর কৃষক কৃষি ছেড়ে ব্যবসার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। এতে আমেরিকার কৃষি পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ সংস্থা গঠন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বিরোধের নিমিত্ত হয়ে ছিল। অন্যান্য দেশ এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছিল আর আমেরিকা তা অস্বীকার করে আসছিল। শেষে ১৯৪৮ সালে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের মাঝে সমঝোতা হয়, ফলে আরো একটি সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করে। তার নাম দেয়া হয় জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফ এন্ড ট্রেড (General Agreement on Tariff and Trade)। যার অর্থ বাংলায় 'শুল্ক বাণিজ্য

www.pathagar.com

চুক্তি' বলা যায়। এ সংস্থাকে সংক্ষেপে (GATT) গ্যাট বলা হয়, আর আরবিতে 'الاتفاقية العامة للتصرفات الجمركية والتجارة' বলা হয়।

কৃষি পণ্যকে এ চুক্তির আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। কৃষিপণ্য ব্যতীত অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উৎসাহিত করার জন্য নিম্নোক্ত মূলনীতি গৃহীত হয় :

১. যদি কোনো দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো বিধি-নিষেধ বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে, তাহলে অন্যান্য দেশ সে বাধা দূর করানোর জন্য 'গ্যাটের' মাধ্যমে দাবি তুলতে পারবে। আর যে দেশ 'গ্যাটের' সদস্য তার উপর 'গ্যাটের' সিদ্ধান্ত কার্যকর করা অত্যাবশ্যক হবে। ব্যবসায় প্রতিবন্ধকতা দুধরনের হয়ে থাকে– ১. শুল্ক-প্রতিবন্ধকতা। কোনো দেশ কোনো দেশের শিল্পদ্রব্যের উপর অধিক শুল্ক আরোপ করে। যার কারণে রপ্তানিকারী দেশের পণ্যের মূল্য আমদানীকারক দেশে বৃদ্ধি পায় এবং তার কেনাবেচা কম হয়। ২. অশুল্ক-প্রতিবন্ধকতা। শুল্ক ছাড়া অন্য কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় যার কারণে বিদেশী পণ্য আমদানি করা মানুষ ঝামেলা মনে করে। যেমন ফ্রান্স জাপানের ভি সি আর আমদানির উপর শর্তারোপ করেছিল, এটি কেবল অমুক ক্ষুদ্র বন্দর দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে।

২. দ্বিতীয় মূলনীতি গৃহীত হয়েছিল, কোনো দেশ কোনো দেশের সাথে ব্যতিক্রমী আচরণ করতে পারবে না। কোনো দেশ যদি কোনো দেশের সাথে উত্তম পন্থায় আর অন্য দেশের সাথে অসুবিধাজনক পন্থায় ব্যবসা করে তাহলে এ দেশ তার বিরুদ্ধে 'গ্যাটে' অভিযোগ করতে পারবে।

৩. কোনো দেশের পণ্যের উপর ব্যতিক্রমী শুল্ক আরোপ করা যাবে না। যদি কোনো দেশের পণ্যের উপর ব্যতিক্রমী শুল্ক আরোপ করা হয়, তাহলে সে দেশ ব্যতিক্রমী শুল্ক আরোপকারী দেশের বিরুদ্ধে গ্যাটে অভিযোগ তুলতে পারবে।

৪. দরিদ্র দেশের বৈদেশিক পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের অনুমতি থাকবে। কারণ, দরিদ্র দেশও যদি শুল্ক কম ধরে তাহলে বৈদেশিক পণ্য সস্তায় পাওয়া যাবে। ফলে দেশীয় শিল্পগোষ্ঠীর চাহিদা কমে গিয়ে দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৫. দু দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক বিরোধ দেখা দিলে 'গ্যাটের' মাধ্যমে পরস্পরে সমঝোতা করে তা দূর করতে হবে।

www.pathagar.com

# আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল

ব্রেটন উডস সম্মেলনে দ্বিতীয় যে সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল সেটি হল 'আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল'। যাকে আরবিতে 'صندوق النقد الدولى' এবং ইংরেজিতে International Monetary Fund বলা হয়। সহজের জন্য একে আই এম এফ (I.M.F) বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৪ সালে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৪৮ সালে এটি অস্তিত্ব লাভ করে।[১]

একটি দেশে যেমনিভাবে কতগুলো ব্যাংকের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক (সেন্ট্রাল ব্যাংক) থাকে, তেমনিভাবে কতগুলো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেন্ট্রাল ব্যাংক হচ্ছে এ সংস্থা। এটা যেন সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা সাময়িক দেনা পরিশোধের জন্য বিভিন্ন দেশকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করে। কখনো কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ় থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যবসায়ের দেনা পরিশোধের জন্য সাময়িকভাবে তার কাছে নগদ অর্থ থাকে না। এ অবস্থায় এ সংস্থা ঋণ সরবরাহ করে।

এ সংস্থায় প্রত্যেক দেশের জন্য একটা 'কোটা' (Quota) থাকে। এ কোটা নির্ধারণ করা হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে সে দেশের বাণিজ্যের অনুপাত হিসেবে। যেমন কোনো দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য একশ কোটি ডলারের আর কোনো দেশের বাণিজ্য পাঁচ কোটি ডলারের। তাহলে সে দেশ শতকরা পাঁচ ভাগ কোটা পাবে। এ কোটার হার কম বেশিও হতে থাকে। তারপর এ কোটার অর্থ ডলারে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ যে দেশের কোটা শতকরা পাঁচ ভাগ তার ব্যাপারে নির্ধারিত হয়, এর অর্থ এত ডলার।

---

[১]. এ সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে মুদ্রার বিনিময় হারের স্থায়িত্ব রক্ষা করা, মুদ্রার বহির্মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার, এস ডি আর নিয়ন্ত্রণ, সদস্য দেশের সাহায্য ইত্যাদি। প্রত্যেক সদস্য দেশের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এ সংস্থার গভর্নর পর্ষদ (Bord of Governors) গঠিত। গভর্নর পর্ষদই আই এম এফের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যের একটি কার্যকরী পরিচালক পর্ষদ (Bord of Executive Directors) আছে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, চীন ও ভারতের প্রতিনিধিগণ এ পর্ষদের স্থায়ী সদস্য এবং অবশিষ্ট ১২ জন সদস্য গভর্নর পর্ষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কার্যকরী পরিচালক পর্ষদের সভাপতি হলেন আই এম এফের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (Managing Directors)। আই এম এফের বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ১৮৪। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের মে মাসে এ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। এর সদর দফতর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

www.pathagar.com

প্রত্যেক দেশ তার কোটার পঁচিশ ভাগ স্বর্ণ এবং পঁচাত্তর ভাগ দেশীয় মুদ্রার মাধ্যমে সংস্থার কাছে জমা করে। এভাবে আই এম এফ-এর কাছে কিছু স্বর্ণ এবং বিভিন্ন দেশের কারেন্সি জমা হয়। প্রত্যেক দেশই আই এম এফ-এ ফান্ড জমা দেয়ার পর সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণের অধিকার লাভ করে। একে Drawing Rights আরবিতে 'حقوق السحب' বলে। জমাকৃত অর্থের আনুপাতিক হারে ঋণ লাভের অধিকার অর্জিত হয়। যেমন প্রত্যেক দেশ তার জমাকৃত অর্থের পাঁচ গুণ ঋণ নিতে পারবে। আবার এ হার পরিবর্তনও হতে থাকে। তারপর Drawing Rights-এর উপর যে ঋণ পাওয়া যায় তাকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশকে ট্রান্স (Tranche)[২] বলে। প্রথম ট্রান্স হয় ঐ ঋণের শতকরা পঁচিশ ভাগ যা কোনো দেশ গ্রহণের অধিকার পায়। এ ট্রান্সের উপর ঋণ কোনো শর্ত ছাড়াই পাওয়া যায় এবং সুদও কম হয়। এ ট্রান্সকে গোল্ড ট্রান্স (Gold Tranche) বলে। তার পরের ট্রান্সগুলোতে ঋণ গ্রহণের জটিলতা ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। আই এম এফ ঋণ প্রদানের জন্য বহু শর্ত আরোপ করে। ওসব ট্রান্সে সুদও বাড়তে থাকে এবং ঋণ স্বল্প মেয়াদে পাওয়া যায়। এসব ট্রান্সকে কন্ডিশনালিটি ট্রান্স (Conditionality Tranches) বলে।

এ সংস্থার পলিসি সদস্য দেশের মতামতের মাধ্যমে এবং ভোটের অধিকার দেশের সংখ্যার উপরে নয়; বরং কোটার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। যার কোটা বেশি সে ভোটের অধিকারও বেশি পায়। যার কোটা কম সে ভোটের অধিকারও কম পায়। আই এম এফ-এ আরো একটা একাউন্ট আছে যাকে Special Drawing Rights সংক্ষেপে S.D.R, আরবিতে 'حقوق السحب الخاصة' বলে। যার খোলাসা কথা হল, সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নেয়, এ বছর প্রস্তাবিত ঋণ ছাড়াও অতিরিক্ত আরো এ পরিমাণ ঋণ দেয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত ঋণ বিভিন্ন দেশের উপর বন্টনের অনুপাতও কোটার হার অনুযায়ী হয়।

---

[২]. এটা ফরাসি শব্দ, অর্থ খণ্ড বা টুকরা।

www.pathagar.com

# বিশ্বব্যাংক

৩. ব্রেটন উডস সম্মেলনে তৃতীয় যে প্রতিষ্ঠানটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার নাম International Bank For Reconstruction and Development, একে সংক্ষেপে I.B.R.Dও বলে। আরবিতে 'البنك الدولى للانشاء و التعمير' বলা হয়। সহজের জন্য তার সংক্ষিপ্ত নাম হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (World Bank)। এখন এ নামটিই বেশি প্রসিদ্ধ, আগের নাম প্রসিদ্ধ নয়। তবে মূল নাম সেটাই স্থির হয়েছিল।[১]

এ প্রতিষ্ঠান ও আই এম এফ-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আই এম এফ স্বল্পমেয়াদে ঋণ প্রদান করে। যার মেয়াদ হয় তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত। আর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়, যার মেয়াদ পনের থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রথমে এ সংস্থা প্রকল্পের (প্রজেক্টস) উপর ঋণ দিত, যেমন মহাসড়ক নির্মাণ ইত্যাদি। তারপর ১৯৬০ সালের পর সাধারণ ঋণও দেয়া শুরু করে। এখন এ প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা প্রণয়নের ঋণও দেয়। অর্থাৎ সে বলে, যদি তুমি দেশের পলিসি এভাবে তৈরি কর তাহলে এ পরিমাণ ঋণ পাবে।

## ব্রেটন উডসের মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা

ব্রেটন উডস সম্মেলনে যে তিন প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ হল। এ সম্মেলনে মুদ্রা বিনিময়ের যে নীতি স্থির হয়েছিল তার বিবরণ নিম্নরূপ :

১৯৩১ সালে স্বর্ণমান ব্যবস্থা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এ সম্মেলনে

---

[১]. যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অনুন্নত দেশগুলোকে পুনর্গঠিত ও স্বাবলম্বী করার উদ্দেশে আন্তর্জাতিক মূলধন বিনিয়োগে সহায়তা করা এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সদস্য দেশের একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এর গভর্নর পর্ষদ (Bord of Governors) গঠিত। এটিই ব্যাংকের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য ১৭ সদস্যের একটি কার্যকরী পরিচালনা পর্ষদ (Bord of Executive Directors) রয়েছে। কার্যকরী পর্ষদের ৫ জন সদস্য সর্বোচ্চ সংখ্যক শেয়ার ক্রেতা দেশের প্রতিনিধি এবং অবশিষ্ট ১২ জন সদস্য অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক ২ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্যকরী পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। সদস্য দেশগুলো থেকে সংগৃহীত এর বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২১০০ কোটি ডলার। ব্যাংকের মূলধনের শতকরা ২০ ভাগ পরিশোধিত (Paid Up)। এর সিংহভাগ মূলধন ঋণপত্র বিক্রি করে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিক্রীত ঋণপত্রের শতকরা ৪৭ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রয় করেছে। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৮৪, বাংলা দেশও এর সদস্য। এর সদর দফতর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

www.pathagar.com

বিনিময় হারের আরো একটি নতুন নীতি নির্ধারিত হয়। যেটা Bretton woods System of Exchange Rate নামে পরিচিত হয়। এ নীতির সারকথা হল, এখনো মুদ্রার মূল্যমানের পরিমাপক মৌলিকভাবে স্বর্ণই রয়েছে, কিন্তু সব দেশের মুদ্রার উপর স্বর্ণ পাওয়া যায় না; বরং এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারকে বিনিময় মাধ্যম হিসেবে স্থির করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল এরূপ, আমেরিকার ডলারকে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। কারণ আমেরিকার অবস্থা তখনো মজবুত ছিল এবং সে ডলারের উপর স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং প্রথমদিকে এক আউন্স স্বর্ণের মোকাবেলায় থাকত ৩৫ ডলার। তারপর আমেরিকা ডলারের মূল্য বৃদ্ধি করে দেয় এবং ৪২ ডলারের বিনিময়ে এক আউন্স স্বর্ণ দিতে থাকে। শুধু প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমেরিকাকে ডলার দিয়ে তার থেকে স্বর্ণ নিতে পারত এবং আমেরিকা দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কার্যত স্বর্ণ কোনো দেশই নিত না। ডলার দিয়েই কারবার চলত। এভাবে ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আর অন্য সব দেশের মুদ্রাকে ডলারের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছিল। আই এম এফ-এ এ চুক্তি হয়েছিল এভাবে, "প্রত্যেক দেশ তার মুদ্রার মূল্য একই সাথে ডলার ও স্বর্ণ উভয় হিসেবে ঘোষণা করবে।" যেমন এত টাকায় ডলার পাওয়া যাবে এবং ঐ টাকায় এত পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যাবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মুদ্রার মূল্য শুধু ডলারে বলা হয়েছে। এভাবে সব কারেন্সি ডলারের সাথে এবং ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

আই এম এফ-এ এ চুক্তিও স্থির হয়, কোনো দেশের কারেন্সির যে মূল্য ডলার দিয়ে নির্ধারিত হয়েছে, যদি দেশের মুদ্রার মূল্যে তার থেকে উত্থান-পতন হয় তাহলে এ উত্থান-পতন যদি শতকরা দুই ভাগ পর্যন্ত হয় তাহলে সেটা সহনীয়। অর্থাৎ কারেন্সির মূল্য স্থিরীকৃত রেট থেকে শতকরা দুই ভাগ কম বা দুই ভাগ বেশি হলে সেটা সহনীয়, কিন্তু কারেন্সির মূল্য শতকরা দুই ভাগ থেকে বেশি বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যের উপর হস্তক্ষেপ করে মুদ্রাকে নির্ধারিত মূল্যে নিয়ে আসবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ করার প্রক্রিয়া হবে এরূপ : যদি বাজারে মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত রেট থেকে কমে যায় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত মূল্যে মানুষের কাছ থেকে মুদ্রা ক্রয় করতে শুরু করবে। তাহলে আশা করা যায়

www.pathagar.com

মূল্য বৃদ্ধি পাবে। আর যদি বাজারে মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত রেট থেকে বৃদ্ধি পায়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কম মূল্যে তা ক্রয় করতে শুরু করবে। এতে মূল্য কমে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এ পদ্ধতিতেও যদি রেট কন্ট্রোল না হয় তাহলে আই এম এফ-এর দ্বারস্থ হবে। আই এম এফ হয় তো রেট কন্ট্রোল করার জন্য অতিরিক্ত ডলার প্রদান করবে, অথবা সে দেশের কারেন্সির রেট পরিবর্তন করে দেবে।

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, ব্রেটন উডসের এ নীতির মধ্যে বিনিময় হার (Exchange Rate) নির্ধারিত (Fixed)। এ কারণে এ ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে Fixed Exchange Rate System এবং আরবিতে 'نظام سعر الصرف الثابت' বলে। এর পূর্বে বিনিময় হারের যে স্বর্ণমান ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য মনে করা হত, তাতে মুদ্রার মোকাবেলায় স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারিত থাকত এবং রেট একই (Fixed) থাকত। যার কারণে প্রত্যেক ব্যবসায়ী মুদ্রা রেট উত্থান-পতন থেকে আশঙ্কামুক্ত হয়ে পূর্ণ নির্ভরতার সাথে ব্যবসা করত। ব্রেটন উডসের এ ব্যবস্থায়ও স্বর্ণমান ব্যবস্থার সে বৈশিষ্ট্য বহাল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তার সাথে সাথে স্বর্ণমান ব্যবস্থার মধ্যে যে দোষ ছিল, সেটা থেকে মুক্ত থাকার রাস্তা বের করা হয়েছে। সে দোষ হল, স্বর্ণমান ব্যবস্থার মধ্যে বিনিময় রেট পরিবর্তনে সরকারের কোনো ক্ষমতা ছিল না। ব্রেটন উডসের উল্লিখিত ব্যবস্থায় বিনিময় হারে পরিবর্তনের অবকাশও রাখা হয়েছে।

## ব্রেটন উডস ব্যবস্থার পতন

উল্লিখিত ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল এ কথার উপর, কোনো এক ধনী রাষ্ট্র তার মুদ্রার উপর স্বর্ণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত আছে। সুতরাং আমেরিকা তখন ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমেরিকা থেকে কেউই স্বর্ণ দাবি করত না। তবে ফ্রান্স আমেরিকার কাছে ডলারের বিপরীতে স্বর্ণের দাবি তোলা শুরু করে। যার কারণে ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যকার অবস্থাও স্বাভাবিক থাকে নি, আর আমেরিকার কাছে স্বর্ণের মজুদও কমতে থাকে। ফলে ১৯৭১ সালে আমেরিকা স্বর্ণ দিতে অস্বীকার করে বসে এবং ব্রেটন উডস ব্যবস্থা শেষ হয়ে যায়। নির্ধারিত বিনিময় হার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা (Fixed Exchange Rate System) বহাল থাকে নি। এখন বিনিময় হার ব্যবস্থার জন্য দুটি নীতি প্রচলিত হয়– ১. একটা নীতি হল, যেমন অন্যান্য পণ্যের কোনো রেট নির্ধারিত থাকে না; বরং স্বাধীন বাজার নিজেই যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে রেট স্থির করে। তেমনিভাবে মুদ্রার রেটও খোলা বাজারে ছেড়ে দিতে হবে। যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতে আপনা আপনিই রেট স্থির হতে থাকবে। যেমন ডলার এবং বাংলাদেশী টাকার যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে বাংলাদেশী টাকার সাথে ডলারের রেট নির্ধারিত হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাজারে যোগান ও চাহিদার আলোকে অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশী টাকার রেট নির্ধারিত হবে। এ নীতিকে (Freely Floating Exchange Rates) নীতি বলা হয়। আরবিতে বলা হয় 'اسعار الصرف العائمة الحرة'। ২. দ্বিতীয় নীতি ছিল, মৌলিকভাবে তো রেট স্বাধীনই থাকা উচিৎ, তা সত্ত্বেও সে সাথে সরকারের উচিৎ রেটের উপর নজর রাখা। কখনো যদি রেট মাত্রাতিরিক্ত বেশি কম হতে দেখা যায়, তাহলে সরকার হস্তক্ষেপ করবে। যার প্রক্রিয়া হবে এমন, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাজারে অবতীর্ণ হয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দেবে। এ নীতিকে ইংরেজিতে Managed Float এবং আরবিতে 'اسعار الصرف العائمة المدراة' বলা যায়।

# কাগজী নোটের ভিত্তি ও তার ফিকহী বিধান

উল্লিখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে, কাগজী নোটের উপর দিয়ে কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রথমে তার বিপরীতে পরিপূর্ণরূপে স্বর্ণ থাকত, যাকে বলা হত স্বর্ণপিণ্ড মান (Gold Bullion standard)। তারপর এল Fiduciary Money-এর যুগ। তার বিপরীতে পরিপূর্ণরূপে স্বর্ণ না থাকলেও নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বর্ণ থাকত। তারপর এক সময় আসল যখন সব মুদ্রা ডলারের সাথে আর ডলার স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত হল। অবশেষে ১৯৭১ সালের পর আমেরিকাও স্বর্ণ প্রদান করতে অস্বীকার

www.pathagar.com

করে। এখন এ নোটের বিপরীতে কোনো কিছুই আর নেই। নোটের উপর লিখিত বক্তব্য 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে' অর্থহীন হয়ে পড়েছে। এখন অবস্থা এমন হয়েছে, এটা বিনিময়ের মাধ্যম হওয়াটা কেবল পরিভাষা। তার বিপরীতে কোনো কিছুই নেই।

বর্তমান অবস্থায় কাগজী নোটের ভিত্তি কী? এর দুটি ব্যাখ্যা করা হয় :

১. অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ বলেন, নোটের বিপরীতে এজন্য স্বর্ণ রাখা হত, স্বর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সব দেশে সর্বত্র তার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে পারত। স্বর্ণকে মাধ্যম না বানিয়ে এ উদ্দেশ্য যদি কাগজী নোট দিয়ে হাসিল হয় এবং এটা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তাহলে স্বর্ণকে মাধ্যম বানানোর প্রয়োজন নেই। এ মতানুসারে নোট একটি বিশেষ ক্রয় ক্ষমতার নাম। অর্থাৎ এ নোট দ্বারা এত মূল্যের পণ্য ক্রয় করা যেতে পারে। অতএব এখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণের পরিবর্তে অনির্দিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের সমষ্টি আছে। একে ইংরেজিতে Basket of Goods এবং আরবিতে 'سلة البضائع' বলে।

২. দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যেটা ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির খুব কাছাকাছি, সেটা হল, নোটকে পারিভাষিক মুদ্রা এবং প্রচলিত অর্থ হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদিও এ কাগজের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, কিন্তু পরিভাষাগতভাবে তাকে একটি বিশেষ মূল্যমানের বিনিময় মাধ্যম নির্ধারণ করা হয়েছে।

## নোটের ফিকহী ভিত্তি

নোটের ফিকহী ভিত্তি কী? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে :

১. নিকট অতীতে উপমহাদেশের অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত ছিল, নোট নিজে কোনো সম্পদ নয়; বরং ঋণের রসিদ। কাউকে নোট প্রদান করা মানে ঋণ অর্পণ করা। এর উপর কয়েকটি মাসআলা নির্গত হয়। যেমন নোট প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না, যতক্ষণ না ফকির তা দিয়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে। নোট দ্বারা স্বর্ণ ও রুপার ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। কারণ নোটও স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং এটা মুদ্রা বিক্রয় (বায়ে ছারফ) হল। যে নোট নিয়েছে সে এখনো স্বর্ণ হস্তগত করে

www.pathagar.com

নি। সুতরাং 'تقابض فى المجلس' (এক আসরেই হস্তগতকরণ) হয় নি। অথচ এটা বায়ে ছারফ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত; বরং এ মতানুযায়ী পরস্পরে দুটি নোট বিনিময় করাও জায়েয হবে না। কারণ, এটা 'بيع الدين بالدين' (ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি), بيع الكالئ بالكالئ যেটা নাজায়েয।

এ দৃষ্টিভঙ্গি কোনো এক যুগে সঠিক ছিল, কিন্তু এখন কয়েকটি কারণে সঠিক নয়। কারণ, এখন নোটের বিপরীতে স্বর্ণ থাকে না; বরং তাকেই মূল্য স্থির করা হয়েছে; সুতরাং তাকে ঋণের রসিদ বলা কঠিন।

২. আর এক অভিমত হচ্ছে, এক টাকার নোট সম্পদ, আর অন্য নোট তার রসিদ। এ অভিমত দর্শনগত দিক থেকে সঠিক হতে পারে। কারণ, এক টাকার নোটের এবং অন্যান্য নোটের মধ্যে পার্থক্য আছে। এক টাকার নোট সরকার আর অন্যান্য নোট কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রবর্তন করে। বড় নোটের মধ্যে লেখা থাকে, 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে এত টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে'। এক টাকার নোটে এরূপ লেখা থাকে না। সরকারের যখন অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ছেপে ঋণ প্রদান করে। এক টাকার নোট মাল আর অন্যান্য নোট তার রসিদ –এ পার্থক্যের এ ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দৃশ্যত সম্ভব নয়, কিন্তু কার্যত ব্যাপার তা নয়। কারণ, বড় নোট এটা দেখে ছাপানো হয় না যে, এক টাকার নোট কী পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণ বড় নোট ছাপানো হবে। বড় নোটের সাথে এক টাকার নোটের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

তাছাড়া কোনো বস্তুকে প্রচলিত মূল্য নির্ধারণ করার জন্য এ ধরনের কোনো শর্ত নেই যে, সেটা কী বস্তু। সুতরাং যদি কোনো রসিদকে মূল্য স্থির করা হয় তাহলে তার উপরও প্রচলিত মূল্যের হুকুম জারি হওয় উচিৎ।

৩. অধিকাংশ আরব উলামায়ে কিরামের মত হল, নোট স্বর্ণ ও রুপার স্থলাভিষিক্ত। স্বর্ণ ও রুপার যে বিধান নোটেরও সে বিধান। তার কারণ হল, সোনা-রুপা এখন আর বিনিময়ের মাধ্যম থাকে নি। সোনা রুপার জায়গা এখন দখল করেছে নোট। সুতরাং যাকাত, বায়ে ছারফ, সুদ ইত্যাদি সব মাসআলায় নোটের হুকুম হবে সোনা রুপার মতো। আরব

www.pathagar.com

আলেমদের কেউ কেউ তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, সোনা রুপা আর এখন মূল্য নয়; বরং পণ্যসামগ্রী। তার উপর পণ্যের হুকুম জারি হবে। এ অভিমতটা এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে যে, কোনো বস্তুই সৃষ্টিগতভাবে মূল্য নয়। কোনো বস্তুকে মানুষ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিলে সেটা মূল্য হয়। এ গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে গেলে তার মূল্য হওয়ার মানও শেষ হয়ে যায়।

এ দৃষ্টিভঙ্গিও সঠিক মনে হয় না। কারণ, সোনা রুপা এবং নোটের মধ্যে পার্থক্য আছে। সোনা রুপাকে সৃষ্টিগত মূল্য বলা হোক বা না হোক সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু এটা স্থিরীকৃত যে, সোনা রুপাকে শরীয়ত প্রাকৃতিক মূল্য নির্ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক মূল্য হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তার মূল্যমান প্রথাগতভাবে তার বিনিময় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত নয়। মানুষ তাকে বিনিময় মাধ্যম গণ্য করুক বা পণ্য হিসেবে ব্যবহার করুক, শরয়ীভাবে তার বিধান হবে অভিন্ন। এ কারণে সোনা রুপার অলঙ্কার সোনা রুপার বিনিময়ে বিক্রি করলে তার উপরও মুদ্রা বদলের বিধান প্রযোজ্য হবে। অথচ এখানে এটা বিনিময় মাধ্যম নয়। বুঝা গেল, সোনা রুপা প্রাকৃতিক এবং শরয়ী মূল্য। আর নোট প্রচলিত মূল্য। সুতরাং নোটকে সোনা রুপার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করাও সঠিক নয়। এটা বলাও ঠিক নয়, সোনা রুপার মূল্যমান শেষ হয়ে গেছে।

৪. সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল, নোট রসিদ নয় বরং সম্পদ, সোনা রুপার ন্যায় প্রাকৃতিক মূল্য নয় বরং প্রচলিত মূল্য। এর বিধান হবে ফুলুস[১] (প্রচলিত মুদ্রা)-এর ন্যায়। এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নোটের মাসআলার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

নোট যেহেতু নিজেই সম্পদ; সুতরাং তা প্রদান করলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পরস্পরের মধ্যে তার বিনিময় বায়ে ছারফ (মুদ্রা বেচাকেনা) হবে না। যখন নোটের বিনিময় বায়ে ছারফ নয় বলে জানা গেল, তখন

---

১. فلوس শব্দটি فلس-এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অর্থ টাকা বা পয়সা। এটা মূলত মধ্যযুগে প্রচলিত একটি ধাতব মুদ্রা, যা তামা পিতল ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত করা হত। দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) ও দিরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) পাশাপাশি ফুলুসও প্রচলিত মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এর নিজস্ব কোনো মূল্যমান ছিল না; বরং দিনার ও দিরহাম দ্বারা তার মূল্যমান নির্ধারিত হত। (هذه ماخوذة من اشرف الهداية جلد ٩: ص ١٤٥)

www.pathagar.com

তার পরস্পর বিনিময়ের বিধান কী হবে? এর উত্তর হচ্ছে, নোট বিনিময়ের দুটি রূপ আছে : এক হল, একই দেশের দুটি নোটের বিনিময় হওয়া। যেমন বাংলাদেশী একশ টাকার নোটের বিনিময় হচ্ছে দশ টাকার দশটি নোটের সাথে। দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে, এক দেশের মুদ্রার সাথে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হওয়া।

প্রথম অবস্থার হুকুম হল, এটা যেহেতু বায়ে ছারফ নয়, এ কারণে একই আসরে হস্তগত করা (تقابض فى المجلس) জরুরি না হলেও বিনিময়কৃত দুটোর যে কোনো একটা মজলিসে হস্তগত করা জরুরি। যাতে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি (بيع الدين بالدين) না হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিনিময়ে কম-বেশি জায়েয আছে কি না? যেমন একশ টাকা দিয়ে নব্বই টাকার বিনিময় জায়েয হবে কি না? এর উত্তর হচ্ছে, যদি উভয় বদল অনির্ধারিত হয়, তাহলে হানাফী ইমামত্রয়ের নিকট কম-বেশি জায়েয হবে না। কারণ, ফুলুসের (মুদ্রা) মধ্যে উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে সমান সমান হওয়া জরুরি এমন বস্তুর দৃষ্টান্ত। এখানে একটি বদলের বৃদ্ধি অন্য বদলের উৎকৃষ্ট গুণের মোকাবেলা হতে পারে না। কারণ, উৎকৃষ্টতার গুণ অর্থহীন। সুতরাং এ বৃদ্ধি হবে বিনিময় বিহীন, তাকেই সুদ বলে। যদি উভয় বদল নির্দিষ্ট হয় তাহলে শায়খাইনের মতে কম-বেশি জায়েয হবে। তাঁদের মতে চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের নির্দিষ্ট করার কারণে তার মূল্যমান বাতিল হয়ে এখন এটা পণ্য হয়ে গেছে। এ কারণে তার মধ্যে কম-বেশি জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর মতে এ অবস্থায়ও কম-বেশি জায়েয নেই। কারণ, তাদের নির্দিষ্ট করার কারণে তার মূল্যমান বাতিল হয় না। বর্তমানে ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.- এর মতানুসারেই ফতোয়া দেয়া উচিৎ। কারণ, শায়খাইনের মত গ্রহণ করা হলে সুদের রাস্তা খুলে যাবে। সুতরাং পূর্ববর্তী ফকীহদের মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। প্রাচ্যের ফকীহগণ 'عدالى' এবং 'غطارفة'-এর মধ্যে কম-বেশি করা হারাম ফতোয়া দিয়েছিলেন। অথচ তাতে প্রতারণার প্রাধান্য থাকত। আর এমন নগদের ক্ষেত্রে আসল মাযহাব অনুযায়ী কম-বেশি করা জায়েয। সুদের রাস্তা বন্ধ করার জন্য কম-বেশি করা হারাম স্থির করা হয়েছে। তেমনি ফুলুসের মধ্যে বেশি-কমের ক্ষেত্রেও ইমাম

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ রাহ. এর মতের উপর ফতোয়া দেয়া উচিৎ। সুতরাং একই দেশের নোট বিক্রয়ে কম-বেশি জায়েয নেই, সমান সমান হওয়া জরুরি। আর এ সমতা নোট গণনার ভিত্তিতে নয়; বরং তার উপর লিখিত মূল্যের (Face Value) ভিত্তিতে হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতির হুকুম হল, দুদেশের মুদ্রা বিনিময়ে হ্রাস-বৃদ্ধি করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, বিনিময়কৃত দুটোর কোনো একটা হস্তগত হতে হবে। কারণ, দুদেশের মুদ্রার জাতীয়তা ভিন্ন। আর নোট তো মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা বিশেষ এক ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। আর প্রত্যেক দেশের কারেন্সির ক্রয় ক্ষমতা হয় বিভিন্ন রকম। সুতরাং প্রত্যেক দেশের কারেন্সি পৃথক জাতীয় (জিন্‌স) বলে গণ্য হবে এবং তার পারস্পরিক লেনদেনে হ্রাস-বৃদ্ধি জায়েয হবে।

সরকারও অন্য দেশের মুদ্রার সাথে নিজ দেশের মুদ্রার রেট নির্ধারণ করে দেয়। এ রেটের থেকে কমে-বেশি লেনদেন করা সুদ হবে না। তবে বেআইনি হওয়া এবং জায়েয বিষয়ে ইমামের অনুসরণ না করার কারণে গুনাহ হবে। এ বিষয়ের আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা অধমের 'احكام الاوراق النقدية' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে। এর উর্দু অনুবাদও ছাপা হয়েছে।

## মুদ্রার মূল্যমান মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন এবং মূল্য সূচক

আগের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে, কাগজী নোটের (Paper Currency) নিজস্ব কোনো প্রকৃত মূল্য নেই। এটা কিছু পণ্য ও সেবার (Goods and Services) ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। এ ক্রয় ক্ষমতাকে 'মুদ্রার মূল্যমান' (Value of Money) বলে। নোটের মূল্য নির্ধারিত হয় পণ্য ও সেবার মূল্য দ্বারা। পণ্য ও সেবার মূল্য কমে গেলে নোটের মূল্য বৃদ্ধি পায় আর বৃদ্ধি পেলে নোটের মূল্য কমে যায়। সুতরাং পণ্য ও সেবার মূল্য এবং নোটের মূল্য পরস্পর বিপরীত দিকে চলে। যখন মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পায় তখন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল দ্রব্য মূল্যও বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মুদ্রার মূল্যমান কমে আসে। এ অবস্থাকে বাংলায় মুদ্রাস্ফীতি, আরবিতে 'تضخم' এবং ইংরেজিতে Inflation বলে। পরে পরিভাষায় ব্যাপকতা আসায়

www.pathagar.com

দ্রব্য-মূল্যের যে কোনো বৃদ্ধির জন্য তা ব্যবহার করা হয়। এ বৃদ্ধি মুদ্রার অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক। যদি মুদ্রাস্ফীতি (মূল্য বৃদ্ধি) দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হয় তাহলে তাকে Demand Pull Inflation আরবিতে 'تضخم بسبب الطلب' বলে। আর মুদ্রাস্ফীতি যদি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি যেমন শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হয় তাহলে তাকে Cost Push Inflation এবং আরবিতে 'تضخم بسبب رفع الاسعار' বলে। এর বিপরীতে যদি দ্রব্যমূল্য কমে যায় আর মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে বাংলায় মুদ্রা সংকোচন, আরবিতে 'انكماش' এবং ইংরেজিতে Deflation বলে।

## মূল্য সূচক

মুদ্রার মূল্যমান, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রা সংকোচন ইত্যাদি মাপা হয় পণ্য ও সেবার মূল্য দ্বারা। দ্রব্যমূল্য দেখে মুদ্রার মূল্যমান, মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা সংকোচনের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য একটি গাণিতিক ব্যবস্থা আছে। যাকে আরবিতে 'قائمة الاسعار', বাংলায় মূল্য সূচক এবং ইংরেজিতে Price Index বলা হয়।[১]

এর প্রক্রিয়া হচ্ছে, যেসব পণ্যদ্রব্য নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং যার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি মানুষকে অধিক প্রভাবিত করে, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তারপর যে সময়ের মধ্যকার মুদ্রার মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ জানা আবশ্যক, সে সময়ের শুরু এবং শেষের মূল্য ধরে তার গড় বের করা হয়। অর্থাৎ দেখা হয়, এ সময়ের মধ্যে মূল্য গড়ে কত শতাংশ হ্রাস বা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির সাধারণ গড়। এর দ্বারা মুদ্রার মূল্যমানের সঠিক পরিমাপ হয় না। কারণ, এ গড় বের করার জন্য সব বস্তু

---

১. কতিপয় দ্রব্যের নির্দিষ্ট সময়ের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি সময়ের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, তাকে দামস্তরের সূচক সংখ্যা বলে। সূচক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পণ্যের দাম বেড়েছে ও টাকার দাম কমেছে এবং সূচক সংখ্যা হ্রাস পেলে পণ্যের দাম কমেছে ও টাকার দাম বেড়েছে বুঝায়।

সূচক সংখ্যা বের করার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। লাসপেয়ারের ফর্মুলা অনুযায়ী সূচক সংখ্যা বের করার পদ্ধতি হল:

$$\text{সূচক সংখ্যা} = \frac{\text{চলতি বছরের দাম} \times \text{উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{ভিত্তি বছরের দাম} \times \text{উৎপাদনের পরিমাণ}} \times ১০০$$

www.pathagar.com

এক সমান রাখা হয়েছে। অথচ সব পণ্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি মানুষকে এক সমান প্রভাবিত করে না। যে বস্তুর প্রয়োজন বেশি হয় তার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বেশি প্রভাবিত করে। আর যার গুরুত্ব এবং প্রয়োজন কম তার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি তত বেশি প্রভাবিত করে না। সুতরাং সঠিক পরিমাপের জন্য প্রত্যেক বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী তা পরিমাপ করা হয়। এ পরিমাপকে আরবিতে 'وزن البضائع' এবং ইংরেজিতে Weight of Commodity বলে। এ পরিমাপকে সাধারণ গড়ের সাথে গুণ করে যে গড় পাওয়া যায় তাকে পরিমিত গড়, আরবিতে 'المعدل الموزون' এবং ইংরেজিতে Weighted Average বলে। এ পরিমিত গড়ের সমষ্টি মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সূচক হবে। এভাবে মুদ্রার মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুমান করা হয়। নিম্নেলিখিত নকশা থেকে মূল্য সূচকের (Price Index) সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

| পণ্য | ১৯৯১ সালের মূল্য | ১৯৯২ সালের মূল্য | সাধারণ গড় | ওজন | পরিমিত গড় |
|---|---|---|---|---|---|
| খাদ্য | ৫০ | ১০০ | ২ | ৫ | ১.০০ |
| কাপড় | ২০ | ৩০ | ১.৫ | ০.২ | ০.৩ |
| বাড়ি | ৩০ | ৬০ | ২ | ০.৩ | ০.৬ |
| | | | সমষ্টির গড় ১.৮৩ | | সমষ্টি ১.৯ |

সাধারণ গড় থেকে জানা যায়, মূল্য এক থেকে ১.৮৩ হয়ে গেছে। সুতরাং মুদ্রার মূল্যমান ৮৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আর পরিমিত গড় থেকে জানা গেল, মূল্য এক থেকে ১.৯০ হয়ে গেছে। সুতরাং মুদ্রার মূল্যমান ৯০ শতাংশ কমেছে।

এ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা গেল, মূল্য সূচক একটি কাল্পনিক বিষয়, বাস্তব নয়। কারণ, তাতে কোন্ বস্তু গ্রহণ করা হবে তার সিদ্ধান্ত অনুমানকৃত। তারপর প্রত্যেক বস্তুকে যে ওজন দেয়া হয় সেটাও অনুমানকৃত । প্রত্যেক বস্তুর যে মূল্য ধরা হয় সেটাও অনুমানকৃত।

কখনো কতগুলো লেনদেন মূল্য সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়। যেমন এক সময় পাকিস্তানে চাকরিজীবীদের বেতন মূল্য সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল যে, মুদ্রার মূল্য যত কম হবে বেতন তত বৃদ্ধি পাবে। কোনো বস্তুকে মূল্য সূচকের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়াকে ইনডেকসেশন (Indexation) বলে।

## দেনা পরিশোধে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব

নোটের একটা মূল্য তাই, যা তার গায়ে লেখা থাকে। তাকে নামিক

www.pathagar.com

মূল্য, 'القيمة الاسمية' (Face Value) বলে। আর একটা হচ্ছে ক্রয় ক্ষমতা, যাকে প্রকৃত মূল্য 'القيمة الحقيقية' (Real Value) বলে। লিখিত মূল্য সর্বদা একই থাকে, কিন্তু প্রকৃত মূল্য (ক্রয় ক্ষমতা) মুদ্রাস্ফীতির সময় হ্রাস পায়। এখন কারো উপর যদি অন্যের ঋণ থাকে তাহলে কিছুদিন পর সেটা লিখিত মূল্য অনুসারে পরিশোধ করা হবে না ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী পরিশোধ করা হবে? যেমন কোনো ব্যক্তির উপর অন্যের একশ টাকা ঋণ ছিল। এক বছর পর একশ টাকার ক্রয় ক্ষমতা দশ শতাংশ কমে গেছে। এখন লিখিত মূল্য অনুযায়ী তো একশ টাকার নোটই দিতে হবে। আর প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী একশ দশ টাকা দিতে হবে। এ প্রশ্ন আজকাল অহরহ উঠছে, দেনা পরিশোধ লিখিত মূল্য অনুযায়ী করতে হবে না প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী করতে হবে? আরো বলা হচ্ছে, লিখিত মূল্য দিয়ে পরিশোধ করা হলে ঋণদাতার ক্ষতি এবং তার উপর জুলুম হয়। বিশেষ করে সেসব দেশে, যেখানে মুদ্রাস্ফীতির হার খুব বেশি। যেমন বৈরুতের মুদ্রা (লিরা) এক সময় ডলারের কাছাকাছি ছিল। এখন তার মূল্য এত কমে গেছে যে, এক ডলারে ছয় সাতশ লিরা পাওয়া যায়। এ মাসআলা সমাধান করার জন্য অর্থনীতিবিদ ও উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। এখানে সব দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে তার উপর পর্যালোচনা করা হচ্ছে :

১. নোট ঋণ দেয়ার অর্থ মূলত সে স্বর্ণ ঋণ দেয়া যা তার বিপরীতে আছে। এখন সে পরিমাণ স্বর্ণ তার প্রাপ্য। সে এ পরিমাণ স্বর্ণ বা তার মূল্য টাকার মাধ্যমে নিতে পারে। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গি সে ধারণার উপর নির্ভরশীল, যেখানে নোটের বিপরীতে স্বর্ণ আছে। আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ ধারণা ভুল।

২. নোটের বিপরীতে স্বর্ণ থাক বা না থাক, সর্বাবস্থায় মনে করা হবে, নোটের লেনদেন মূলত স্বর্ণের লেনদেন। কারণ, প্রথমে স্বর্ণ অর্থ ছিল, এখন নোট স্বর্ণের স্থান দখল করেছে। সুতরাং নোটের লেনদেন স্বর্ণেরই লেনদেন। অতএব দেনা পরিশোধ স্বর্ণের মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট।

এ যুক্তিও সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, এ কথা স্থিরীকৃত, এখন আর নোট স্বর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না। এটা নিজেই প্রচলিত মুদ্রা এবং ফুলুসের ন্যায়। প্রচলিত মুদ্রা ও ফুলুসের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মূল্যমান গ্রহণযোগ্য হয়। দেনা পরিশোধে তাকে স্বর্ণের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না।

www.pathagar.com

এখানে কেউ ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর অভিমত অনুসারে দলিল পেশ করেন। তাঁর অভিমত হল, দেনা পরিশোধের আগে যদি ফুলুসের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পায় তাহলে তার মূল্য হিসেবে দেনা পরিশোধ করতে হবে,[১] কিন্তু এ দলিল পেশ সঠিক মনে হয় না। কারণ, নোট ও ফুলুসের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফুলুস স্বর্ণ-রুপার সাথে সম্পৃক্ত এবং তার মূল্য সোনা-রুপার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হত। সুতরাং এ ফুলুসের অবস্থা ছিল দীনার ও দিরহামের খুচরার মতো এবং দীনার ও দিরহামের সাথে ফুলুসের এক বিশেষ সম্পর্ক থাকত। যেমন এক ফুলুস রুপার দিরহামের এক দশমাংশ। বাজারের পরিভাষায় এ অনুপাতের বদলকেই ফুলুসের মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি বলে ব্যক্ত করা হয়। এরূপ অবস্থায় যখন ফুলুস সোনা-রুপার সাথে সম্পৃক্ত এবং দীনার ও দিরহামের জন্য খুচরার ন্যায় হল, তখন ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. ফুলুসের মূল্য দিয়ে দেনা পরিশোধ করা জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। নোটের অবস্থা তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা সোনা-রুপার সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং স্বতন্ত্র পারিভাষিক মুদ্রা। তার নিজস্ব একটা মূল্যমান আছে, যার সোনা- রুপার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

তারপর সে যুগের ফুলুস ও বর্তমানের নোটের মধ্যে আরো একটা পার্থক্য আছে। সেটা হল ফুলুসের মূল্য জানার জন্য স্বর্ণ- রুপার একটা স্পষ্ট মানদণ্ড বর্তমান ছিল। যা সামনে রেখে ফুলুসের মূল্য নিশ্চিতভাবে জানা যেত, কিন্তু এখন নোটের মূল্যমানের আনুমানিক ধারণা করা যেতে পারে, প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে না। যেমন মূল্য সূচকের আলোচনায় বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে।

৩. তৃতীয় যে দর্শনটা খুব জোরেশোরে পেশ করা হয় সেটা হল, ইনডেকসেশনের দর্শন। অর্থাৎ দেনাকে মূল্য সূচকের (Price Index) সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া। এ দর্শনের দলিল পেশ করা হয়, নোট নিজে কোনো কিছুই নয়। এটা 'سلة البضائع' (Basket of Goods), অর্থাৎ কিছু পণ্যের ঝুড়ি ক্রয় ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কেউ যখন কাউকে কিছু নোট ঋণ দিল তখন যেন সে তাকে 'سلة البضائع' (Basket of Goods) দিল। 'الاقراض تقضى بامثالها' (ঋণ তার সমজাতীয় বস্তু দ্বারা

---

[১]. رسائل ابن عابدين ص ٩ ج٢

www.pathagar.com

পরিশোধ করণ)-এর দাবি হল, এখন এ পণ্যের ঝুড়িই (Basket of Goods) ফিরিয়ে দিতে হবে। এর পদ্ধতি হল, ঋণকে (Price Index) মূল্য সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। অর্থাৎ পরিশোধের সময় এ পরিমাণ নোট বেশি আদায় করা হবে যা মুদ্রাস্ফীতির হারের সমান হয়ে যায়। যেমন একশ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছিল, পরিশোধের সময় মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে দশ শতাংশ। সুতরাং এখন একশ দশ টাকা পরিশোধ করা হবে।

ফিকাহর আলোকে এ অভিমতও কতিপয় কারণে ভুল :

প্রথম কারণ হল, যদি নোটের বিপরীতে কিছু বিশেষ এবং নির্দিষ্ট পণ্য থাকত, তাহলে এটা বলা যেত, নোট প্রকৃতপক্ষে 'سلة البضائع'-এর প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে, 'سلة البضائع' কোনো নির্দিষ্ট বস্তু নয়। এটা ব্যক্তিভেদে পরিবর্তন হতে থাকে। অনুমান ছাড়া তা নির্দিষ্ট করার কোনো পথ নেই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে 'سلة البضائع' নোটের মূল নয়; বরং তার থেকে হাসিলযোগ্য উপকার। সুতরাং কাউকে নোট দেয়ার অর্থ 'سلة البضائع' প্রদান করা নয়; বরং এমন বিনিময়-উপকরণ দেয়া, যা দ্বারা 'سلة البضائع' ক্রয় করা যায়।

দ্বিতীয় কারণ হল, এ অভিমতের মূল কথা হচ্ছে, দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সমতা প্রকৃত মূল্য (Real Value) হিসেবে গৃহীত হওয়া উচিৎ। শুধু নামিক মূল্যের (Face Value) মধ্যে সমতার রেয়াত করা সঠিক নয়। শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিষয়টা তার উল্টো। শরীয়তে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে পরিমাণের সমতা ধর্তব্য। প্রকৃত মূল্যের সমতা ধর্তব্য নয়। যেমন কেউ গম ঋণ নিল। যখন ফিরিয়ে দেয়ার সময় হবে তখন সে গমের মূল্য বাড়ুক বা কমুক, সে পরিমাণ গমই ফিরিয়ে দিবে। এ যুক্তির ভিত্তিতে যে, ধর্তব্য হবে পরিমাণ; প্রকৃত মূল্য নয়। হযরত ইবনে উমর রা. এর এক হাদীস এর সুস্পষ্ট দলিল। সে হাদীসের সারকথা হল, তিনি 'নাকী' বাজারে উট বিক্রি করতেন। কখনো এমনও হত, বিক্রি হত দেরহামের মুদ্রায় আর মূল্য পরিশোধ হত দিনারের মুদ্রায়। আবার কখনো বিক্রি হত দিনারের মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ হত দেরহামের মুদ্রায়। এ ব্যাপারে রাসূল সা.-এর কাছে প্রশ্ন করা হলে তিনি

www.pathagar.com

এ শর্তে অনুমতি দেন, পরিশোধের দিনের মূল্য অনুযায়ী হতে হবে।[১] এ থেকে বুঝা গেল, তার উপর সে বস্তুর সমপরিমাণই ওয়াজিব হয়েছে যে বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি হয়েছিল। তারপর পরিশোধের সময় সে দিনের মূল্য অনুসারে বিনিময় হতে পারে। আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা গেল, ঋণের ক্ষেত্রে যে জিনিস ওয়াজিব হয় সেটা হল ঋণের পরিমাণ; মূল্য নয়। যদি মূল্য ওয়াজিব হত তাহলে ওয়াজিব হওয়ার দিনের মূল্য হিসেবে বিনিময় হত।

তৃতীয় কারণ হল, সুদী মালের মধ্যে শরীয়ত প্রকৃত সমতা জরুরি ঘোষণা করেছে। এ কারণে শরীয়ত সুদী মালের মধ্যে অনুমানভিত্তিক বেচাকেনা জায়েয রাখে নি। দেনা পরিশোধকে মূল্য সূচকের সাথে সম্পৃক্ত করলে অনুমানভিত্তিক বেচাকেনা হয়ে যায়। কারণ, একথা আগেই স্পষ্ট হয়ে গেছে, মূল্য সূচক হয় অনুমানভিত্তিক।

থাকল একটা আপত্তি তা হল, নোটের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার পরও যে পরিমাণ নোট নিয়েছিল সে পরিমাণ ফিরিয়ে দেয়া ঋণদাতার উপর জুলুম হবে। এর উত্তরের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মাথায় রাখা ভাল :

ক. টাকার মূল্য কমে যাওয়ার ব্যাপারে ঋণগ্রহীতারও কোনো হাত নেই। সুতরাং সে দায় ঋণগ্রহীতার উপর চাপানো তার প্রতি জুলুম।

খ. কাউকে অর্থ প্রদানের দুটি পদ্ধতি আছে। এক হল লভ্যাংশে শরিক হওয়ার জন্য দেয়া। লভ্যাংশে শরিক হওয়ার এ পদ্ধতি ঋণ নয়; বরং শিরকাত বা মুদারাবা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, সহানুভূতির জন্য কাউকে ঋণ প্রদান করা। সহানুভূতির জন্য কাউকে ঋণ প্রদান করা হুবহু তাই, যেমন নিজের কাছে টাকা সংরক্ষিত করে রাখা। যদি ঋণদাতা টাকা নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখত তাহলে মূল্য কমে যাওয়ার জন্য কেউ দায়ী হত না। এখানেও কেউ দায়ী হবে না।

গ. যদি ইনডেকসেশন সঠিক নীতি হয়, তাহলে এটা ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টেও চালু হওয়া উচিৎ। অথচ কারেন্ট একাউন্টে তা কেউ চালু করে না।

ঘ. মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) অবস্থায় যেমন অতিরিক্ত পরিশোধকে

---

[১]. ابو داود كتاب البيوع ص٢٥ ج ٢ رقم ٢٢٥٤

www.pathagar.com

জরুরি মনে করা হয়, তেমনি মুদ্রা সংকোচনের (Deflation) বেলায় পরিশোধের মধ্যেও কম হওয়া উচিৎ, অথচ তা কেউ বলে না।

তবে যেখানে কোনো মুদ্রার মূল্য এ পরিমাণ পড়ে যায় যাতে অর্থনীতি মন্দার শিকার হয়, যেমন বৈরুতে হয়েছে, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হতে পারে।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার উলামায়ে কিরামের জন্য বিবেচ্য বিষয়। তা হল, মুদ্রার মূল্য কখনো এভাবে হ্রাস পায় যে, খোদ সরকারই তার মুদ্রার মূল্য কমিয়ে দেয়, একে বলা হয় অবমূল্যায়ন (Devaluation)। এ প্রেক্ষিতে বিবেচ্য হচ্ছে, তাহলে এ অবস্থায় কি বলা যাবে, এখন সরকার আগের মুদ্রা বাতিল করে নতুন একটা মুদ্রা চালু করেছে যার মূল্য আগের মুদ্রার তুলনায় কম? যদি সরকারের পক্ষ থেকে মুদ্রার অবমূল্যায়নের ব্যাপারে এ ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে তখন একথা বলা যায় যে, পূর্বের মুদ্রার মূল্যের সমতুল্য নতুন মুদ্রা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। যেমন কেউ একশ টাকা ঋণ নিয়েছিল, তখন একশ টাকা চার ডলারের সমান ছিল। পরে সরকার টাকার মূল্য কমিয়ে তা তিন ডলারের সমান করেছে। অর্থাৎ সরকার যেন এমন একটা নতুন মুদ্রা চালু করেছে যা পূর্বের মুদ্রার তুলনায় ৩৩ শতাংশ কম। সুতরাং এখন এ নতুন মুদ্রার মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করা হলে ১৩৩ টাকা দিতে হবে। এ মাসআলা উলামায়ে কিরামের জন্য গবেষণার বিষয়, কিন্তু তার ফয়সালা করার সময় এ কথা মাথায় রাখতে হবে, সরকারের পক্ষ থেকে টাকার অবমূল্যায়ন করার প্রত্যক্ষ প্রভাব শুধু বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের উপর পড়ে, অভ্যন্তরীণ লেনদেনের উপর পড়ে তার পরোক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয়ত অবমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে নতুন মুদ্রা চালু করা হয় না; বরং পুরনো মুদ্রা বা নোটেরই মূল্য পরিবর্তন করা হয়, কিন্তু যেহেতু নোটের মূল্য যাই আছে তা কেবল প্রচলিত, প্রকৃত মূল্য নয়। এ কারণে সরকারের ঘোষণা দ্বারা অর্থগতভাবে এ নোট বদলে যায়।

www.pathagar.com

# ব্যাংকিং
# (Banking)

## ব্যাংকের সংজ্ঞা

'ব্যাংক' এমন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে বলে, যে মানুষের টাকা নিজের কাছে একত্রিত করে ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও অন্যান্য প্রয়োজনার্থী মানুষকে ঋণ সরবরাহ করে। বর্তমানে অনুমোদিত ব্যাংক এ ঋণের উপর সুদ আদায় করে আর আমানতকারীদের কম হারে সুদ প্রদান করে। এ সুদের মধ্যবর্তী পার্থক্য ব্যাংকের লাভ।

## ব্যাংকের ইতিহাস

অর্থব্যবস্থার ক্রমবিকাশের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, লোকেরা তাদের স্বর্ণ স্বর্ণকার বা মহাজনদের কাছে আমানত হিসেবে রেখে দিত আর মহাজন তার রসিদ লেখে দিত। তারপর কালক্রমে এ রসিদের মাধ্যমেই লেনদেন শুরু হয়ে যায়। মানুষ স্বর্ণ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য কম আসত। এ অবস্থা দেখে মহাজনরা স্বর্ণ ঋণ দেয়া শুরু করে দেয়। তারপর যখন দেখল, লোকেরা সাধারণত রসিদের মাধ্যমেই লেনদেন করে, তখন মহাজনরাও ঋণগ্রহীতাদের স্বর্ণের পরিবর্তে রসিদ দেয়া শুরু করে। এভাবে ব্যাংকের সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে তাকেই একটি সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের রূপ দেয়া হয়েছে।

## ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

ব্যাংকও মৌলিকভাবে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি'। কোম্পানি গঠনের যে নিয়ম ব্যাংক প্রতিষ্ঠার নিয়মও তাই।

ব্যাংক লোকদেরকে তাদের আমানত জমা রাখার জন্য আহ্বান জানায় (যা ফিকহীভাবে ঋণই হয়)। তাকে বাংলায় 'আমানত', আরবিতে 'ودائع' এবং ইংরেজিতে Deposit বলে। আমানত কয়েক প্রকার হয় :

**১. চলতি হিসাব (Current Account) :** কারেন্ট একাউন্ট যাকে আরবিতে 'الحساب الجارى' এবং বাংলায় 'চলতি হিসাব' বলে, এ একাউন্টে রাখা টাকার উপর কোনো সুদ পাওয়া যায় না। এ একাউন্টে

www.pathagar.com

জমা রাখা টাকা যে কোনো সময় যত পরিমাণে ইচ্ছা কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই উত্তোলন করা যায়।

**২. সঞ্চয়ী হিসাব (Saving Account) :** একে আরবিতে 'الحساب التوفير' এবং বাংলায় 'সঞ্চয়ী হিসাব' বলে। এ একাউন্টে রাখা টাকা উত্তোলনের জন্য সাধারণত বিভিন্ন শর্ত থাকে। এর উপর ব্যাংক সুদ প্রদান করে।

**৩. স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) :** একে আরবিতে 'ودائع ثابتة' এবং বাংলায় 'স্থায়ী আমানত' বলে। এ একাউন্টে রাখা টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে ফেরৎ নেয়া যায় না। এর উপরও ব্যাংক সুদ প্রদান করে এবং সুদের হার মেয়াদ অনুযায়ী হয়। দীর্ঘমেয়াদের উপর সুদের হার বেশি এবং স্বল্পমেয়াদের উপর কম হয়।

যখন এ তিন প্রকার ডিপোজিট থেকে ব্যাংকের কাছে মূলধন জমা হয় এবং ব্যাংকের কিছু প্রাথমিক মূলধনও থাকে, তখন এ সকল মূলধন ব্যবহার করার পদ্ধতি হচ্ছে, এ মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ তারল্য হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা করা জরুরি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এ মূলধন সাধারণত এমন সরকারি ঋণপত্রের আকারে জমা থাকে, যা সহজেই নগদে পরিবর্তন করা যায় এবং তার উপর কিছু সুদও পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকই স্থির করে, বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আমানতের শতকরা কত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী এর হার পরিবর্তিত হতে থাকে। বর্তমানে আমানতের প্রায় শতকরা চল্লিশ শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখতে হয়।[১] কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ব্যাংককেই এটা করতে বাধ্য করে। কারণ ব্যাংকে অসংখ্য মানুষের টাকা থাকে। আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব। তরল মূলধন অর্থ এমন মূলধন, যা নগদ অথবা দ্রুত নগদায়নযোগ্য, তাকে আরবিতে 'السيولة', ইংরেজিতে (Liquidity) এবং বাংলায় 'তারল্য' বলে।

---

[১]. এ হার পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকের চলতি ও স্থায়ী আমানতের শতকরা আঠার ভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। এর মধ্যে শতকরা পাঁচ ভাগ ক্যাশ হিসেবে এবং বাকি তের ভাগ সরকারি বন্ড ও অন্যান্য সরকারি সিকিউরিটিজ হিসেবে জমা করতে হয়।

www.pathagar.com

এর মধ্যে নগদ ক্যাশ, অন্য ব্যাংকের একাউন্ট এবং এমন দলিলাদি শামিল যা সহজে নগদে পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন সরকারি ঋণপত্র ইত্যাদি। তারপর ব্যাংক কিছু তরল মূলধন নিজের কাছেও রেখে দেয়, যাতে আমানতকারীদের চাহিদা মেটাতে পারে।

## ব্যাংকের কার্যাবলী

ব্যাংক মূলধন সংগ্রহ করার পর অনেকগুলো কাজ করে থাকে। যেমন অর্থের যোগান, মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টি, আমদানি রপ্তানির মাধ্যম হওয়া ইত্যাদি। এখানে এসব কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

# অর্থের যোগান (Financing)

ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে মানুষকে তাদের প্রয়োজনে বিশেষ করে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণ প্রদান করা। ব্যাংক কখনো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ চালু করে। এরূপ ঋণকে আরবিতে 'ائتمان طويل الاجل' এবং ইংরেজিতে Long Term Credit বলে। আবার কখনো স্বল্পমেয়াদী ঋণ চালু করে। যা সাধারণত তিন থেকে ছয় মাস মেয়াদী হয়। একে আরবিতে 'ائتمان قصير الاجل' এবং ইংরেজিতে Short Term Credit বলে।

ব্যাংক থেকে মানুষ তিন ভাবে ঋণ গ্রহণ করে– ১. দৈনন্দিন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা হয়, যেমন বিল পরিশোধ বা বেতন পরিশোধের জন্য ঋণ নেয়া, একে Over Head Expenses বলে। ২. কারবারের চলমান ব্যয় যেমন ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় এবং কাঁচা মাল ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য ঋণ গ্রহণ করা, একে আরবিতে 'رأس المال العامل' এবং ইংরেজিতে Working Capital বলে। ৩. বড় বড় প্রকল্পের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে আরবিতে 'تمويل المشاريع' এবং ইংরেজিতে Project Financing প্রকল্প ঋণ বলে।

**ঋণদানের প্রক্রিয়া :** যেখানে যত পরিমাণ ইচ্ছা ঋণ প্রদান করবে, ব্যাংকের ঋণ প্রদানের এরূপ অবাধ ক্ষমতা থাকে না; বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি সীমা নির্ধারিত থাকে। তার সীমার ভিতরে থেকে ব্যাংক ঋণ প্রদান করতে পারে। এ সীমাকে আরবিতে 'سقف الاعتماد'

www.pathagar.com

এবং ইংরেজিতে Credit Ceiling বলে। যেমন বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে নির্দেশনা আছে, ব্যাংক তার মোট আমানতের চল্লিশ ভাগ (৪০%) কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখবে। যাকে আরবিতে 'احتياطى السيولة' এবং ইংরেজিতে Liquidity Reserve, বাংলায় তারল্য সংরক্ষণ বলে। আর পাঁচ ভাগ (৫%) ব্যাংক তার নিজের কাছে নগদ (Cash) হিসেবে রাখবে। ত্রিশ ভাগ (৩০%) পর্যন্ত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করতে পারবে। অবশিষ্ট পঁচিশ ভাগ (২৫%) দ্বারা সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করবে অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সরবরাহ করবে। যেমন পি আই এ, ওয়াপদা স্টিল মিলস ইত্যাদি।[১]

'سقف الاعتماد' নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে কয়েকটি কার্যকারণের দখল রয়েছে। যেমন কখনো কোনো বিশেষ বিভাগ, যেমন কৃষি বা শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিক অর্থ বিনিয়োগ কাম্য হয়। তখন ব্যাংকের দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কখনো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কারণ, ব্যাংকের অধিক ঋণ প্রদানের কারণেও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। সামনে 'মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টি' শিরোনামের অধীনে তার ব্যাখ্যা করা হবে। আবার কখনো প্রচলিত কর দিয়ে সরকারের ব্যয় সংকুলান হয়ে উঠে না, অতিরিক্ত কর আরোপ করাও কঠিন হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ (Reserve) বাড়িয়ে এবং ব্যাংকগুলোকে সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জনসাধারণের টাকার একটা বিরাট অংশ সরকার ঋণ নিয়ে নেয়।

'سقف الاعتماد'-এর সীমার মধ্যে থেকে ব্যাংকগুলোর ঋণদানের প্রক্রিয়া হল, সর্বপ্রথম ব্যাংক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, যে ব্যক্তি ঋণ চাইছে সে নির্দিষ্ট মেয়াদের পর ঋণ ফেরৎ দেবে কি না। তার জমি এবং সম্পত্তি কী আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ব্যাংক একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়, আমরা এত দিনের মধ্যে এত টাকা ঋণ দিতে প্রস্তুত আছি, যা প্রয়োজন অনুযায়ী সময়ে সময়ে নেয়া যাবে। ঋণের সীমা নির্দিষ্ট করাকে আরবিতে 'تحديد السقف' এবং ইংরেজিতে Sanction of The Limit বলে। সীমা নির্দিষ্ট

---

১. এটা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন। বাংলাদেশে ক্রেডিট সেলিংয়ের সীমা ব্যাংকভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

করার পর ঐ ব্যক্তির জন্য ব্যাংকে একটা একাউন্ট খোলা হয়। এ একাউন্ট থেকে যখন ইচ্ছা এবং যতটুকু ইচ্ছা ঋণ নিতে পারে। এ একাউন্ট খোলার উপর ব্যাংক খুব সামান্য হারে সুদও নেয় (যেমন ০.৫% বা ১%)। আর যখন সে ঋণ গ্রহণ করে ফেলে তখন নিয়মতান্ত্রিক হারে সুদ নেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে সাধারণত এমন হয়, একবার ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে তার মধ্য থেকে যা বেঁচে যায় তা পুনরায় ব্যাংকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এভাবে টাকা নেয়া এবং ফিরিয়ে দেয়ার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। মেয়াদ শেষ হবার পর ব্যাংক হিসাব করে, কত টাকা কত দিন তার কাছে থাকল। সে হিসাব অনুযায়ী তার থেকে সুদ নেয়া হয়।

## ব্যাংকের শ্রেণীবিভাগ (বিনিয়োগ হিসেবে)

ব্যাংক কয়েক প্রকার। কিছু ব্যাংক বিশেষ ক্ষেত্রে আর কিছু ব্যাংক ব্যাপক ক্ষেত্রে অর্থের যোগান দেয়। সে হিসেবে ব্যাংকের প্রকারগুলো নিম্নরূপ :

**১. কৃষি ব্যাংক** : যাকে আরবিতে 'المصرف الزراعى' এবং ইংরেজিতে Agricultural Bank বলে। এ ব্যাংক কৃষিক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে।

**২. শিল্প ব্যাংক** : যাকে আরবিতে 'المصرف الصناعى' এবং ইংরেজিতে Industrial Bank বলে। তার কাজ হচ্ছে শিল্প উন্নয়নের জন্য ঋণ সরবরাহ করা।

**৩. উন্নয়ন ব্যাংক** : যে ব্যাংক কোনো একটা বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঋণ প্রদান করে, তাকে উন্নয়ন ব্যাংক বলে। একে আরবিতে 'بنوك التنمية' এবং ইংরেজিতে Development Bank বলে।

**৪. সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank)** : একে

www.pathagar.com

আরবিতে 'المصرف التعاونى' বলা যায়। এ ব্যাংক পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কাজের পরিধি সদস্যদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। যে লোক তার সদস্য হয় শুধু তার ডিপোজিট থাকে এবং তাকেই ঋণ প্রদান করা হয়।

**৫. বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank) :** আরবিতে বলে 'بنك الاستثمار'। দৃশ্যত বিভিন্ন দেশে এ পরিভাষা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে এর দ্বারা এমন ব্যাংক বুঝায় যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদের ডিপোজিট থাকে। কারেন্ট একাউন্ট বা সেভিং একাউন্ট তাতে থাকে না। শুধু ফিক্সড ডিপোজিট থাকে। আর ঋণও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য চালু করা হয়। তার থেকে কম মেয়াদে ঋণ প্রদান করা হয় না।

উল্লিখিত ব্যাংকগুলোর কার্যপরিধি সীমিত হয়।

**৬. বাণিজ্যিক ব্যাংক :** এমন ব্যাংক যা সাধারণভাবে অর্থ বিনিয়োগের কাজ করে। এর কার্যক্রম কোনো বিভাগের সাথে নির্দিষ্ট নয়। তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) এবং আরবিতে 'البنك التجارى' বলে।

## আমদানি রপ্তানিতে ব্যাংকের ভূমিকা

ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে আমদানি রপ্তানিও অন্তর্ভুক্ত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে (আমদানি রপ্তানি) ব্যাংক এক অত্যাবশ্যকীয় মাধ্যম। ব্যাংকের ওকালতি এবং মারফত ছাড়া আমদানি রপ্তানি সম্ভব নয়।

এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : যখন কোনো ব্যক্তি অন্য দেশ থেকে কোনো বস্তু আমদানি করতে চায়, তখন অন্য দেশের ব্যবসায়ী এ কথার নিশ্চয়তা চায়, যখন আমি প্রার্থিত পণ্য ক্রেতাকে পাঠিয়ে দেব তখন সে বাস্তবিকপক্ষে আমাকে মূল্য পরিশোধ করবে। সুতরাং আমদানিকারক রপ্তানিকারককে আশ্বস্ত করার জন্য ব্যাংক থেকে একটি জামানতনামা সংগ্রহ করে। এর মধ্যে ব্যাংক বিক্রেতাকে একথার জামানত প্রদান করে, এ বস্তু অমুক লোকের কাছে বিক্রি করা হলে তার দেনা পরিশোধের যিম্মাদার আমি হব। একে বাংলায় প্রত্যয়নপত্র, আরবিতে 'خطاب الضمان'

www.pathagar.com

বা 'خطاب الاعتماد' বলে। আর ইংরেজিতে Letter of Credit এবং সংক্ষেপে (L/C) বলা হয়। এ জামানতনামা সংগ্রহ করাকে বাংলায় এল সি খোলা এবং আরবিতে 'فتح الاعتماد' বলে। ব্যাংক এল সি খুলে রপ্তানিকারকের ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। রপ্তানিকারকের ব্যাংককে Negotiating Bank বলে। এল সি পৌঁছার পর সেখান থেকে মাল জাহাজে বুক করে দেয়া হয়। জাহাজ কোম্পানি মাল বুক হওয়ার রসিদ প্রদান করে। এ রসিদকে বাংলায় বহনপত্র বা চালানি রসিদ আরবিতে 'بوليصة الشحن' এবং ইংরেজিতে Bill of Lading বলে। রপ্তানিকারকের ব্যাংক এ বিল অব ল্যাডিংসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এল সি খোলা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। আমদানিকারক তার ব্যাংক থেকে এসব কাগজপত্র সংগ্রহ করে এল সির সাথে মিলিয়ে নেয়। কাগজে মালের যে বিবরণ লেখা হয়েছে তা অর্ডারের খেলাফ হলে কাগজ ফিরিয়ে দেয়া হয়। যদি কাগজপত্রের বিবরণ এল সি মোতাবেক হয় তাহলে এ কাগজ দেখিয়ে বন্দর থেকে মাল খালাস করা হয়। আর ব্যাংক সাধারণত এ কাগজপত্র আমদানিকারককে তার মূল্য পরিশোধের পর প্রদান করে থাকে। দেনা পরিশোধের জন্যও ব্যাংক এবং আমদানিকারকের মধ্যে বিভিন্ন চুক্তি হয়ে থাকে। কখনো আমদানিকারক এল সি খোলার সময়ই পুরো টাকা পরিশোধ করে দেয়। এ অবস্থাকে পরিভাষায় বলা হয় ফুল মার্জিন (Full Margin), আরবিতে একে 'فتح الاعتماد بغطاء كامل' বলে। কখনো ব্যাংক থেকে কাগজপত্র উঠানোর সময় সব বিল পরিশোধ করা হয়, একে 'জিরো মার্জিন'-এর উপর এল সি খোলা হয়েছে বলা হয়। কখনো এল সি খোলার সময় অল্প কিছু পরিশোধ করা হয়। এ অবস্থাকে মোট টাকার শতকরা যত ভাগ পরিশোধ করা হয় তত ভাগ মার্জিনের উপর এল সি খোলা বলে। যেমন মোট মূল্যের পঁচিশ ভাগ টাকা যদি এল সি খোলার সময় ব্যাংকে জমা দেয়া হয়, তাহলে বলা হবে, এ এল সি পঁচিশ ভাগ মার্জিনের উপর খোলা হয়েছে। কখনো এমন চুক্তিও হয়, কাগজ আসার পর ব্যাংক নিজের পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধ করে দেবে, আর আমদানিকারক একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তা পরিশোধ করবে। এ অবস্থায় আমদানিকারকের উপর ব্যাংকের ঋণ হয়ে যায়, যার উপর ব্যাংক সুদ আদায় করে।

www.pathagar.com

## এল সি-এর উপর ফিস

এল সি খোলার ব্যাপারে যেসব কার্যক্রম চালাতে হয় তার উপর ব্যাংক পারিশ্রমিক নেয়। আমদানিকারকের ব্যাংক তিনটি কাজ করে থাকে।

**১. ওকালত (Agency) :** অর্থাৎ ব্যাংক আমদানিকারকের উকিল হয়ে রপ্তানিকারকের সাথে লেনদেন করে। ক্রেতার কাগজপত্র রপ্তানিকারকের কাছে প্রেরণ করে এবং রপ্তানিকারকের প্রেরিত কাগজ ইত্যাদি আমদানিকারকের কাছে পৌছায়। এসব সেবার বিনিময়ে ব্যাংক পারিশ্রমিক নেয়।

**২. জামানত (Guarantee) :** অর্থাৎ ব্যাংক রপ্তানিকারককে এ কথার জামানত নেয়, ক্রেতা যদি টাকা পরিশোধ না করে তাহলে সে টাকা পরিশোধ করবে। এর উপরও পারিশ্রমিক নেয়।

**৩. ঋণ (Credit) :** অর্থাৎ ব্যবসায়ী যখন সাথে সাথে মূল্য পরিশোধ না করে এবং ব্যাংক তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়, তখন এ টাকা আমদানিকারকের উপর ব্যাংকের ঋণ হয়ে যায়। যার উপর সে আমদানিকারকের কাছ থেকে সুদ উসুল করে।

ঋণ দুপ্রকারের হতে পারে। কখনো নিয়মমাফিক ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং চুক্তি হয়, সময়মতো ব্যাংক দেনা পরিশোধ করে দেবে। আমদানিকারক তার কিছুদিন পর ব্যাংককে পরিশোধ করে দেবে। এটা একটা ভিন্ন চুক্তি। এল সি-র ফিসের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর উপর আলাদাভাবে নিয়মতান্ত্রিক হারে সুদ নেয়া হয়। কখনো নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঋণ নেয়া হয় না ঠিক, কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেনের মধ্যে এল সিধারী ব্যক্তির উপর ঋণ হয়ে যায়। এটা হয় এভাবে, কখনো এল সি খোলার সময় পুরো টাকা পরিশোধ হয়ে যায়, তাকে শতভাগ মার্জিনের (Margin) উপর এল সি খোলা বলে। কখনো কিছু পরিশোধ হয়, যেমন ২৫% পরিশোধের উপর এল সি খোলা হলে তাকে ২৫% মার্জিনের (Margin) উপর এল সি খোলা বলা হবে। কখনো এল সি খোলার সময় কিছুই পরিশোধ করা হয় না, তাকে জিরো মার্জিনের উপর এল সি খোলা বলে। যখন পরিশোধ ছাড়াই অথবা কিছু পরিশোধের উপর

www.pathagar.com

এল সি খোলা হয় তখন কাগজপত্র আসতেই ব্যাংক পরিশোধ করে দেবে। তবে শর্ত হল, পণ্যের কাগজপত্র এল সির শর্তানুযায়ী হতে হবে এবং কোনো অসামঞ্জস্য থাকবে না, কিন্তু আমদানিকারকের পক্ষ থেকে কোনো কারণে দেনা পরিশোধে কিছু দিন বিলম্ব হয়ে যায়। যেমন এ কারণে বিলম্ব হয়, ব্যাংকের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করতে দেরি হয়ে গেছে। এ অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ দিনগুলোর ঋণ হয়ে যায়। এ ঋণের উপরও সুদ নেয়া হয়।

অপর দিকে রপ্তানিকারকের ব্যাংক কোনো কিছুর জামানত দেয় না। এখানে ব্যাংকের মাত্র দুটি কাজ হয়, এর উপর ব্যাংক বিনিময় গ্রহণ করে। সে দুটি কাজ হচ্ছে– ১. ওকালত ও ২. ঋণ।

এখানে ঋণ হওয়ার পদ্ধতি হল, এল সিতে কখনো চুক্তি থাকে, কাগজপত্র আসতেই দেনা পরিশোধ করতে হবে, একে L/C at Sight বলে। এ অবস্থায় রপ্তানিকারকের ব্যাংককে কোনো ঋণ দিতে হয় না। কখনো চুক্তি হয়, কাগজপত্র পৌঁছার এত দিন পর ক্রেতার পক্ষ থেকে বিল পরিশোধ করা হবে। এ অবস্থায় যদি আমদানিকারকের ব্যাংক রপ্তানিকারক ব্যবসায়ীকে তৎক্ষণাৎ বিল পরিশোধ করে দেয় তাহলে এটা রপ্তানিকারকের উপর ব্যাংকের পক্ষ থেকে ঋণ হয়ে যাবে।

আমদানিকারকের কাছে কখনো আমদানি করার জন্য টাকা থাকে না বা থাকলেও সে এ টাকা আমদানির কাজে ব্যবহার করে আটকাতে চায় না। তখন সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমদানি করে। আমদানি করার জন্য ব্যাংক যে ঋণ প্রদান করে তাকে আরবিতে 'تمويل الواردات' এবং ইংরেজিতে Import Financing বলে। অনুরূপ রপ্তানি করার জন্যও ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া যায়। অর্থাৎ কোনো ব্যবসায়ীর কাছে বাইরের কোনো দেশ থেকে পণ্য ক্রয়ের অর্ডার আসল, সে পণ্য তৈরি বা সরবরাহ করার জন্য তার টাকার প্রয়োজন। এ অর্থ সে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রার্থিত পণ্য তৈরি বা সংগ্রহ করে রপ্তানি করে। এ অবস্থায় ব্যাংক রপ্তানিকারককে যে ঋণ প্রদান করে তাকে 'تمويل الصادرات' এবং ইংরেজিতে Export Financing বলে।

সব সরকারই রপ্তানি উৎসাহিত করে, যাতে দেশীয় পণ্য বাইরে বিক্রি হয়ে তা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে। পাকিস্তানেও রপ্তানি উৎসাহিত

www.pathagar.com

করার জন্য স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান একটি স্কিম চালু করেছে, তাকে Export Refinancing 'الصادرات اعادة تمويل' বলে। এর কর্মপদ্ধতি আগে এমন ছিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা জারি করেছিল, রপ্তানির জন্য প্রদত্ত ঋণের উপর কম হারে সুদ গ্রহণ করতে হবে। যেমন সাধারণ সুদের হার ১৫ শতাংশ হলে রপ্তানি সংক্রান্ত ঋণের উপর আট শতাংশ সুদ গ্রহণ করা যাবে। এভাবে যে বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ দেবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে পরিমাণ টাকা সে ব্যাংককে দিয়ে দেবে। এ আট শতাংশ সুদের পাঁচ শতাংশ নেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, আর তিন শতাংশ সুদ বণিজ্যিক ব্যাংকের থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের লাভ হল, নিজের টাকা না খাটিয়েই সে তিন শতাংশ সুদ পেয়ে যেত। কারণ ঋণের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরবরাহ করেছে।

এখন এর কর্মপদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে টাকা দেয়ার পরিবর্তে সে ব্যাংকের নামে ওই পরিমাণ টাকার ডিপোজিট একাউন্ট খুলে দেয়। তার উপর ট্রেজারি[১] বিলের হিসেবে সে বাণিজ্যিক ব্যাংক সুদ প্রদান করে, যা সাধারণত চৌদ্দ বা পনের শতাংশ হয়ে থাকে। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক যে আট শতাংশ সুদ ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে পাবে তার থেকে পাঁচ শতাংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রদান করবে। এর থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের তিন শতাংশ সুদ বাঁচবে। আর চৌদ্দ বা পনের শতাংশ সুদ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে পাবে। এর উদ্দেশ্য রপ্তানি খাতে পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

## বিল অব এক্সচেঞ্জ

বিনিময় বিল একটি বিশেষ ধরনের দলিল। যখন কোনো ব্যবসায়ী তার মাল বিক্রি করে তখন ক্রেতার নামে বিল তৈরি করে। কখনো এ বিলের টাকা ভবিষ্যতের কোনো তারিখে পরিশোধ করা আবশ্যক হয়। এ বিলকে দালিলিক রূপ দেয়ার জন্য ঋণী ব্যক্তি তা গ্রহণ করে তার উপর স্বাক্ষর করে দেয়, অমুক তারিখে এ বিলের টাকা পরিশোধ করা আমার উপর অবশ্য কর্তব্য। একে বাংলায় বিনিময় বিল এবং আরবিতে 'كمبيالة'

---

১. এর ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর বর্ণনায় আসছে। এর উপর নিলামের মাধ্যমে সুদ নির্ধারিত হয়।

www.pathagar.com

ও ইংরেজিতে Bill of Exchange বলে। বিনিময় বিলে পরিশোধের যে তারিখ লেখা থাকে সে তারিখ উপস্থিত হওয়াকে আরবিতে 'نضج الكمبيالة' এবং ইংরেজিতে Maturity বলে। আর এ পরিশোধের তারিখকে বলে Maturity date। বিনিময় বিলে লিখিত ঋণ তা পরিশোধের তারিখ আসার পরই ঋণী ব্যক্তি থেকে নেয়া যায়, কিন্তু ঋণদাতার তাৎক্ষণিকভাবে টাকার প্রয়োজন হলে তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে এ বিল প্রদান করে লিখিত টাকা নিয়ে নেয়, আর বিলের অপর পিঠে স্বাক্ষর করে তার অধিকার তৃতীয় ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করে। তৃতীয় ব্যক্তি তার উপর লিখিত টাকার বাট্টা দেয়। যেমন হুন্ডির উপর এক হাজার টাকা লিখিত আছে, সে সেখানে নয়শ পঞ্চাশ টাকা দেয়। এ কাজকে আরবিতে 'خصم الكمبيالة' এবং ইংরেজিতে Discounting of the Bill of Exchange এবং বাংলায় বিনিময় বিল বাট্টাকরণ বলে। বিলের পিঠে যে স্বাক্ষর করা হয় তাকে আরবিতে 'تظهير', ইংরেজিতে Endorsement এবং বাংলায় অনুমোদন স্বাক্ষর করণ বলে। বিলের উপর বাট্টা প্রদানের হার Maturity বা 'نضج الكمبيالة'-এর উপর বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়। পরিশোধের তারিখ যত নিকটে হবে বাট্টা দেয়ার হার তত কম হবে।

ব্যাংকও সাধারণত বিনিময় বিলের উপর ডিসকাউন্টিং করে। এটাও ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদী ঋণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ বিনিময় বিলে দেনা পরিশোধ (Maturity) সাধারণত তিন মাসের মধ্যে হয়।

## মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টির কাজ

ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যার আলোচনা এখানে অত্যন্ত জরুরি। তা হল, ব্যাংক আগে থেকে বিদ্যমান মুদ্রা আরো বৃদ্ধি করে তার প্রসারতা বাড়ায় এবং মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির কাজ করে। তাকে মুদ্রার 'উপযোগ সৃষ্টি' বা প্রচলন সৃষ্টি (ঋণ আমানত সৃষ্টি) বলে। নিচে তার ব্যাখ্যা করা হল।

মানুষের কাছে যে টাকা আসে তার খুব কম অংশই মানুষ তার নিজের কাছে রাখে, বেশির ভাগ অংশই রাখে ব্যাংকে। তেমনিভাবে লোক যখন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তখন নগদ নেয়া জরুরি মনে করে না; বরং ঋণ দেয়ার সাধারণ পদ্ধতি এমন হয়, ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে একাউন্ট

www.pathagar.com

খুলে তাকে চেক বই দিয়ে দেয়, যাতে প্রয়োজনের সময় চেক ইস্যু করে চেকের মাধ্যমে দেনা পরিশোধ করতে পারে। যেমন কেউ ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিল। ব্যাংক তাকে নগদ এক লাখ টাকা দেয়ার পরিবর্তে তার নামে এক লাখ টাকার একাউন্ট খুলে তাকে চেক বই দিয়ে দেয়। যখনই তার কোথাও কোনো টাকা পরিশোধের প্রয়োজন হবে তখনই সে চেক ভাঙ্গিয়ে তা পরিশোধ করতে পারবে। এ দুটো কথা সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝা যাবে, ব্যাংকের কাছে যত নোট মজুদ থাকে তা দিয়ে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ফায়দা উঠানো হয়। তা এভাবে, যখন কোনো ব্যাংকের কাছে কিছু নোট আসে তখন ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বের করে বাকি টাকা লোকদের ঋণ দিয়ে দেবে। যে ঋণ নিল সে হয়ত নগদ নেবেই না; বরং একাউন্ট খুলে চেক বই নিয়ে নেবে। অথবা নিয়ে পুনরায় সে ব্যাংকেই জমা রেখে দেবে। এর দ্বারা যত টাকার অতিরিক্ত একাউন্ট খোলা হল মুদ্রা তত বৃদ্ধি পেল। অথচ নোট ততই আছে যত রাখা হয়েছিল। তারপর ঋণগ্রহীতার একাউন্ট খোলায় যে নতুন ডিপোজিট ব্যাংকের কাছে আসল তা থেকেও রিজার্ভ বের করে বাকি টাকা ব্যাংক ঋণ প্রদান করবে। যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করবে সে আবার ব্যাংকে রেখে দেবে। এতে মুদ্রা আরো বৃদ্ধি পাবে। এভাবে মুদ্রা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। তাকে মুদ্রার উপযোগ (ঋণ আমানত) সৃষ্টি বলে।

যেমন কোনো ব্যাংকে কোনো ব্যক্তি একশ টাকা রাখল। ব্যাংক তার শতকরা বিশ ভাগ অর্থাৎ বিশ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়ে বাকি আশি টাকা কাউকে ঋণ দিয়েছে। সে এ আশি টাকা পুনরায় ওই ব্যাংকেই রেখে দিল। এখন ব্যাংকের নিকট মোট একশ আশি টাকা ডিপোজিট হল। তার বিশ শতাংশ অর্থাৎ ছত্রিশ টাকা (যার বিশ টাকা আগেই দিয়ে ফেলেছে, তাই অতিরিক্ত ষোল টাকা) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়ে বাকি চৌষট্টি টাকা আবার কাউকে ঋণ প্রদান করল। আর সেও এ টাকা উক্ত ব্যাংকেই রেখে দিল। এখন ব্যাংকের ডিপোজিটে চৌষট্টি টাকা বৃদ্ধি পেল। আর ব্যাংকের কাছে ২৪৪ টাকার ডিপোজিট জমা হল। এ টাকার বিশ ভাগ অর্থাৎ ৪৮.৮০ টাকা (যার মধ্যে ছত্রিশ টাকা পূর্বেই দিয়েছে, আর অতিরিক্ত ১২.৮০ টাকা) কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দিয়ে বাকি ৫১.২০ টাকা আবার ঋণ প্রদান করল এবং সে ব্যক্তি পুনরায় সে ব্যাংকে জমা রেখে দিল। এভাবে

www.pathagar.com

ব্যাংকের কাছে ২৯৫.২০ টাকার ডিপোজিট জমা হয়ে গেল। এভাবে ব্যাংক আরো ঋণ প্রদান করতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে টাকা শেষ হয়ে যায়। এ উদাহরণে ব্যাংকের কাছে ছিল মাত্র একশ টাকা, কিন্তু তা থেকে ২৯৫ টাকার ফায়দা উঠানো হচ্ছে। প্রত্যেক ডিপোজিট হোল্ডার তার নিজের ডিপোজিটের ভিত্তিতে চেক ইস্যু করতে পারে। তাহলে ২৯৫ টাকার চেক ইস্যু হতে পারে। অথচ আসলে ছিল মাত্র একশ টাকা। অতিরিক্ত ১৯৫ টাকা ব্যাংকের সৃষ্টিকৃত এবং ব্যাংকের এ কাজ মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টি করা। এ উদাহরণে এক ব্যাংক মনে করে বলা হয়েছে, ঋণগ্রহীতা সে ব্যাংকেই আবার টাকা রেখে দেবে, কিন্তু কার্যত এমনও হয়, সে ঐ ব্যাংকে না রেখে অন্য ব্যাংকে টাকা রাখে। ফলে অন্য ব্যাংকের ডিপোজিট বেড়ে যাবে। মোট কথা, ব্যাংক থেকে গৃহীত সকল ঋণের পরিণামে কোনো না কোনো ব্যাংকের ডিপোজিট বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় সব ব্যাংকের সমষ্টি মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টির কাজ করবে।[১]

ব্যাংকের মুদ্রা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আরো একটি বস্তুর অনেক বড় অবদান রয়েছে, যাকে পরিভাষায় ফ্লোট (Float) বলে। ব্যাংকের কাছে ডিপোজিট হিসেবে যে টাকা থাকে তার উপর ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। এ

---

১.

| দায় | | | সম্পত্তি | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বিবরণ | | টাকা | বিবরণ | | টাকা |
| **আমানতসমূহ** | | | **সম্পত্তিসমূহ** | | |
| জনাব হারুন | ১০০.০০ | | নগদ জমা ২০% | | |
| " বশীর - | ৮০.০০ | | ২০+ ১৬+ ১২.৮০+ ১০.২৪ | | |
| " আমিন- | ৬৪.০০ | | | | ৫৯.০৪ |
| " মুরাদ- | ৫১.২০ | | **প্রদত্ত ঋণ** | | |
| | | | জনাব বশীর- | ৮০.০০ | |
| | | ২৯৫.২০ | " আমিন- | ৬৪.০০ | |
| | | | " মুরাদ- | ৫১.২০ | |
| | | | " মামুন- | ৪০.৯৬ | |
| | | | | | ২৩৬.১৬ |
| | | ২৯৫.২০ | | | ২৯৫.২০ |

ব্যাংক ১০০ টাকার প্রাথমিক আমানত থেকে মোট ২৩৬.১৬ টাকা ঋণ দিয়েছে এবং ২৯৫.২০ টাকার আমানত সৃষ্টি করেছে। ব্যাংক ১৯৫.২০ টাকা অতিরিক্ত আমানত সৃষ্টি করেছে এবং ১৩৬.১৬ টাকা অতিরিক্ত ঋণ দিয়েছে। এ টাকা ব্যাংকের সৃষ্টি।

www.pathagar.com

সুদ ঐ ডিপোজিটের ব্যয় (Cost)। অর্থাৎ এ সুদ দিয়ে ব্যাংক এ ডিপোজিট লাভ করেছে, কিন্তু কখনো টাকা কিছু সময়ের জন্য থাকলে তা ব্যাংকের কাছেই থাকে। সে সময়ের মধ্যে এটা ব্যাংকের ডিপোজিট হিসেবে গণ্য হয় না। এর উপর ব্যাংককে সুদও দিতে হয় না। এটা এমন অর্থ যার উপর ব্যাংকের কোনো মূল্যই আদায় করতে হয় না। কয়েকটি অবস্থায় এরূপ হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যাংকের পক্ষ থেকে অন্য ব্যাংকের প্রতি চেক ইস্যু করা হয়েছে। তখন সে ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে টাকা যেতে কিছু সময় লেগে যায়। সে সময় এ টাকা ব্যাংকের ফ্লোট মানি। এর একটি প্রক্রিয়া হল, ব্যাংক কাউকে ড্রাফট প্রদান করল। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ড্রাফট ক্যাশ না করানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ টাকা ব্যাংকের কাছে ফ্লোট হিসেবে থাকবে। একটি প্রক্রিয়া এও হতে পারে, ব্যাংক এল সি খোলে আর এল সি গ্রাহক টাকা সাথে সাথে পরিশোধ করে দেয়, কিন্তু ব্যাংক এ টাকা তখনি পরিশোধ করে যখন কাগজপত্র তার হাতে আসে। তত দিন পর্যন্ত কোনো ব্যয় ছাড়া এ টাকা ব্যাংকের কাছে পড়ে থাকে। তেমনিভাবে রেলওয়ে বিলের মধ্যে এরূপ হয় যে, কাগজপত্র ব্যাংকে আসে। ব্যাংকে দেনা পরিশোধ করে কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়, আর কাগজপত্র সংগ্রহ করে মাল ছাড়ানো হয়। কাগজপত্র ব্যাংক থেকে উত্তোলনের সময় বিল তো পরিশোধ করে দেয়া হয়, কিন্তু মাল প্রেরণকারীর এ টাকা পেতে বিলম্ব হয়। এটাও ব্যাংকের ফ্লোট। হজ্বের দরখাস্তকারীদের ব্যাপারও তাই। এছাড়া ফ্লোটের আরো প্রক্রিয়া হতে পারে। ফ্লোটের মাধ্যমে ব্যাংক প্রচুর মূলধন লাভ করে থাকে।

আরো একটি কথা মনে পড়ে গেল। দৃশ্যত মনে হয়, ব্যাংক ডিপোজিটরদের (আমানতকারী) যে সুদ প্রদান করে, ব্যাংকের ব্যয়ও তাই হবে। যেমন আট শতাংশ সুদ দিলে ব্যাংকের ব্যয়ও আট শতাংশ হবে, কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়। ব্যাংক যে পরিমাণ সুদ প্রদান করে তার প্রকৃত ব্যয় এর চেয়ে কম হয়। কারণ, ব্যাংকের কাছে অনেক টাকা এমনও থাকে যার উপর সে সুদ প্রদান করে না, কিন্তু তা থেকে মুনাফা উপার্জন করে। এরূপ অর্থ এক তো আছে ফ্লোটের টাকা। দ্বিতীয় হল কারেন্ট একাউন্টের টাকা। এর দ্বারা বুঝা গেল, ব্যাংকের যে লাভ হয় তার আট শতাংশেরও কম জনগণ পায়। সুতরাং ব্যাংকের মুনাফার গতি জনসাধারণের দিকে কম এবং পুঁজিপতিদের দিকে বেশি।

www.pathagar.com

# কেন্দ্রীয় ব্যাংক
# (Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান। যে সব বাণিজ্যিক ব্যাংকের (Commercial Banks) তদারকি করে, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন তার কার্যাবলীর বিবরণ দ্বারা বুঝা যাবে। এ প্রতিষ্ঠানকে বাংলায় 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক', আরবিতে ' البنك الرئيس বা 'المصرف الرئيسى' এবং ইংরেজিতে Central Bank বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন পকিস্তানে 'এস্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ইংল্যান্ডে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া', বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

## কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) অনেক কাজ সম্পাদন করে থাকে। এখানে তা আলোচনা করা হল :

১. এটা একটা সরকারি ব্যাংক। সরকারের অর্থ এতে রাখা হয়, কিন্তু এ ব্যাংক সরকারের টাকার কোনো সুদ প্রদান করে না। প্রয়োজনের মুহূর্তে সরকারকে ঋণ প্রদান করে এবং তার থেকে সামান্য হারে সুদও নেয়।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও মজুদ করে এবং প্রয়োজনের সময় তা চালুও করে।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দুটি। এক হল, সে সকল বণিজ্যিক ব্যাংকের (Commercial Banks) দেখাশুনা করে এবং তাদের নীতিও নিয়ন্ত্রণ করে। যাতে তার থেকে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ হয় এবং ক্ষতিকর পথ বন্ধ হয়।

এ উদ্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন–
১. কোনো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পূর্বে তাকে অনুমোদন দেয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে অনুমোদন ছাড়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে

www.pathagar.com

পারে না। আর অনুমোদন প্রদানের আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

২. অর্থনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় যেখানে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজন বেশি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের গতি সেদিকে ফিরিয়ে দেয়। যেমন কোনো বিশেষ অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজন। অথবা কোনো বিশেষ বিভাগে (যেমন কৃষি, বাণিজ্য বা শিল্প ইত্যাদি) পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সে অঞ্চলে বা বিভাগে অধিক হারে ঋণ প্রদানের জন্য বাধ্য-বাধকতা আরোপ করে।

৩. যে সব লোক (Depositers) ব্যাংকে তাদের অর্থ আমানত রেখেছে, তাদের অর্থ সংরক্ষণ করার জন্য আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। যেমন জনগণের আমানতের টাকার এত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং এত অংশ ব্যাংক তার নিজের কাছে সংরক্ষিত রাখবে ইত্যাদি।

৪. আর্থিকভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সামগ্রিক অবস্থা সুদৃঢ় রাখার এবং তার নিজের দেনা পরিশোধের যোগ্যতা বজায় রাখার প্রতি দৃষ্টি রাখে।

৫. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পারস্পরিক লেনদেনের নিষ্পত্তিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে। এ উদ্দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি বিভাগ থাকে। একে আরবিতে 'غرفة المقاصة' ইংরেজিতে Clearing House এবং বাংলায় 'নিকাশ ঘর' বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে যে লেনদেন হয়, পরস্পরের উপর চেক বা ড্রাফট ইস্যু হয়, তা প্রতিদিন নিকাশ ঘরে হিসাব করা হয়।

৬. বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রয়োজনের মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণও দেয়। যখন কোনো ব্যাংকের কাছে টাকা উত্তোলনের জন্য এত বেশি পরিমাণে চাহিদা হয় যে, তাতে তার তরল অর্থ দ্বারা তার সংকুলান হয় না, তখন ব্যাংকের কাছে সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হল কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে 'ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল' (Lender of the last Resort) বলে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে, এ ব্যাংক দেশের মধ্যে মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। যদি দেশে মুদ্রাস্ফীতি

www.pathagar.com

বেড়ে যায় তাহলে এমন পন্থা অবলম্বন করে যাতে মুদ্রা সংকুচিত হতে শুরু করে। আর মুদ্রা সংকোচনের অবস্থা হলে এমন কাজ করে যাতে মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। মুদ্রার প্রবাহ সম্প্রসারণ ও সংকোচনের কয়েকটি পন্থা হতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে যে সুদের হারে ঋণ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হার (Bank Rate) এবং আরবিতে 'سعر البنك' বলে। একে ইংরেজিতে Official Rate এবং আরবিতে 'السعر الرسمى'ও বলে। এ ব্যাংক হারও মুদ্রার প্রবাহের উপর প্রভাব ফেলে। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার (ব্যাংক রেট) বাড়িয়ে দেবে তখন বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্ধিত সুদে ঋণ পাবে। সুতরাং সেও জনসাধারণকে অধিক সুদের উপর ঋণ দেবে। ফলে মানুষ ঋণ কম গ্রহণ করবে। যখন মানুষ কম ঋণ নেবে তখন ব্যাংকের ঋণ আমানত সৃষ্টির কাজ কমে যাবে এবং মুদ্রার আবর্তনও কমে যাবে। এর বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমালে বাণিজ্যিক ব্যাংকও কমাবে। ফলে মানুষ ঋণ বেশি নেবে এবং ঋণ আমানত সৃষ্টির কাজ বেশি হয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

## ট্রেজারি বিল

দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকে খোলা বাজার নীতি (Open Market Operation) এবং আরবিতে 'عمليات السوق المفتوحة' বলে। এ প্রক্রিয়া বুঝার আগে ট্রেজারি বিল কি তা বুঝা জরুরি। সরকারের যখন টাকার প্রয়োজন হয় তখন টাকা সংগ্রহের জন্য সরকার বিভিন্ন দলিল বা সনদ জারি করে, যাকে 'সরকারি ঋণপত্র' বলে। এর আলোচনা আগেই করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অর্থ সংগ্রহ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি বিল জারি করে। যাকে ইংরেজিতে ট্রেজারি বিল (Treasury Bill) এবং আরবিতে 'سندات الخزينة' বলে। এক বিলের অভিহিত মূল্য (Face Value) 'قيمة اسمية' একশ টাকা হয়।

এ বিল নির্দিষ্ট সময়, সাধারণত ছয় মাসের জন্য জারি করা হয়। এ বিল নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয় এবং শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকই এর প্রাথমিক ক্রেতা। সাধারণ মানুষ কখনো ব্যাংক থেকে ক্রয় করে থাকে। নিলামের পদ্ধতি হল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঘোষণা করে, এত টাকার (যেমন দশ

www.pathagar.com

কোটি টাকার) ট্রেজারি বিল জারি করা হচ্ছে। তখন বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজ নিজ চাহিদা জানায়। প্রত্যেক ব্যাংক বলে, আমি এত টাকায় এত বিল ক্রয় করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে এর রেট তের বা চৌদ্দ শতাংশ।[১] অর্থাৎ একশ টাকার বিল সাধারণত ৮৬ বা ৮৭ টাকায় বিক্রি হয়। যে ব্যাংকের ডাক গৃহীত হয় তাকে তার চাহিদা অনুযায়ী বিল দিয়ে তার থেকে টাকা আদায় করা হয়। এখন যে ব্যাংক এ বিল ৮৬ টাকায় ক্রয় করল সে ছয় মাস পর তার পুরো একশ টাকা আদায় করবে এবং চৌদ্দ টাকা হবে তার সুদ বা মুনাফা। এ বিলের মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অথবা শেয়ার বাজারে (Stock Exchange) হুন্ডির ন্যায় এ বিলের ডিসকাউন্টিংও (বাট্টাকরণ) হয়ে থাকে।

'খোলা বাজার নীতি' অর্থ হচ্ছে, মুদ্রার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ না করে নিজেই ট্রেজারি বিল ক্রয় বা বিক্রয় করার জন্য খোলা বাজারে এসে মুদ্রার যোগান ও তার প্রবাহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যখন মুদ্রার প্রবাহ কম করার প্রয়োজন হবে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারি বিল অল্প মূল্যে বিক্রয় করার আগ্রহ প্রকাশ করে। যার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মূলধন দিয়ে বিল ক্রয় করতে থাকে এবং ব্যাংকের মুদ্রা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ফিরে যেতে আরম্ভ করে। ব্যাংকের কাছে মূলধন কমে যায় এবং ঋণ সরবরাহ কমে গিয়ে মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টির কাজও কমে যায়। এর বিপরীতে যদি মুদ্রার প্রবাহ বাড়াতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ট্রেজারি বিল অধিক মূল্যে ক্রয় করার জন্য খোলা বাজারে এসে পড়ে। মানুষ বিল বিক্রি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে নেয়। ফলে মুদ্রার প্রবাহ বেড়ে যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষিত জমার হার হ্রাস বৃদ্ধি করেও মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। রিজার্ভ কম হলে ব্যাংক অধিক পরিমাণে ঋণ সরবরাহ করার সুযোগ পায় এবং মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টির কাজ বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ বেশি হলে ব্যাংক ঋণ সরবরাহ কম করে। ফলে মুদ্রার উপযোগ সৃষ্টির কাজও কমে যায়। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার প্রবাহ বাড়ানোর জন্য

---

[১]. এটা পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার। আমাদের দেশের ট্রেজারি বিলের হার হচ্ছে,

www.pathagar.com

রিজার্ভ কমিয়ে দেয় এবং মুদ্রার প্রবাহ কমানোর জন্য রিজার্ভ বাড়িয়ে দেয়।[১]

সুদের হার হ্রাস বৃদ্ধি করেও মুদ্রার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুদের হার বৃদ্ধি করার বাধ্য-বাধকতা আরোপ করলে মানুষ ঋণ কম নেবে এবং মুদ্রার প্রবাহ কম হবে। আর সুদের হার কমানোর শর্তারোপ করলে মানুষ বেশি ঋণ নেবে এবং মুদ্রার প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।[২]

ঋণ জারি করার সীমাবদ্ধতা বা বিভিন্ন বিভাগের কোটা নির্দিষ্ট করেও মুদ্রার প্রবাহ কমানো যায়। যেমন আদেশ জারি করা হল, ব্যাংক তার আমানতের মাত্র চল্লিশ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদান করতে পারবে। অথবা ব্যাংক তার আমানতের পঁচিশ ভাগ অমুক বিভাগে ঋণ প্রদান করবে। এ বিধি-নিষেধের কারণে ব্যাংক ঋণ কম জারি করতে পারবে এবং মুদ্রার প্রবাহ কমে যাবে।[৩]

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ছাপিয়েও মুদ্রার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলীর মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত, সে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের জন্য এমন নীতিমালা নির্ধারণ করে যাতে জনগণেরও কোনো ক্ষতি না হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বা ব্যাংকের নিজস্ব আর্থিক অবস্থায় কোনো দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (যার আলোচনা সামনে আসছে) দেখাশুনা করার অধিকারও দেয়া হয়েছে।

---

১. একে বাংলায় জমার হার পরিবর্তন নীতি, ইংরেজিতে Reserve Rate Variation Policy বলে।

২. একে বাংলায় ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি এবং ইংরেজিতে Rationing of Credit Policy বলে।

৩. একে বাংলায় সুদের হার নীতি এবং ইংরেজিতে Profit Rate Policy বলা হয়।

www.pathagar.com

# অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান

## (Non-Banking Financial Institutions)

কিছু প্রতিষ্ঠান এতটুকু ক্ষেত্রে ব্যাংকের মতই যে, তারা মানুষ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা দ্বারা পুঁজি বিনিয়োগ করে, কিন্তু ব্যাংকের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করে না। যেমন তাতে ব্যাংকের ন্যায় কারেন্ট একাউন্ট বা সেভিং একাউন্ট থাকে না। শুধু ফিক্সড ডিপোজিট থাকে। এ প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের ন্যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও মাধ্যম হয় না। এরূপ প্রতিষ্ঠানকে আরবিতে 'المؤسسات المالية (غير المصرفية)' এবং ইংরেজিতে নন ব্যাংকিং ফাইন্যানসিয়াল ইনস্টিটিউশন (Non-Banking Financial Institutions) বলে।[৪] এরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। নিম্নে তা ব্যাখ্যা করা হল :

**১. উন্নয়ন ঋণদান সংস্থা (Development Financial Institutions)** : যাকে সংক্ষেপে (D.F.I) বলে। এ প্রতিষ্ঠান দেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য পুঁজি সরবরাহ করে। প্রথমে এ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা এ প্রতিষ্ঠানে সাহায্য পাঠাত এবং এ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন পরিকল্পনায় পুঁজি বিনিয়োগ করত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বিভিন্ন উদ্দেশে তাকে পুঁজি সরবরাহ করে থাকে। এ ধরনের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে রয়েছে। যেমন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স করপোরেশন (N.D.F.C), ইন্টরন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (I.D.B.P), পাকিস্তান ইন্ডাসট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন (P.I.C.I.C), ব্যাংকারস ইকুইটি, পাক সাউদিয়া, পাক কুয়েত, পাক লিবিয়া ইত্যাদি।

---

[৪]. বাংলাদেশে একে ব্যাংক বহির্ভূত ঋণদান প্রতিষ্ঠান বা বিশেষায়িত ঋণদান প্রতিষ্ঠান বলে। যেমন, বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা (Bangladesh Shilpa Rin Sangstha), বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (Bangladesh Shilpa Bank), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা (Bangladesh Small Industries Corporation), বাংলাদেশ পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (Investment Corporation of Bangladesh, গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা (House Building Finance Corporation) ইত্যাদি।

www.pathagar.com

**২. এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান (A.D.B.P) :** এ বিভাগ কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য পুঁজি সরবরাহ করে। বিশ্ব সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাকে পুঁজি দেয় এবং সে তা বিনিয়োগ করে।

**৩. সমবায় সমিতি (Co-operative Society) :** একে আরবিতে 'جمعية تعاونية' বলে। এ প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা তার মেম্বর হয় শুধু তাদেরই ঋণ প্রদান করে।

**৪. লিজিং কোম্পানি :** এ সব কোম্পানি ভাড়া পদ্ধতিতে পুঁজি সরবরাহ করে। যার বিবরণ সামনের অধ্যায়ে আসছে। আগে লিজিং কোম্পানিগুলোর জনসাধারণ থেকে মূলধন সংগ্রহের অনুমতি ছিল না। শুধু ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট লিজিং কোম্পানির (N.D.L.C) অনুমতি ছিল। এখন সকল লিজিং কোম্পানিকে জনসাধারণ থেকে পুঁজি সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে, এক মাসের ঊর্ধ্বে ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট জারি করতে হবে।

**৫. ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (N.I.T) :** কিছু দেশে 'ইউনিট ট্রাস্ট'-এর ধারণা বিদ্যমান আছে। সেটা হল, একটা ফান্ড তৈরি করা হয়। মানুষের থেকে এর মূলধন সংগ্রহ করা হয়। তারপর এ ফান্ডের অর্থ দ্বারা সরাসরি ব্যবসা করার পরিবর্তে তা বিভিন্ন লাভজনক কাজে লাগানো হয়। তা থেকে সামগ্রিকভাবে যে লভ্যাংশ আসে তা মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। এন আই টিও এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা এ ধরনের ফান্ডের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। ফান্ডের ইউনিট বানানো হয়। ইউনিট বিক্রি করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা দ্বারা অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। সাধারণত শেয়ারে এর অর্থ বিনিয়োগ হয়ে থাকে। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার নিয়ে মুনাফা অর্জন করা হয়। কোনো কোম্পানির শেয়ার জারি হলে এন আই টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, সে ইচ্ছা করলে বিশ ভাগ পর্যন্ত শেয়ার নিতে পারবে।

**৬. ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান (I.C.P) :** এ প্রতিষ্ঠান কয়েকটি কাজ করে থাকে। এক. এন আই টি-

www.pathagar.com

এর ন্যায় একটি ফান্ড চালু করে। একে 'আই সি পি মিউচুয়াল ফান্ড' বলে। মানুষ এ ফান্ডে অর্থ বিনিয়োগ করে। এন আই টি-এর মতো এ অর্থ বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়। এন আই টি এবং আই সি পি-এর ফান্ডের মধ্যে পার্থক্য হল, এন আই টি-এর ইউনিট ক্রয় করে যখন ইচ্ছা এন আই টি-এর কাছেই আবার তা বিক্রি করা যায়, কিন্তু আই সি পি-এর শেয়ার নিয়ে আই সি পি-এর কাছে দ্বিতীয় বার বিক্রি করা যায় না। তবে কোম্পানির শেয়ারের মতো অন্য কারো কাছে বিক্রি করা যায়।

আই সি পি-এর দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, যেসব লোক বিদেশে থাকে তারা আই সি পি-তে নিজের নামে একাউন্ট খোলে। এ ধরনের একাউন্ট এমন, যে ক্ষেত্রে আই সি পি-এর এখতিয়ার থাকে, সে যেকোনো শেয়ার ক্রয় করে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। আরেকটা একাউন্ট আছে যেখানে আই সি পি-এর এ ধরনের এখতিয়ার থাকে না; বরং যার একাউন্ট সে নিজে বলে, অমুক কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা যাবে।

আই সি পি-এর তৃতীয় কাজ হচ্ছে, কারো অধিক ঋণের প্রয়োজন হলে এ প্রতিষ্ঠান কয়েক ব্যাংককে একত্রে মিলিয়ে সমষ্টিগতভাবে ঋণের ব্যবস্থা করে।[১]

---

[১]. এ প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানভিত্তিক। বাংলাদেশের বিশেষায়িত ঋণদান সংস্থাগুলো নিম্নরূপ–

**ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক :** পাকিস্তান আমলের 'এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তান' স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নামে কার্যক্রম শুরু করে। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি এ ব্যাংকের একমাত্র লক্ষ্য। কৃষি ব্যাংক সাধারণত কৃষকদের জমি বন্ধক রেখে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ প্রদান করে। এর যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয় সরাসরি সুদের ভিত্তিতে।

**খ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক :** সাবেক 'পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক ও ইকুইটি পার্টিচিপেশন ফান্ডকে ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক' এ রূপান্তরিত করা হয়। দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানই এর প্রধান লক্ষ্য। এ ব্যাংক নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরাতন শিল্প আধুনিকীকরণের জন্য সরকারি বেসরকারি উভয় খাতে শিল্পঋণ প্রদান করে থাকে। এর কার্যক্রম সব সুদ ভিত্তিক।

**গ. বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা :** স্বাধীনতার পর পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন (P.I.C.I.C), ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান (I.C.P), ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট (N.I.T) প্রভৃতি সংস্থার বাংলাদেশে অবস্থিত সব সম্পদ ও দায় নিয়ে 'বাংলাদেশ শিল্পঋণ সংস্থা' গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে শিল্প ক্ষেত্রে ঋণদানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করাই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাংকের কার্যক্রমও সুদ ভিত্তিক।

**ঘ. গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা** (House Building Finance Corporation) : সাবেক পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থাটি স্বাধীনতার পর 'গৃহ নির্মাণ ঋণদান সংস্থা' নামে পুনর্গঠিত হয়। এ সংস্থা দেশের বড় বড় শহর নগর, উপজেলা সদর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আবাসিক

www.pathagar.com

# সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা

পেছনের আলোচনায় ব্যাংকিংয়ের প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে, বর্তমান ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে সুদ। এখন প্রশ্ন হল, সুদ বন্ধ করা হলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার বিকল্প পন্থা কী হবে? এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত যে প্রস্তাবনাগুলো সামনে এসেছে, নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করার আগে কিছু মৌলিক বিষয় জেনে নেয়া জরুরি।

১. সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য এমন হওয়া উচিৎ নয় যে, প্রচলিত ব্যাংক যত কাজ যে প্রক্রিয়ায় করে চলেছে তার সব কাজ কমবেশি সে প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করতে হবে এবং তার উদ্দেশে কোনো পার্থক্য হতে পারবে না। কেননা, এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়ে আসছে যদি তাই করতে হয়, তাহলে 'বিকল্প ব্যবস্থার' কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না।

বরং 'বিকল্প'-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান বাণিজ্যিক পরিবেশে ব্যাংকের জন্য যে কাজ জরুরি বা উপকারী, তা সম্পাদন করার জন্য এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা যা শরীয়তের মূলনীতির গণ্ডির মধ্যে থাকে, যা দ্বারা শরীয়তের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। আর যে কাজ শরয়ী মূলনীতির আলোকে জরুরি বা উপকারী নয় এবং যাকে শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী সাজানো যায় না, তা থেকে দূরে থাকা।

২. যেহেতু সম্পদ বণ্টনের পুরো ব্যবস্থার উপর সুদ নিষিদ্ধের প্রভাব পড়ে, তাই এ আশা করাও ভুল যে, সুদের শরয়ী বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর করলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের লাভের হার তাই থাকবে যা এখন সুদী ব্যবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে; বরং বাস্তব হল, যদি ইসলামী বিধান সঠিকভাবে কার্যকর করা হয় তাহলে এ অনুপাতের মধ্যে বড় ধরনের মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে; বরং এ পরিবর্তন একটি দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী

---

বাড়ি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। এ সংস্থা এক ইউনিটবিশিষ্ট বাড়ি ও বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে সুদের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে। অবস্থানভেদে উভয় প্রকার ঋণের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও মেয়াদ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অর্থনীতির জন্য অপরিহার্যভাবে কাম্য।

৩. বর্তমানে ব্যাংক যে সেবা প্রদান করে তন্মধ্যে এ বিষয়টা উপকারী; বরং বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে জরুরি, সে মানুষের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে একত্র করে তা শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার মাধ্যম হয়। এ সঞ্চয় যদি মানুষের পকেটে পড়ে থাকত তাহলে তা দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণে কোনো ফায়দা পাওয়া যেত না। বলাবাহুল্য, সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ অলস পড়ে থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতেও কাম্য নয় এবং অর্থনৈতিকভাবেও তাকে কল্যাণকর বলা যায় না।

কিন্তু এ সঞ্চয়কে শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার জন্য যে পন্থা প্রচলিত ব্যাংক অবলম্বন করেছে, তা ঋণের পন্থা। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠান পুঁজিপতিদের উৎসাহিত করে, সে অন্যের আর্থিক উপকরণগুলো নিজের লাভের জন্য এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে ঐ উপকরণ থেকে উৎপাদিত সম্পদের বেশিরভাগ অংশ তার নিজের কাছেই জমা থাকে এবং পুঁজির আসল মালিকরা উপরে উঠার যথাযথ সুযোগ না পায়।

সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংক হল শুধু এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা টাকার লেনদেন করে। এ টাকা দ্বারা যে কারবার হচ্ছে তার লাভ কত আর এর দ্বারা কার উপকার হচ্ছে আর কার ক্ষতি হচ্ছে- এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইসলামী বিধানের আলোকে ব্যাংক এমন প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবশিষ্ট থাকতে পারে না যার কাজ শুধু অর্থের লেনদেন করা। তার পরিবর্তে তাকে এমন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানাতে হবে, যে বিভিন্ন মানুষের সঞ্চয় একত্র করে তা সরাসরি ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। আর যেসব লোকের সঞ্চয় সে জমা করবে তারা সবাই সরাসরি সে ব্যবসার অংশীদার হবে। তাদের লাভ ক্ষতি সে ব্যবসার লাভ ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে, যা তাদের পুঁজি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং সুদী ব্যাংকিংয়ের বিকল্প যে ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হবে তার উপর এ আপত্তি করা উচিৎ নয় যে, ব্যাংক তার পূর্বের অবস্থান শেষ করে দিয়ে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেননা, যার কারণে বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা হচ্ছে সে প্রয়োজন এ ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না।

৪. চতুর্থ কথা হল, শত শত বছর ধরে জেঁকে বসা কোনো ব্যবস্থ

www.pathagar.com

পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে সর্বদা সমস্যা একটু হবেই, কিন্তু ব্যবস্থার পরিবর্তন যদি জরুরি হয় তাহলে শুধু এ সমস্যার উপর ভিত্তি করে নতুন ব্যবস্থা অগ্রহণযোগ্য বলে স্থির করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। এ অবস্থায় সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হয়। সমস্যার ভয়ে পিছপা হওয়া যায় না।

# ব্যাংকিংয়ের শরীয়তসম্মত পন্থা

এ ভূমিকার পর ব্যাংকিংকে শরীয়তসম্মত মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালনার জন্য উপস্থাপনকৃত প্রস্তাবগুলো পেশ করা হচ্ছে। প্রথমে বুঝতে হবে, ব্যাংকের সম্পর্ক হয় দুতরফা। একদিকে তার সম্পর্ক সেসব লোকের সাথে যারা তাদের টাকা ব্যাংকে আমানত রাখে। অন্যদিকে সেসব লোকের সাথে সম্পর্ক হয় যাদের কাছে ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে, অর্থাৎ মূলধন সরবরাহ করে। উভয় ধরনের সম্পর্কের উপর ভিন্নভাবে আলোকপাত করা হল।

## ব্যাংক ও ডিপোজিটরের সম্পর্ক

বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যাংকে যে টাকা রাখা হয় তাকে আজকাল ব্যাংকিংয়ের পরিভাষায় 'আমানত' বলে, কিন্তু ফিকাহের দৃষ্টিতে তা প্রকৃতপক্ষে ঋণ। যদি ব্যাংককে ইসলামী পদ্ধতিতে চালানো হয় তাহলে আমানতকারীদের সাথে ব্যাংক শিরকাত বা মুদারাবা পদ্ধতিতে লেনদেন করবে। এ পদ্ধতিতে এ টাকা ঋণ হবে না; বরং তখন অবস্থাটা হবে এমন, টাকা আমানতকারী হবে 'রাব্বুল মাল' (পুঁজির মালিক), ব্যাংক হবে 'মুদারিব' (ব্যবসায়ী), আর আমানতকৃত অর্থ হবে 'রা'সুল মাল' (বিনিয়োগকৃত মূলধন), যার উপর ব্যাংক নির্দিষ্ট কোনো হারে লাভ দিতে বাধ্য থাকবে না; বরং যা লাভ হবে তা একটি ধার্যকৃত অনুপাতে বণ্টিত হবে।

তারপর ব্যাংক কারেন্ট একাউন্টে আজও ডিপোজিটরদের কোনো সুদ প্রদান করে না। ইসলামী পদ্ধতিতেও এ হিসাবের উপর কোনো মুনাফা দেয়া হবে না। কারেন্ট একাউন্টে জমাকৃত টাকা ডিপোজিটরদের পক্ষ

www.pathagar.com

থেকে ব্যাংককে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ মনে করা হবে। তবে অন্যান্য লাভজনক হিসাব মুদারাবা বা শিরকাতের হিসাবে গণ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু ঐ হিসাবগুলোকে মুদারাবা বা শিরকাতে পরিবর্তন করতে একটা প্রায়োগিক সমস্যা মনে হয় যে, শিরকাতের সাধারণ নিয়ম হল সব হিসাবধারীর টাকা একসাথে সম্মিলিত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। একই সময়ে লাভ লোকসান হিসাব করে সব অংশীদারদের মধ্যে লাভ লোকসান বণ্টন করা হয়, কিন্তু ব্যাংকের বেলায় তা কার্যকর করা সম্ভব নয়। কেননা, এখানে মানুষের অর্থ জমা করা এবং উত্তোলন করার ধারাবাহিকতা লাগাতার জারি থাকে। ফিক্সড ডিপোজিটের বেলায় যদিও উঠানোর মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু জমা রাখার সময় নির্দিষ্ট থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতিদিন ফিক্সড ডিপোজিটের হিসাব চালু করতে পারে। আর সেভিং একাউন্টে টাকা উঠানোর এবং জমা রাখার কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই।

এর একটা সমাধান এমন, এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং মানুষকে বাধ্য করা যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট তারিখে টাকা জমা করবে এবং নির্দিষ্ট তারিখেই তা উত্তোলন করবে। আর শিরকাতের মেয়াদ ত্রৈমাসিক বা মাসিক নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রত্যেক মেয়াদান্তে লাভ লোকসান হিসাব করে তা বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় প্রথমত মানুষের জন্য ব্যাংকে অর্থ রাখার ব্যাপারে ঝামেলা হবে। একই তারিখে জমা রাখা এবং একই তারিখে উঠানোর বেলায় ব্যাংকের উপর চাপও বৃদ্ধি পাবে। ফলে অনেক সঞ্চয় কাজে লাগা থেকে বাদ পড়বে।

সুতরাং ব্যাংকের শিরকাত ও মুদারাবার লভ্যাংশ বণ্টনের আরো একটা পদ্ধতি কোনো কোনো মহলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছে। একে একাউন্টিং-এর পরিভাষায় Daily Product Basis, 'الحساب اليومى' বা দৈনন্দিন হিসাব বলে। এ প্রস্তাবের সারকথা হল, অংশীদারদের এ স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে, তারা যখন ইচ্ছা বিশেষ বিধান মোতাবেক ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করতে বা জমা করতে থাকবে, কিন্তু যখন এক শিরকাতের মেয়াদ শেষ হবে তখন দেখা হবে, এ মেয়াদে কত টাকা কত দিন ব্যাংকে থাকল। আর প্রতি টাকায় প্রতিদিনে লভ্যাংশের গড় কত। তারপর যে ব্যক্তির যত টাকা এ মেয়াদের মধ্যে যত দিন ব্যাংকে থাকল, তার হিসাব অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে।

www.pathagar.com

শরয়ী মূলনীতির আলোকে এর উপর আপত্তি উঠতে পারে, এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশের বণ্টন হয় আনুষ্ঠানিকতার উপর। এতে কারো প্রকৃত লাভের কিছু অংশ অন্যের মধ্যে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন ছয় মাস পর লভ্যাংশ বণ্টন করা হল। এ ছয় মাসের প্রথম তিন মাসে লাভ বেশি হয়েছে, আর শেষ তিন মাসে লাভ কম হয়েছে। এ ছয় মাসের মেয়াদে যায়েদের টাকা ছয় মাস ব্যাংকে থেকেছে, আর উমরের টাকা শেষ তিন মাস থেকেছে। লভ্যাংশ প্রতিদিন সমান হারে পেলে এ অবস্থায় যায়েদের প্রকৃত লভ্যাংশের কিছু অংশ উমরের মধ্যে চলে আসবে। নিঃসন্দেহে লভ্যাংশ বণ্টনের উল্লিখিত পন্থায় এ আপত্তি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তার উত্তর এটা হতে পারে, শিরকাতের মধ্যে অংশীদারদের মাল যৌথভাবে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। সুতরাং লভ্যাংশ বণ্টন করার সময় এটা দেখা হয় না, প্রত্যেকের মূলধন থেকে প্রকৃত মুনাফা কি হয়েছে; বরং সম্মিলিত মোট মূলধন থেকে যে মোট লাভ হয় সেটা বণ্টিত হয়। অথচ এমন সম্ভাবনা রয়েছে, একজনের মূলধন থেকে লাভ হয়েছে আর অন্যজনের মূলধন থেকে লাভ কিছুই হয় নি। বুঝা গেল, শিরকাতের মধ্যে লভ্যাংশের প্রকৃত বণ্টন উদ্দেশ্য নয়, আনুষ্ঠানিক বণ্টনই যথেষ্ট। শর্ত হল, অংশীদারদের সকলের এর উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সুতরাং প্রচলিত পন্থায় লভ্যাংশ বণ্টনের শরয়ী অবকাশ আছে বলে মনে হয়। বিশেষত টাকা রাখার সময় যখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানে, লভ্যাংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বণ্টিত হবে; সুতরাং পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে লভ্যাংশ বণ্টনের এক গাণিতিক পদ্ধতি গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এ ব্যাখ্যা তখন প্রযোজ্য হবে যখন কোনো ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যে ব্যাংকে প্রবেশ করে বা মধ্যবর্তী সময়ে টাকা উত্তোলন করে বা জমা রাখে। যদি কোনো ব্যক্তি মেয়াদের মধ্যবর্তীকালে ব্যাংক থেকে একেবারে বের হয়ে যায় তাহলে তখন এ মাসআলা কার্যকর হবে না। সে অবস্থায় উত্তম পদ্ধতি হবে, ব্যাংক এখন তার লভ্যাংশ বণ্টন করবে না; বরং এ ব্যক্তি কারবারে তার অংশ বিক্রি করবে এবং ব্যাংক তা ক্রয় করবে। আর অংশ ক্রয় করার জন্য ব্যাংক লাভ লোকসানের অবস্থা দেখে তার অংশের মূল্য নির্ধারণ করবে।

www.pathagar.com

# ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি

এতক্ষণ ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংক ও অর্থ আমানতকারীর মধ্যকার সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হল। এখন ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থের যোগান, অর্থাৎ মূলধন সরবরাহ করার ব্যাপারে ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কয়েকটি প্রক্রিয়া হতে পারে।

## শিরকাত ও মুদারাবা

সুদের বিপরীতে সঠিক ইসলামী বিকল্প পদ্ধতি হচ্ছে শিরকাত ও মুদারাবা। যা সুদের চেয়ে কয়েকগুণ ভাল ফলাফল বহনকারী। এটা পুঁজি বিনিয়োগের অত্যন্ত সুষম ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। সম্পদ বন্টনের উপর যার খুবই ভাল প্রভাব পড়ে। এ দ্বারা ব্যাংকিংয়ের এ ধারণাও বিদূরিত হতে পারে, ব্যাংক ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে শুধু পুঁজির যোগান দেয়ার মাধ্যম হয়। শিরকাত ও মুদারাবা ব্যবস্থা চালু হলে ব্যাংকের নাম ব্যাংকই থাকুক আর যাই থাকুক, কিন্তু ব্যাংকের এ অবস্থান শেষ হয়ে যাবে। তখন ব্যাংক যথারীতি কারবার পরিচালনা করবে।

শিরকাত ও মুদারাবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, শিরকাতের মধ্যে অংশীদারগণ মূলধনের মধ্যেও শরিক হয় এবং কাজের মধ্যেও শরিক হতে পারে। কেউ কার্যত কারবারে হস্তক্ষেপ না করলে সে ভিন্ন কথা। আর মুদারাবার মধ্যে মূলধন থাকে পুঁজি সরবরাহকারীর আর কাজ করে কারবারী। পুঁজি সরবরাহকারী কারবারে অংশগ্রহণ করে না।

এখানে শিরকাত ও মুদারাবার কিছু মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হল। শিরকাত ও মুদারাবা পদ্ধতিতে কারবার করলে তা অনুসরণ করা জরুরি।

১. মূলধনের অনুপাতে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা শরয়ীভাবে জায়েয নেই। লভ্যাংশ নির্ধারণ করার সঠিক শরয়ী পদ্ধতি হল প্রকৃতপক্ষে যে লাভ হবে তার শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে।

২. পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মুনাফার যে কোনো আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা যাবে। যেমন কারো মূলধন চল্লিশ শতাংশ, কিন্তু তার জন্য ষাট শতাংশ লাভ নির্ধারণের শর্ত করা, অন্যজনের মূলধন ষাট শতাংশ,

www.pathagar.com

তার জন্য চল্লিশ শতাংশ লাভ নির্ধারণের শর্তারোপ করা, এমন করা জায়েয। পুঁজির পরিমাণ অনুসারে লভ্যাংশ বণ্টন জরুরি নয়। এ দ্বারা বুঝা গেল, বিভিন্ন অংশীদারদের জন্য মুনাফার বিভিন্ন হার স্থির করা যেতে পারে। বর্তমানের পরিভাষায় একে 'পরিমাপ' (Weightage) দেয়া বলে। বিভিন্ন অংশীদারকে বিভিন্ন পরিমাপ দেয়া যেতে পারে। তবে যে অংশীদার কাজ না করার শর্তারোপ করেছে তার মুনাফা তার পুঁজির অনুপাতের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

৩. লভ্যাংশের মধ্যে বিভিন্ন অংশীদারকে বিভিন্ন পরিমাপ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু লোকসানের মধ্যে এমন করা জায়েয নেই। লোকসান সর্বাবস্থায় পুঁজির অনুপাতে হবে। যাকে ফুকাহাগণ এভাবে ব্যক্ত করেন : 'الربح على ما اصطلحوا عليه والوضيعة بقدر رأس المال' (লভ্যাংশ হবে নির্ধারণের ভিত্তিতে আর ক্ষতি হবে মূলধনের ভিত্তিতে)।

## শিরকাত ও মুদারাবার সমস্যা

শিরকাত ও মুদারাবা চালু করতে সাধারণত দুধরনের সমস্যার কথা বলা হয়:

১. আজকাল বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর মান অনেক নিচে নেমে গেছে। কাউকে শিরকাতের ভিত্তিতে মূলধন সরবরাহ করলে সে কখনো প্রকৃত লাভের কথা বলে না; বরং লাভের স্থলে লোকসান দেখায়। এ কারণে শিরকাত ও মুদারাবার ভিত্তিতে কাজ করা কঠিন। এর উত্তর, বাস্তবিকই সমাজে অবিশ্বস্ততার অবস্থা দুঃখজনক, কিন্তু অবিশ্বস্ততার কারণে কখনো কোনো কাজ বন্ধ হয় না। বিভিন্ন পন্থায় অবিশ্বস্ততার পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেমন অডিট ব্যবস্থা, একাউন্টস ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ইত্যাদি। মুশারাকা ও মুদারাবার মধ্যেও এ ধরনের কার্যক্রম চালানো যেতে পারে। সে সাথে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে একবার অবিশ্বস্ততা প্রমাণিত হবে, তাকে সব ব্যাংকে ব্লাক লিস্টভুক্ত করা যেতে পারে। যার অর্থ, এরূপ ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো ব্যাংক থেকে মূলধন লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে। যদি আইন করে এটা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহলে মানুষ মিথ্যাচার করতে ভয় পাবে। এর দ্বারা এ ক্ষতিকারক উপসর্গ অনেকটা বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া অন্য

www.pathagar.com

আরো আইনী পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এক ব্যাংক একা যদি এ কাজ করে তাহলে তার জন্য সত্যিই কষ্টকর, কিন্তু যদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাজ করা হয় এবং সব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা এ নিয়ম অনুযায়ী চলে, তাহলে মিথ্যাচারের পথ বন্ধ করার রাস্তা বের হতে পারে।

২. দ্বিতীয় সমস্যা হয় ইনকাম ট্যাক্স ব্যবস্থার কারণে। সাধারণত ব্যবসায়ীগণ দুধরনের খাতা বানায়। ইনকাম ট্যাক্সের জন্য আলাদা খাতা থাকে, আর প্রকৃত খাতা থাকে অন্য আরেকটা। এ অবস্থায় মুশারাকা বা মুদারাবার ভিত্তিতে মূলধন গ্রহণকারী যদি প্রকৃত লাভ দেখায় তাহলে ইনকাম ট্যাক্সওয়ালা আটকাবে। আর যদি সে ব্যাংককে প্রকৃত লাভ না দেখায় তাহলে প্রকৃত লাভের বণ্টন হয় না। এর উত্তর হচ্ছে, সরকারীভাবে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হলে দেখা যায়, মুশারাকা ও মুদারাবাকে সফল করার জন্য ট্যাক্স ব্যবস্থার সংশোধনও জরুরি। ট্যাক্সকে আমদানির সাথে সম্পৃক্ত না করে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ট্যাক্সের এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যাতে মিথ্যাচারের এ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

তাছাড়া অর্থ বিনিয়োগের অনেক খাত এমন আছে যেখানে শিরকাত ও মুদারাবার মধ্যে অনেক দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হবে না। যেমন রপ্তানি সংক্রান্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকে রপ্তানিকৃত মালামালের ব্যয় এবং সম্ভাব্য ধারণাকৃত মূল্য জানা থাকে। সুতরাং এর মধ্যে শিরকাত বা মুদারাবায় ধোঁকা প্রতারণার সম্ভাবনা অনেক কম।

তেমনিভাবে ব্যাংক ব্যবসায়ীর পুরো কারবারের মধ্যে শরিক হওয়া জরুরি নয়। সে কারবারের কোনো নির্দিষ্ট অংশেও শরিক হতে পারে, যাতে লাভ নির্ধারণ বেশি কঠিন হবে না। এছাড়া ব্যাংকের জন্য যেহেতু ব্যবসায়ীর সাথে স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক শরিক থাকা জরুরি নয়; বরং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের দালান, মেশিনারি ইত্যাদি পূর্ব থেকেই বিনিয়োগ করেছে। ব্যাংক ছয় মাস বা এক বছরের জন্য তার সাথে শিরকাতের লেনদেন করতে পারে। এ কারণে পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে চুক্তি হতে পারে, এ নির্দিষ্ট ও সীমিত শিরকাতের মধ্যে কারবারের শুধু প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Expenses) মেনে নেয়া হবে আর মোট লাভ (Gross profit) উভয় পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি ব্যবসায়ী সরবরাহ করে, তাই তার লাভের অনুপাতও বৃদ্ধি করা

www.pathagar.com

যেতে পারে, কিন্তু এ স্থাবর সম্পত্তির ব্যয় এবং পরোক্ষ ব্যয় শিরকাতের উপর চাপানো উচিৎ নয়। এভাবে হিসাব নিকাশও সহজ হয়ে যাবে আর অবিশ্বস্ততার আশঙ্কাও কমে যাবে। আর ট্যাক্স যেহেতু উপার্জিত লাভের উপর আরোপ হয়, এ কারণে ট্যাক্স সমস্যারও সমাধান বেরিয়ে আসবে। শিরকাত ও মুদারাবাকে কোন্ ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তার আরো বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মূল ইসলামী পদ্ধতি মুশারাকা ও মুদারাবাই, কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে মুশারাকা বা মুদারাবা সম্ভব হয় না। যেমন কোনো কৃষকের ট্রাক্টর ক্রয়ের জন্য পুঁজির দরকার। এ ক্ষেত্রে শিরকাত ও মুদারাবা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় বিনিয়োগের আরো কিছু পদ্ধতি আছে। এখন তার আলোচনা করা হচ্ছে।

## ইজারা

এটাও পুঁজি বিনিয়োগের একটি শরয়ী পন্থা, যাকে Leasing বলে। এর ব্যাখ্যা পূর্বে (কোম্পানির জন্য মূলধন সরবরাহ শিরোনামের অধীনে) করা হয়েছে। এখানে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা জরুরি যে, শুধু ইজারা শব্দ দেখে কোনো লেনদেনকে শরীয়তসম্মত বলে স্থির করা উচিৎ নয়। কারণ, বর্তমানে সাধারণত ইজারায় যে লেনদেন হয় তার মধ্যে ইজারার প্রকৃত অবস্থা বিদ্যমান নেই। ইজারার প্রকৃত অবস্থা হল, ইজারাদাতা (Lessor) যে মেশিনারি ইত্যাদি ভাড়ায় দিচ্ছে সে তার মালিক ও দায়বহনকারী হবে, কিন্তু বিনিয়োগ ইজারায় বর্তমানে কার্যত এরূপ হয় না। ইজারাদাতা (Lessor) মেশিনারির কোনো প্রকার দায় গ্রহণ করে না। যদি যন্ত্রপাতির কোনো ক্ষতি হয় তাহলে তা ইজারা গ্রহণকারীর (Lessee) ক্ষতি বলে মনে করা হয়। এমনকি কোনো দুর্ঘটনায় যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয়ে গেলে তখনও ইজারা গ্রহীতা তার ভাড়া প্রদান করতে থাকে। যন্ত্রপাতির সাথে ইজারাদাতার সম্পর্ক শুধু এতটুকু থাকে, ভাড়া পরিশোধ না করলে সে যন্ত্রপাতি বিক্রি করে নিজের ঋণ উসুল করে নেবে। সুতরাং বর্তমানে সাধারণত প্রকৃত ইজারা হয় না। আসল উদ্দেশ্য তো শুধু সুদের উপর ঋণ প্রদান করা, কিন্তু ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য ইজারার নাম ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের লেনদেন শরয়ীভাবে জায়েয নেই। তবে হাঁ, যদি প্রকৃতপক্ষে ইজারাদাতা যন্ত্রপাতির মালিক হয় এবং সে এর দায় স্বীকার করে নিয়ে

www.pathagar.com

ইজারাচুক্তি করে, তাহলে তার অবকাশ আছে। আর ভাড়া নির্ধারিত করার সময় এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, যন্ত্রপাতির মূল্য কিছু লাভসহ উসুল হলে তার মধ্যেও শরয়ী কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু চুক্তির মধ্যে এ শর্ত আরোপ করা যাবে না যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যন্ত্রপাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইজারা গ্রহীতার মালিকানায় চলে যাবে। কারণ, এর মধ্যে 'صفقة فى صفقة' (চুক্তির ভিতর আরেক চুক্তি)-এর অবস্থা তৈরি হয়। তবে পূর্ব শর্তারোপ ছাড়া মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তার কাছে মালিকানা স্থানান্তরের অবকাশ আছে।

## মুরাবাহা মুআজ্জালা

এটাও অর্থ বিনিয়োগের একটি শরয়ী পদ্ধতি হতে পারে। এর সারকথা হল, যখন কোনো লোক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার জন্য আসবে, তখন ব্যাংক তাকে জিজ্ঞেস করবে, কোন্ বস্তুর জন্য অর্থ দরকার। ব্যাংক তাকে নগদ অর্থ প্রদানের পরিবর্তে সে বস্তু ক্রয় করে মুরাবাহা হিসেবে লাভের উপর বাকিতে বিক্রি করে দেবে। লভ্যাংশ দরদাম করে যে কোনো মূল্য স্থির করে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু লাভের একটা হার নির্ধারণ করে মুরাবাহা এ জন্য করা হয়, যাতে নীতিমালার মধ্যে সমতা থাকে এবং সব মানুষ থেকে একই হারে লাভ উসুল হয়। লাভের যে হার নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় মার্ক আপ (Mark up)।

এটাও পুঁজি বিনিয়োগের একটি জায়েয পদ্ধতি হতে পারে। শর্ত হল, সঠিক ও প্রয়োজনীয় শর্তের সাথে সম্পাদন করতে হবে। কারণ, বাকির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা ফুকাহাদের সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ব্যাপক হারে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এটা খুবই স্পর্শকাতর পদ্ধতি। এর মধ্যে সামান্যতম অসতর্কতা তাকে সুদী ব্যবস্থার সাথে মিশ্রিত করে দেয়। আজকাল ব্যাংকগুলোতে মুরাবাহার মূল তত্ত্ব না বুঝে এবং তার প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ না করেই তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে তাতে বহু দোষ সৃষ্টি হয়। সাধারণত ব্যাংক থেকে মুরাবাহার লেনদেন করার সময় যে ভুলগুলো হয়ে থাকে এবং সঠিক শরয়ী পদ্ধতিতে মুরাবাহা করার সময় যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি, সেগুলো এখানে চিহ্নিত করে দেয়া হল ।

www.pathagar.com

## প্রচলিত মুরাবাহার মধ্যে শরয়ী ত্রুটিসমূহ

১. মুরাবাহার সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, ব্যাংক কোনো বস্তু ক্রয় করে লাভে (Mark up) তা বিক্রি করে দেবে, কিন্তু পাকিস্তানি ব্যাংকগুলোতে এমনও হচ্ছে, যে বস্তুর উপর মুরাবাহার চুক্তি হচ্ছে সে বস্তু ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহীতার কাছে আগে থেকেই মজুদ থাকে। ব্যাংক তার থেকে সে বস্তু নগদে কম মূল্যে ক্রয় করে আবার তার কাছেই বাকিতে লাভ ধরে পুনরায় বিক্রি করে দেয়। একে বাই ব্যাক (Buy Back) বলে। এভাবে প্রকৃত মুরাবাহার স্থলে লাভ (Mark up)-কে 'বাই ব্যাক' এর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা শরয়ীভাবে একেবারে নাজায়েয। কেননা, একই ব্যক্তি থেকে কম মূল্যে ক্রয় করে তৎক্ষণাৎ তার কাছে অধিক মূল্যে বাকিতে বিক্রি করা মূলত সুদী ঋণেরই একটি রূপ। যেখানে প্রথম কেনাবেচার মধ্যেই এ শর্ত থাকে, তার কাছেই পুনরায় বিক্রি করতে হবে।

২. বাই ব্যাক (Buy Back)-এর বাহানাও (বৈধকরণ প্রক্রিয়া) বাস্তবে হয় না। সাধারণত কেবল কৃত্রিম কার্যক্রম হয়ে থাকে। এমন কোনো পণ্য আগে থেকে মজুদই থাকে না যার উপর বাই ব্যাক করা হচ্ছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের এমন ব্যয় যার দ্বারা কোনো পণ্য ক্রয় করা যায় না, যেমন বেতন বিল ইত্যাদি পরিশোধের জন্যও ব্যাংক থেকে মুরাবাহার উপর ঋণ পাওয়া যায়।

৩. যদি Buy Back নাও হয়, প্রকৃত মুরাবাহাই হয়, তবুও মুরাবাহার উপর বিক্রীত পণ্য প্রথমে ব্যাংকের দখলে ও দায়বদ্ধতার মধ্যে আসার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না। অথচ মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য ঐ পণ্য প্রথমে ব্যাংকের দখলে ও দায়বদ্ধতায় আসা জরুরি।

৪. ব্যাংকের কাছে যখন কোনো ব্যক্তি মূলধন লাভের জন্য আসে তখন ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগের সীমা নির্দিষ্ট (تحديد السقف) করে দেয় যে, ব্যাংক এত পরিমাণ মূলধন মুরাবাহা করার জন্য প্রস্তুত আছে। চুক্তির (Agreements) উপর স্বাক্ষর করানো হয়। সে সময় ব্যাংক ঐ ব্যক্তিকে পণ্য ক্রয়ের উকিল বানিয়ে দেয়, কিন্তু তখন কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না; বরং সেটা শুধু একটা পারস্পরিক চুক্তি হয় যে, ব্যাংক প্রয়োজন মোতাবেক এ শর্তাদির উপর তার গ্রাহককে প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে

www.pathagar.com

সরবরাহ করবে। এখানে প্রয়োজন ছিল, যখন গ্রাহকের কোনো জিনিসের প্রয়োজন হবে তখন সে ব্যাংককে বলবে। তারপর উত্তম পন্থা হল, ব্যাংক সে বস্তু তার নিজস্ব মাধ্যম দ্বারা ক্রয় করে নিজের দখলে আনবে। তারপর গ্রাহককে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করবে, কিন্তু ব্যাংক যদি নিজে ক্রয় করার বদলে সেই গ্রাহককেই ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল বানায়, তাহলে তার মধ্যে অন্তত এটা জরুরি, প্রথমে গ্রাহক ব্যাংকের উকিল হিসেবে সে বস্তু ক্রয় করে ব্যাংককে অবহিত করবে। তারপর তার থেকে ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে নিজের জন্য ক্রয় করবে। এখানে গ্রাহকের দুটি অবস্থান পরস্পর পৃথক রাখা অত্যাবশক ছিল। প্রথমে তার অবস্থান উকিলের। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ অবস্থানে থাকবে তার উপর উকিলের বিধান প্রযোজ্য হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের উকিল হিসেবে পণ্যের উপর তার দখল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় এবং তারই জামানতে থাকবে। সুতরাং যদি এ সময় উকিলের কোনো ধরনের অবহেলা ছাড়া ঐ পণ্য ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতি ব্যাংকের হওয়া উচিৎ। তারপর যখন সে ব্যাংককে অবহিত করে তার থেকে সে পণ্য নিজের জন্য ক্রয় করবে, তখন পণ্য গ্রাহকের মালিকানায় ও জামানতে আসবে, এর পরে ক্ষতি হলে তা গ্রাহকের হবে।

গ্রাহকের এ দুই অবস্থান সম্পূর্ণরূপে একটা অন্যটা থেকে পৃথক হওয়া অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু আজকাল অধিকাংশ ব্যাংক এ বিষয়টির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না; বরং বিনিয়োগের সীমা নির্ধারণ অর্থাৎ Limit অনুমোদন করার সময় মুরাবাহা চুক্তির উপর যে স্বাক্ষর হয়, তাকেই যথেষ্ট মনে করে নেয়া হয়। তারপর গ্রাহক পণ্য নিজে ক্রয় করে তা ব্যবহার করতে থাকে। ব্যাংক থেকে ক্রয়ের জন্য আলাদা কোনো ইজাব কবুল করা হয় না। যার ফলে এটা শুধু একটা কৃত্রিম কার্যক্রম হয়ে থাকে। কার্যত ফলাফল এটাই দাঁড়ায়, ব্যাংক গ্রাহককে অর্থ প্রদান করল এবং মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করল। পণ্য ব্যাংকের জামিনে আসা তারপর তার মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া এবং এ উদ্দেশে ইজাব কবুল ইত্যাদি কিছুই হয় না। এ পদ্ধতি একদম হারাম ও নাজায়েয।

৫. এ ভুলও হয়, বিনিয়োগের সীমা নির্ধারণ করার চুক্তির উপর স্বাক্ষর হওয়ার সময়ই ব্যাংক সে ব্যাক্তি থেকে Bill of Exchange (হুন্ডি) বা

www.pathagar.com

প্রমিসারি নোটের উপর স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এটা ভুল এ কারণে, হুন্ডির উপর স্বাক্ষর তখন হয় যখন কোনো ব্যক্তি ঋণী হয়ে যায়। আর এ ব্যক্তি এখনো ব্যাংকের ঋণগ্রাহক হয় নি। এখন তো শুধু ভবিষ্যতে মুরাবাহা মুআজ্জালা করার উপর চুক্তি হল। গ্রাহক ব্যাংকের ঋণী তখন হবে যখন সে পণ্য ব্যাংকের কাছ থেকে নিজের জন্য ক্রয় করবে। সুতরাং প্রমিসারি নোটের উপর স্বাক্ষরও তখন হওয়া উচিৎ।

৬. সুদী ব্যবস্থায় ঋণ পরিশোধের সময় হলে ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম বা এখন পরিশোধ করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে এ ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আগের সুদ ঋণের মধ্যে গণ্য হয় আর তার উপর অতিরিক্ত সুদ ধার্য করে আরো সময় প্রদান করা হয়। তাকে বলা হয় রুল অভার (Roll Over) করা। মুরাবাহার মধ্যেও এ কারবার শুরু করা হয়েছে। মুরাবাহার মূল্য পরিশোধের সময় হলে মূল্য পরিশোধ করতে সক্ষম না হলে এখানেও ঋণকে রুল অভার করে দেয়া হয়। অথচ এটা ছিল একটা ক্রয়-বিক্রয়। এর মধ্যে পণ্যের একটি মূল্য নির্ধারিত ছিল। এ মূল্যে এখন হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এ মুরাবাহার উপর আরেক মুরাবাহাও করা যাবে না। মুরাবাহার মূল তত্ত্ব এবং তার শর্তাদি পূর্ণ না করার কারণে এ ধরনের অনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। যার কারণে লেনদেন শরয়ীভাবে জায়েয থাকে না। তাই মুরাবাহার উপর আমল করার জন্য তার শর্তাদির প্রতি খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এখানে মুরাবাহা মুআজ্জালার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা বর্ণনা করা হল :

## ঋণের দলিল

মুরাবাহা মুআজ্জালার মধ্যে পণ্যের দাম ক্রেতার উপর ঋণ হয়ে যায়। সুতরাং ব্যাংক ঋণের দলিল হিসেবে কাফালত বা রেহেন দাবি করতে পারে। রেহেনের বিভিন্ন ধরন বর্তমানে প্রচলিত আছে। এর শরয়ী বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার আরবি গ্রন্থ 'احكام البيع بالتقسيط'-এর মধ্যে রয়েছে। এখানে তার সার সংক্ষেপ পেশ করা হল।

মূল্যের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে:

১. বিক্রীত পণ্যকেই প্রমাণ হিসেবে নিজের কাছে রাখা যায়। এর

www.pathagar.com

হুকুম হল, মূল্য পরিশোধের জন্য বিক্রীত পণ্য আটক করে নিজের কাছে রাখা জায়েয নেই। কারণ, বায়ে মুআজ্জাল (বাকি বিক্রি)-এর ক্ষেত্রে বিক্রেতার বিক্রীত পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকে না।[১] তবে বিক্রীত পণ্য রেহেন হিসেবে নিজের কাছে রাখা যেতে পারে। শর্ত হল, ক্রেতা পণ্য হস্তগত করার পর পুনরায় রেহেন রাখতে হবে।[২] বিক্রীত পণ্য আটক আর রেহেনের মধ্যে পার্থক্য হল, পণ্য আটকের বেলায় পণ্য অর্থের জামানত হবে। পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। আর রেহেনের বেলায় পণ্য মূল্যের জামানত হবে। পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি রহিত হবে না।

২. বর্তমানে রেহেনের একটি ধরন প্রচলিত আছে, যাকে সাধারণ বন্ধক 'الرهن الساذج' (Simple Mortgage) বা 'الذمة السائلة' (Floating Charge) বলে। এর মূলকথা হল, রেহেন, রেহেনদাতার দখলেই থাকে। সে তা ব্যবহারও করতে থাকে। রেহেন গ্রহীতা রেহেন হস্তগত করে না। তবে রেহেন গ্রহীতার অধিকার থাকে, সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করলে সে তা বিক্রি করে ঋণ উসুল করতে পারবে। আর রেহেনদাতা ঋণ পরিশোধের পূর্বে রেহেন নিজে ব্যবহার করতে পারবে; কিন্তু তার মালিকানা অন্য কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না।

এ রেহেনের মধ্যে আপত্তি হতে পারে, এক্ষেত্রে রেহেনকৃত বস্তুর দখল রেহেন গ্রহীতার কাছে স্থানান্তরিত হয় না। অথচ দৃশ্যত রেহেন গ্রহীতার রেহেনকৃত বস্তু হস্তগত হওয়া রেহেন শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি, কিন্তু কতিপয় কারণে (যার বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে আছে) রেহেনের এ প্রকার জায়েয মনে হয়।

৩. ঋণের নিরাপত্তার একটা পন্থা হল, তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে জামিনদার বানিয়ে নেয়া। একে ফিকহী পরিভাষায় কাফালত 'كفالة' বলে। এ পদ্ধতিও জায়েয আছে। এর বিস্তারিত আহকাম ফকীহগণ লেখেছেন, কিন্তু তার উপর পারিশ্রমিক বা ফিস গ্রহণ করা শরয়ীভাবে বৈধ নয়।

---

[১] الهندية ج٣ : ص١٥ كتاب البيوع، الباب الرابع.

[২] رد المحتار مع الدر المختار ج٦ : ص ٤٩٧ كتاب الرهن.

www.pathagar.com

## ঋণ পরিশোধের বিলম্বে জরিমানা

সুদী ব্যবস্থায় ঋণ পরিশোধে বিলম্ব হলে আপনা আপনি সুদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ভয়ে ঋণগ্রহীতা সময়মতো ঋণ পরিশোধ করে দেয়, কিন্তু মুশারাকা, মুদারাবা অথবা মুরাবাহার মধ্যে এ ব্যবস্থা থাকে না। এ কারণে মানুষ সুযোগের অপব্যবহার করে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করে। এ পথ বন্ধ করার কী উপায়? এ মাসআলা বর্তমানে আলেমদের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এতটুকু পর্যন্ত তো স্থিরীকৃত যে, ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ঋণগ্রহীতার অভাবের কারণে হলে তার বিধান কুরআন ঘোষণা করে দিয়েছে: 'وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة' (খাতক যদি অভাবী হয় তাহলে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেয়া উচিৎ)। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার উপর কোনো ধরনের জরিমানা আরোপ না করে আরো সময় দিতে হবে। কিন্তু যদি সে টালবাহানার আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অকারণে যদি বিলম্ব করে, তাহলে তার প্রতিরোধ হবে কী ভাবে?

এ ব্যাপারে বর্তমানের কোনো কোনো আলেম বিলম্বের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার উপর ক্ষতিপূরণ (Compensation) আরোপ করা জায়েয বলেছেন। কোনো কোনো ব্যাংকে এর উপর কার্যক্রম চলছে। এর ফরমুলা তৈরি করা হয়েছে, প্রথমে তার টালবাহানা যাচাই করার জন্য এক মাস পর্যন্ত তাকে নোটিশ দেয়া হবে। যদি এক মাসের নোটিশ সত্ত্বেও সে ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে দেখতে হবে, সে যতদিন বিলম্ব করেছে ততদিন পর্যন্ত ব্যাংকের 'ইনভেস্টমেন্ট একাউন্টে' 'حساب الاستثمار' কত লাভ হয়েছে। সে হিসেবে তার উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হবে। যেটা সরকার নয়; বরং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ অর্থাৎ ব্যাংক পাবে। যেমন ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট একাউন্টে শতকরা পাঁচ ভাগ লাভ হলে ঋণের শতকরা পাঁচ ভাগ তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করতে হবে। যদি এ সময়ে ব্যাংকের কোনো লাভ না হয় তাহলে তার থেকেও কিছু গ্রহণ করা যাবে না।

কিন্তু অধিকাংশ আলেম 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ' সমর্থন করেন না। এর বৈধতার উপর যে দলিল পেশ করা হয় তা ত্রুটিপূণ (এর বিস্তারিত বিবরণ আমার 'احكام البيع بالتقسيط' গ্রন্থে রয়েছে)। শরয়ীভাবে তার দলিল ত্রুটিপূর্ণ

www.pathagar.com

তো আছেই, কার্যক্ষেত্রেও এটা ফলদায়ক নয়। কারণ, এর দ্বারা ঋণগ্রহীতার উপর ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ পড়বে না। কারণ, 'ইনভেস্টমেন্ট একাউন্ট'-এর লাভ সাধারণত অল্প হয়। আর মুরাবাহার হার হয় অনেক বেশি। সুতরাং কেউ দীর্ঘমেয়াদের জন্য অধিক হারে মুরাবাহা না করে স্বল্প মেয়াদের জন্য মুরাবাহা করে ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করতে পারে এবং 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ' স্বীকার করে নিতে পারে। এর মধ্যে নিজের জন্য কোনো চাপ নেই; বরং লাভজনকই মনে করবে। সুতরাং বিলম্বের পথ বন্ধ করার উপযুক্ত পন্থা যেটা আমি প্রথমে পেশ করেছিলাম। পরবর্তীতে এটা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। সেটা হল, মুরাবাহা অথবা ইজারা চুক্তির (Agreement) মধ্যে ঋণগ্রহীতা একথাও লেখবে, যদি আমি ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করি তাহলে এত টাকা কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব। এ টাকা ঋণের আনুপাতিক হার হিসেবেও নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ধরনের টাকা দিয়ে একটি জনকল্যাণ ফান্ডও গঠন করা যেতে পারে। এ ফান্ড থেকে কাউকে সাহায্যও করা যেতে পারে। এর থেকে মানুষকে বিনা সুদে ঋণও দেয়া যেতে পারে, কিন্তু এ টাকা ব্যাংকের আয়ের মধ্যে গণ্য হবে না। এ পদ্ধতি বেশি উপকারী। কারণ, এ পদ্ধতিতে টাকার হার নির্দিষ্ট নেই। অধিক হারেও রাখা যেতে পারে। এর দ্বারা ঋণগ্রহীতার উপর চাপ পড়বে।

এর বৈধতা হল, এ টাকা জরিমানাও নয় সুদও নয়; বরং ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে নিজের উপর অত্যাবশ্যকীকরণ, যাকে 'يمين اللجاج' বলে। এ অত্যাবশ্যকীকরণের আলোচনা ইমাম খাত্তাবী রাহ. তাঁর 'تحرير الكلام فى مسائل الالتزام' গ্রন্থে করেছেন।

اما اذا التزم المدعى عليه للمدعى انه ان لم يوفه حقه فى وقت كذا وكذا فله عليه كذا وكذا فهذا لايختلف فى بطلانه لانه صريح الربا --- الى قوله: واما اذا التزم انه ان لم يوفه حقه فى وقت كذا فعليه كذا لفلان او صدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور انه لايقضى به كما تقدم وقال ابن دينار يقضى به (ص١٦٧-طبع بيروت)

অতপর ঋণদাতার জন্য যদি ঋণী নিজের উপর কিছু আরোপ করে, যদি সে তার প্রাপ্য যথা সময়ে প্রদান না করে তাহলে সে তাকে এতকিছু

www.pathagar.com

প্রদান করবে, তাহলে তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই। কারণ, এটা স্পষ্ট সুদ। আর যদি সে এরূপ অত্যাবশ্যক করে, যদি সে তার প্রাপ্য যথা সময়ে পরিশোধ না করে তাহলে সে এত পরিমাণ অমুককে দেবে বা গরীবকে সাদকা করে দেবে। এক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিমত হল সে তা পূরণ করবে না। যেমন পেছনে আলোচিত হয়েছে। ইবনে দীনার বলেন, সে তা পরিশোধ করবে।

এ দ্বারা বুঝা গেল, এ অত্যাবশ্যকীকরণ সর্বসম্মতিক্রমে নৈতিকভাবে (দিয়ানাতান) জরুরি হয়ে যায়। আর আইনগতভাবে (কাযাআন) জরুরি হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। বর্তমান প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে সেসব মনীষীর কথার উপর আমল করায় কোনো ক্ষতি নেই যারা আইনগতভাবেও তা অত্যাবশ্যক মনে করেন।

## সময়ের পূর্বে পরিশোধ করায় ঋণ কমিয়ে দেয়া

ঋণগ্রহীতা যদি তার ঋণ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধ করে দেয় তাহলে সুদী ব্যবস্থায় সুদ হ্রাস পায়। প্রশ্ন হল, এরূপ অবস্থায় মুরাবাহার মূল্য হ্রাস করা যায় কিনা? এ মাসআলার দুটি দিক :

১. একদিক যাকে ফকীহগণ 'ضع و تعجل' বলে ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা তার ঋণদাতাকে বলবে, তুমি ঋণ কমিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে উসুল করে নাও। এর বিধান সম্পর্কে ফকীহদের ঘোর মতবিরোধ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এটা নাজায়েয এবং এটাই বিশুদ্ধ (বিস্তারিত দলিল 'احكام البيع بالتقسيط' গ্রন্থে আছে)।

২. পরবর্তী কিছু হানাফী আলেম মুরাবাহা মুআজ্জালার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পরিশোধের ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু ব্যাংকগুলোকে যদি এর অবাধ সুযোগ দেয়া হয় তাহলে মুরাবাহা এবং সুদী ব্যবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য অবশিষ্ট থাকবে না। তাই এটাই যুক্তিযুক্ত হবে, চুক্তির মধ্যে স্পষ্ট থাকবে না, আগে পরিশোধ করলে মূল্য কমে যাবে, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি সময়ের আগে পরিশোধ করে দেয় তাহলে তখন কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতীত কমিয়ে দেয়া হলে ক্ষতি নেই।

www.pathagar.com

# ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির শাখাগত সমন্বয়

এতক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের যে প্রক্রিয়াগুলো শরয়ী মূলনীতি অনুযায়ী প্রয়োগ হতে পারে তা বিবৃত হয়েছে। এখন এ বিষয়টি বিবেচ্য, এসব পদ্ধতি ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় হবে কী ভাবে? যতক্ষণ ব্যাংকের এক একটি শাখাগত লেনদেনের উপর এসব পদ্ধতির সমন্বয় করা না যাবে, ততক্ষণ কার্যতভাবে ব্যবস্থাপনা চালানো কঠিন। তাই এখন ব্যাংকের শাখাগত লেনদেনের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে।

একথা পূর্বেই (ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করতে গিয়ে) বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্যাংকের পুঁজি বিনিয়োগের তিনটি পদ্ধতি আছে। পুঁজি বিনিয়োগের তিন পদ্ধতিকে শরয়ী আঙ্গিকে ঢেলে সাজানোর জন্য বিবেচনা করতে হবে, এখানে ইসলামী কোন্ বিনিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে।

'تمويل المشاريع' (project Financing) প্রকল্পে শিরকাত, মুদারাবা, ইজারা ও মুরাবাহা সব পদ্ধতিতেই বিনিয়োগ হতে পারে। ইজারা হবে এভাবে, ব্যাংক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ভাড়ায় প্রদান করবে। মুরাবাহা হবে, যন্ত্রপাতি ক্রয় করে লাভ ধরে মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করে দেবে। শিরকাত ও মুদারাবা দীর্ঘ-মেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

'تمويل رأس المال العامل' (Working Capital Financing)-এর মধ্যে বিশেষ লেনদেনের ক্ষেত্রে মুশারাকা ও মুদারাবা হতে পারে। যেমন ব্যাংক যে মূলধন সরবরাহ করছে তা দিয়ে তুলা ক্রয় করা হবে। এর দ্বারা কাপড় প্রভৃতি তৈরি করে যে লাভ হবে, ব্যাংক তার মধ্যে শরিক হবে। আর কাঁচা মালের প্রয়োজন হলে তার মধ্যে মুরাবাহাও হতে পারে।

Over Head Expenses (যে ব্যয়ের সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পর্ক থাকে না, যেমন বেতন, ভাড়া জাতীয় বিলের পরিশোধ ইত্যাদি)-এর মধ্যে পুঁজি বিনিয়োগ খুব কঠিন। এখানে ইজারা ও মুরাবাহার সম্ভাবনাই নেই। এখানে দুটো পথই আছে। একটা হল মুশারাকা পদ্ধতি। যত টাকার প্রয়োজন ব্যাংক তত টাকা দিয়ে কারবারের কোনো অংশে শরিক হয়ে যাবে। যখন শিরকাত হিসেবে প্রতিষ্ঠান টাকা পেয়ে গেল তখন

www.pathagar.com

সে কারবারের যেকোনো প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা। এর মধ্যে ব্যাংক সেসব ব্যয় আদায় করতে পারে যা এ ঋণ হিসাব নিকাশ করতে লাগে। এ ব্যাপারে বিধান হল, প্রকৃত ব্যয় উসুল করবে। কিন্তু আলাদাভাবে প্রত্যেকটি ঋণের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই এ অবকাশ আছে বলে মনে হয়, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কাজের 'পরিমিত পারিশ্রমিক'[১] উসুল করবে। পরিমিত পারিশ্রমিক থেকে অতিরিক্ত আদায় করবে না। এর নজির হল, ফতোয়া প্রদান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নেই। কিন্তু ফতোয়া লেখে তার পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয আছে। এখানে ফকীহগণ মাসআলা লেখেছেন, লেখার পারিশ্রমিক 'পরিমিত পারিশ্রমিক' থেকে অধিক হওয়া উচিৎ নয়।

## আমদানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম

আগেই এ কথা বলা হয়েছে, বর্তমান ব্যবস্থায় আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রেও ব্যাংকের বিরাট অবদান রয়েছে। আমদানির (Import) বেলায় ব্যাংক এল সি খোলে। তার উপর নিজের সেবার পারিশ্রমিক, জামিন হওয়ার পারিশ্রমিক এবং ঋণ দিয়ে থাকলে তার উপর সুদও গ্রহণ করে (যেমন বিস্তারিত আলোচনা আগে গেছে)। শরয়ী বিধানের আলোকে জামিন হওয়ার পারিশ্রমিক এবং ঋণের উপর সুদ নেয়া জায়েয নেই। এখন এল সি-র বিকল্প দুটি জিনিস হতে পারে।

বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলোতে সাধারণভাবে এল সি-র লেনদেন মুরাবাহার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। সেটা এভাবে, যে বস্তু আমদানি করতে হবে ব্যাংক তাতে উকিল না হয়ে নিজে তা ক্রয় করে আমদানি করে এবং মুরাবাহার ভিত্তিতে আমদানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়। এল সি-র ফিস ইত্যাদি মুরাবাহার হারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। মুরাবাহার শর্তাদি রক্ষা করা হলে মৌলিকভাবে এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। তারপরও কার্যক্ষেত্রে এ পদ্ধতি পছন্দনীয় বলে মনে হয় না। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এক হল, এ পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে

---

[১]. পরিমিত পারিশ্রমিক হল, যে ধরনের শ্রমের যতটুকু বিনিময় প্রদান করা হবে তার স্বাভাবিক বাজার মূল্য।

www.pathagar.com

মুরাবাহার শর্তাদি পূরণ করা কঠিন হয়। কার্যত কোনো কোনো সময় অনেক শর্ত পূরণও হয় না। দ্বিতীয় কারণ হল, এখানে ব্যাংকের ঐ বস্তু ক্রয় করে মুরাবাহা করা কেবল একটি কৃত্রিম কার্যক্রম। কারণ, আমদানিকারক আগেই বিক্রেতার সাথে পুরো ব্যাপার নিষ্পত্তি করে থাকে। শুধু পণ্য আনার সময় ব্যাংক মাধ্যম হয়। সরকারি কাগজে এবং আইনগতভাবে আমদানিকারক (Importer) ব্যাংককে মনে করা হয় না; বরং আসল ক্রেতাকেই মনে করা হয়। বিদেশ থেকে যে বিক্রেতা মাল প্রেরণ করে সেও ব্যাংককে ক্রেতা মনে করে না। তৃতীয় কারণ হল, মুরাবাহা জায়েয হওয়ার জন্য জরুরি হচ্ছে, যে পণ্য আমাদানি করা হচ্ছে তা প্রথমে ব্যাংকের জামানতে আসতে হবে। অথচ কখনো তা হয় না। এসব কারণে এল সি-র লেনদেন মুরাবাহার ভিত্তিতে করা পছন্দনীয় নয়। তথাপি যদি মুরাবাহার শর্তাদি পালন করে সঠিক শরয়ী পন্থায় লেনদেন হয় তাহলে জায়েয হবে।

এল সি-র সঠিক বিকল্প হল, শিরকাত বা মুদারাবার ভিত্তিতে লেনদেন করা। যদি এল সি জিরো মার্জিনের উপর হয় তাহলে মুদারাবা হবে এবং ব্যাংক রাব্বুল মাল (মালের মালিক) ও ইম্পোর্টার মুদারিব (কারবারী) হবে। আর যদি এল সিধারীও কিছু টাকা খাটায় তাহলে হবে শিরকাত। মুশারাকা বা মুদারাবার প্রক্রিয়া হবে এমন, ব্যাংক আমদানিকারককে বলবে, মালের মূল্য আমরা পরিশোধ করে দেব এবং মাল বিক্রি করে যে মুনাফা হবে তা নির্ধারিত হারে বণ্টন করে নেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে এ পন্থাও বিবেচনা করা যেতে পারে, ব্যাংক একটি বিশেষ সময়ের জন্য মুশারাকার চুক্তি করবে। সে সময়ের মধ্যে যদি পণ্য বিক্রি হয়ে নগদ টাকা হাতে এসে যায় তাহলে লাভ ধার্যকৃত হারে বণ্টন করে নেবে। আর যদি পণ্য বাজারে বিক্রি না হয় তাহলে আমদানিকারক ব্যাংকের অংশ ক্রয় করে তার পাওনা পরিশোধ করে দেবে।

## রপ্তানির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম

রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের দুটি কার্যক্রম রয়েছে। এক হল, সে এক্সপোর্টারের ব্যাংক (Negotiating Bank) হিসেবে কতিপয় সেবা প্রদান করে। যেমন মাল রওয়ানা করে দেয়ার কাগজপত্র (Bill of

www.pathagar.com

Lading)[১] প্রেরণ করে, ইম্পোর্টার থেকে টাকা উসুল করে, এসব সেবার পারিশ্রমিক উসুল করে ইত্যাদি। এর মধ্যে শরয়ী কোনো আপত্তি নেই। কারণ, এসব কার্যক্রমের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয। ব্যাংকের দ্বিতীয় কার্যক্রম হল, রপ্তানিকারকের (Exporter) পণ্য ক্রয় করতে বা প্রস্তুত করাতে মূলধনের প্রয়োজন হয়, এ মূলধন ব্যাংক সরবরাহ করে। যাকে রপ্তানি বিনিয়োগ 'تمويل الصادرات' (Export Financing) বলে। 'রপ্তানি বিনিয়োগ' দুই প্রকার। দুটো পদ্ধতি বুঝে দুটিরই শরয়ী কর্মপন্থা পৃথক পৃথক বুঝতে হবে। বিনিয়োগের এক প্রকার হল, কোনো ব্যক্তির কাছে বিদেশ থেকে অর্ডার আছে, কিন্তু পণ্য ক্রয় করার এবং প্রস্তুত করার জন্য মূলধনের দরকার। এ উদ্দেশে ব্যাংক মূলধন বিনিয়োগ করে। তাকে পণ্যবহন পূর্ব বিনিয়োগ 'تمويل قبل الشحن' (Pre Shipment Financing) বলে। দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে, এক্সপোর্টার মাল ক্রয় করে বা প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু টাকা আসতে কিছু বিলম্ব হবে। এ সময়ের জন্য সে ব্যাংক থেকে এ পরিমাণ টাকা পেতে চায়। তাকে পণ্যবহন পরবর্তী বিনিয়োগ 'تمويل بعد الشحن' (Post Shipment Financing) বলে। সুদী ব্যবস্থায় এ দুই পন্থায় সুদের উপর ঋণ দেয়া হয়। এ দুই ধরনের বিনিয়োগের শরয়ী পদ্ধতি কি হবে? এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ 'পণ্যবহন পূর্ব বিনিয়োগ'-এর দুটি পদ্ধতি হতে পারে :

১. অনেক ইসলামী ব্যাংকে এ পদ্ধতি চালু রয়েছে, ব্যাংক এক্সপোর্টার থেকে ঐ মাল নিজে ক্রয় করে তাকে মূল্য পরিশোধ করে দেয়। রপ্তানিকারক তার আমদানিকারকের সাথে যে মূল্য ধার্য করে ব্যাংক তার থেকে কম মূল্যে মাল এক্সপোর্টার থেকে ক্রয় করে। আর এক্সপোর্টার যে মূল্য বিদেশী ক্রেতার সাথে ধার্য করেছিল সে দামের উপর নিজের পক্ষ থেকে মাল তার কাছে পাঠিয়ে দেয়, যার দ্বারা ব্যাংকের লাভ হয়ে যায়।

---

[১]. জাহাজে রপ্তানিদ্রব্য বোঝাই করার পর পণ্যের পরিমাণ, কোয়ালিটি, জাহাজভাড়া, জাহাজ ও জাহাজ কোম্পানির নাম, বন্দরের নাম, আমদানি ও রপ্তানিকারকের নাম ঠিকানা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত যে রসিদ জাহাজ কর্তৃপক্ষ রপ্তানিকারককে প্রদান করে, তাকে বহনপত্র (Bill of Lading) বলে।

www.pathagar.com

কিন্তু এ পদ্ধতিতে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। তা হল, এ পদ্ধতিতে বিক্রয়ের শরয়ী দাবি সাধারণত পূরণ হয় না। যেমন এখানে এক্সপোর্টার ব্যাংককে নির্ধারণ করা উচিৎ, কিন্তু ব্যাংক ঐ মাল ক্রয় করার পরও গ্রাহককেই (যে ব্যক্তি ব্যাংক থেকে মূলধন নিতে ইচ্ছুক) এক্সপোর্টার মনে করা হয়। আর এক্সপোর্টের সরকারি আনুকূল্য সে-ই পেয়ে থাকে। মাল আমদানিকারকও ব্যাংককে বিক্রেতা মনে করে না, গ্রাহককেই মনে করে। এমনকি মালে দোষ ইত্যাদির অভিযোগও সাধারণত গ্রাহকের উপরই হয়, ব্যাংকের উপর হয় না। এর দ্বারা বুঝা যায়, এ বিক্রয় কেবল একটি কৃত্রিম কার্যক্রম। যদি ত্রুটিগুলো দূর করে বাস্তবিকই বিক্রয়ের প্রকৃত অবস্থা পাওয়া যায় তাহলে এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

এখানে একটি আনুষঙ্গিক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায়ও মাল প্রেরণের কাগজপত্র (Bill of Lading) ইত্যাদি ব্যাংকের নামের উপরই তৈরি হয়। তার উপর (To The Order Of The Bank) লেখা থাকে। টাকা এবং কাগজপত্র উসুলও ব্যাংকই করে। এর দ্বারা এ ভুল ধারণা যেন সৃষ্টি না হয়, চুক্তির অধিকার ব্যাংকের দিকে ফিরে গেছে। কারণ, ব্যাংকের নাম এ কারণে লেখা হয় না যে, সে প্রকৃত চুক্তিকারী; বরং ব্যাংকের নাম কেবল দলিল হিসেবে লেখা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংক এবং গ্রাহকের লেনদেন পরিষ্কার না হবে ব্যাংক কাগজপত্র প্রদান করবে না।

২. এ বিনিয়োগের উত্তম পন্থা হল, ব্যাংক এবং এজেন্টের মধ্যে শিরকাত বা মুদারাবার চুক্তি করা। যদি এজেন্টও কিছু টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে হবে শিরকাত, আর যদি সে নিজের মূলধন না খাটায় তাহলে মুদারাবার চুক্তি হবে। এজেন্ট ব্যাংক থেকে মূলধন সংগ্রহ করে মাল ক্রয় বা প্রস্তুত করবে। তারপর বাইরে প্রেরণ করবে। যে লাভ হবে তা নিয়মানুযায়ী বণ্টিত হবে। এ পদ্ধতিতে মুশারাকা বা মুদারাবাও সহজ হবে। কারণ, এজেন্টের অন্য দেশের ক্রেতার (ইম্পোর্টার) সাথে চুক্তি হয়ে থাকে আগেই এবং মূল্যও ধার্য হয়ে যায়। অন্যদিকে মাল প্রস্তুতের খরচও আন্দাজ করা যায়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায়, এ কারবারের ফলে কত লাভ হবে। তবে এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হতে পারে। এজেন্ট পণ্যের প্রার্থিত কোয়ালিটির বিপরীত মাল প্রেরণ করলে দ্বিতীয় পক্ষ থেকে মাল গ্রহণ করা হবে না। এতে ব্যাংকেরও ক্ষতি হবে। এর সমাধান এভাবে

www.pathagar.com

হতে পারে, মুশারাকা বা মুদারাবা চুক্তির মধ্যে ব্যাংক প্রার্থিত কোয়ালিটির মাল প্রেরণ করার শর্তারোপ করবে। তারপরও যদি সে প্রার্থিত কোয়ালিটির বিপরীত মাল প্রেরণ করে তাহলে সে তার জন্য দায়ী হবে। ব্যাংক তার দায় বহন করবে না। কারণ শর্ত ভঙ্গের কারণে এটা এজেন্টের পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন হয়েছে। আর সীমালঙ্ঘনের অবস্থায় শরিক বা মুদারিবকে জামিন বানানো যেতে পারে।

'تمويل بعد الشحن' (Post Shipment Financing) পণ্যবহন পরবর্তী বিনিয়োগের পদ্ধতি 'বিল অব এক্সচেঞ্জ'-এর ডিসকাউন্টিং-এর মতই। এক্সপোর্টার মাল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন তার কাছে সে মালের বিল রয়েছে। এ বিল সে ব্যাংকের কাছে হস্তান্তর করে আর ব্যাংক তার মেয়াদপূর্তিকে (Maturity) সামনে রেখে তার মধ্যে বাট্টা করে বাকি টাকা এক্সপোর্টারকে প্রদান করে। আর মেয়াদপূর্তির (Maturity) তারিখ আসলে ব্যাংক এ টাকা ইম্পোর্টার থেকে উসুল করে নেয়। যেমন বিল অব একচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং-এর ব্যাখ্যা আমরা করেছি।

এখানে প্রথমে বিনিময় বিলের বাট্টাকরণের 'خصم الكمبيالة' (বিল অব এক্সচেঞ্জের ডিসকাউন্টিং) শরয়ী হুকুমের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে। ডিসকাউন্টিং-এর ফিকহী ভিত্তি হল, ঋণদাতা– যার হাতে বিল রয়েছে, সে ঋণ বাট্টা প্রদানকারীর (Discounter) কাছে হস্তান্তর করে। আর এ হস্তান্তর হয় ঋণ থেকে কমিয়ে, যা নাজায়েয। কারণ এটা বর্ধিত সুদ (রিবা ফাদল)। ডিসকাউন্টিং-এর এ কারবারকে ঋণ বিক্রয় 'بيع الدين' বলা যায় না। কারণ, বিক্রয় এবং হস্তান্তরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, বিক্রির পরে ঋণদাতা দায়মুক্ত হয়ে যায় এবং ঋণের সকল অধিকার সে ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করে যে ঋণ ক্রয় করে। আর হস্তান্তরের মধ্যে হস্তান্তরকারীই ঋণী থাকে। সে দায়মুক্ত হয় না। যদি হস্তান্তরকৃত ব্যক্তি ঋণ না পায় তাহলে সে হস্তান্তরকারীর কাছে দাবি করার অধিকার রাখে। বর্তমানে ডিসকাউন্টিং-এর মধ্যে এরূপই হয়ে থাকে যে, যদি বাট্টা প্রদানকারীর (Discounter) বিল পরিশোধ না হয় তাহলে সে আসল ঋণদাতার কাছে ফিরে আসে। সুতরাং এটা 'بيع الدين من غير من عليه الدين' (ঋণী ছাড়া ঋণ বিক্রি করা) নয়; বরং 'حوالة الدين بانقص من الدين' (ঋণ থেকে কমিয়ে ঋণ

www.pathagar.com

হস্তান্তর করা)।

এর বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে শুরুতে আমি প্রস্তাব পেশ করেছিলাম, এখানে দুটি পৃথক পৃথক লেনদেন করতে হবে। একটা হল, বিলে বাট্টা করার পর যত টাকা অবশিষ্ট থাকে তত টাকা ঋণ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় লেনদেন হল, তাকে ঋণ উসুলের উকিল বানিয়ে দিয়ে ওকালতির পারিশ্রমিক ধার্য করে দেবে। এখন ব্যাংক উকিল হিসেবে ঋণ উসুল করে তার মধ্যে থেকে নিজের পারিশ্রমিক উসুল করে নিবে এবং বাকি টাকা ঋণ পরিশোধ হিসেবে নিয়ে নেবে। যেমন একশ টাকার বিল হলে ব্যাংক নব্বই টাকা ঋণ প্রদান করবে। আর ব্যাংককে বিল উসুলের উকিল বানিয়ে দেয়া হবে, যার পারিশ্রমিক হবে দশ টাকা। এখন ব্যাংক তারিখ আসার পর একশ টাকা উসুল করে তার মধ্যে থেকে দশ টাকা তার পারিশ্রমিক রেখে দেবে। আর নব্বই টাকা ঋণ উসুল হিসেবে নিয়ে নেবে, কিন্তু এ প্রস্তাবে দুটি বিষয় বিবেচ্য। এক হল, সাধারণত ওকালতির পারিশ্রমিক বিলের টাকার পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। বিলের টাকা বেশি হলে পারিশ্রমিকও বেশি হবে এবং টাকা কম হলে পারিশ্রমিকও কম হবে। দ্বিতীয় হল, পারিশ্রমিককে সময়ের সাথেও সংশ্লিষ্ট করতে হবে। বিলের মেয়াদপূর্তি দীর্ঘ দিন পর হলে পারিশ্রমিক বেশি হবে আর মেয়াদপূর্তি অল্প দিনের মধ্যে হলে পারিশ্রমিক কম হবে। এখন এখানে বিবেচনার বিষয় হল, পারিশ্রমিককে টাকার পরিমাণ এবং মেয়াদপূর্তির সাথে সংশ্লিষ্ট করা সঠিক কিনা? পারিশ্রমিককে টাকার অংকের সাথে সংশ্লিষ্ট করার বৈধতা আছে বলে বুঝা যায়। তার কারণ হল, দালালির 'سمسرة' পারিশ্রমিককে অর্থের সাথে যুক্ত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু আল্লামা শামী রাহ. জায়েয হওয়ার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১] অর্থাৎ দালালের অধিক দামি বস্তু বিক্রি করলে বেশি পারিশ্রমিক নেয়া এবং কম দামি বস্তুর দালালি করলে কম পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয আছে। তার কারণ হিসেবে আল্লামা শামী রাহ. যা লিখেছেন তার সারকথা হল, যদিও এখানে অর্থ কম বা বেশি হওয়ার কারণে দালালের পরিশ্রম এবং কাজ সমান, কিন্তু পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে শুধু কাজ এবং পরিশ্রম বিবেচনা করা হয় না; বরং

---

১. الدر المختار ج ٦ ص٦٣ باب الاجارة الفاسدة.

www.pathagar.com

পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতে কাজের মান এবং প্রকৃতিরও প্রভাব থাকে। কম দামি বস্তুর দালালির মান কম আর বেশি দামি বস্তুর মান হয় বেশি। সুতরাং এর ভিত্তিতে পারিশ্রমিকও কম বেশি হতে পারে।[১] এর উপর কিয়াস করে ওকালতির পারিশ্রমিককে টাকার পরিমাণের সাথে সংশ্লিষ্ট করার অবকাশ আছে বলে মনে হয়, কিন্তু পারিশ্রমিককে মেয়াদ বা সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করার কোনো বৈধতা বুঝে আসে না। কারণ, এটা 'عينة'-এর অনুরূপ। বিনা সুদে ঋণ দিয়ে ঋণের মেয়াদ হিসেবে ওকালতির পারিশ্রমিক উসুল করে নেয়া। অর্থাৎ যে সুদ ঋণের উপর গ্রহণ করা যায় নি তা ওকালতির পারিশ্রমিক বাড়িয়ে উসুল করে নেয়া। এ কারণে এ প্রস্তাবটি পছন্দনীয় নয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্যবহন পরবর্তী বিনিয়োগের 'تمويل بعد الشحن' কোনো নির্মল শরয়ী পন্থা সামনে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের বিনিয়োগ বন্ধই রাখতে হবে। আর যাবতীয় লেনদেন পণ্যবহন পূর্ব বিনিয়োগের 'تمويل قبل الشحن' (Pre Shipment Financing) ভিত্তিতেই করতে হবে। যদি এক্সপোর্টের মূল্য পাওয়ার আগে এক্সপোর্টারের টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে সে ব্যাংকের সাথে কোনো নতুন মুশারাকা বা মুদারাবা বা মুরাবাহা করতে পারে।

## 'اعادة تمويل الصادرات'-এর হুকুম

আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কার্যক্রম বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে, 'এস্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য একটি স্কিম চালু করেছে, একে Export Refinancing Scheme, আরবীতে 'اعادة تمويل الصادرات' বলে। এ স্কিমের দুটি পন্থার ব্যাখ্যাও সেখানে দেয়া হয়েছে। এখানে তার শরয়ী হুকুমের উপর আলোচনা করা হচ্ছে।

এ স্কিমের প্রথম পদ্ধতিটা ছিল, 'এস্টেট ব্যাংক' বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণ প্রদান করত এবং তার উপর পাঁচ শতাংশ সুদ নিত। এটা সুদ হওয়ার ব্যাপারে ভাবনারও প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এ পদ্ধতি রহিত করে যে নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, তাতে 'এস্টেট ব্যাংক' বাণিজ্যিক ব্যাংককে

---

১. الدر المختار كتاب الاجارة، مسائل شتى ج٦ ص٩٢ ايس ايم سعيد كمپنى.

www.pathagar.com

নিয়মতান্ত্রিক ঋণ প্রদান করে না; বরং তার নামে একাউন্ট খুলে দেয়। যার মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের টাকা উত্তোলনের অধিকার থাকে না। এটা মূলত ঋণের লেনদেন নয়; বরং শুধু একটি কাগুজে কার্যক্রম (তামাশা)। এর উপর 'এস্টেট ব্যাংক' ট্রেজারি বিল হিসেবে যে টাকা বাণিজ্যিক ব্যাংককে দেয় তার উপরও আপত্তি নেই। কারণ, এটা এস্টেট ব্যাংকের পক্ষ থেকে রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে পুরস্কার হিসেবে গণ্য। কোনো লেনদেনের ফলাফল হিসেবে নয়। তবে এস্টেট ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে পাঁচ শতাংশ নিয়ে এ লাভ প্রদান করে যা সাধারণত ১৩ বা ১৪ শতাংশ হয়। এর মধ্যে রিবা ফাদল (বর্ধিত সুদ)-এর সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং যদি এস্টেট বাংক পাঁচ শতাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে নেয়া ছেড়ে দেয় তার বিনিময়ে সে ঐ লাভের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, যা সে নিজে দিচ্ছে, যেমন ১৩ শতাংশের স্থলে ৮ শতাংশ করে দেয় তাহলে তার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। সবচেয়ে নির্মল পন্থা হল, যেহেতু এস্টেট ব্যাংকের আসল উদ্দেশ্য রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য ব্যাংকগুলোকে ভর্তুকি (Subsidy) দেয়া, যাতে তারা কম লাভ রেখে রপ্তানির জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করে। সুতরাং এর জন্য সে সরাসরি সাহায্য প্রদান করবে।

## ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরয়ী হুকুম

এর আগে ব্যাংক বহির্ভূত ঋণদান প্রতিষ্ঠানের (Non Banking Financial Institutions- N.B.F.I) 'المؤسسات المالية غير المصرفية' এবং তার প্রকারসমূহের কিছুটা পরিচয় দেয়া হয়েছে। বর্তমানে এসবের মধ্যে অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানই সুদী। তার মৌলিক কাজই হল মূলধন বিনিয়োগ। সুতরাং তাকে শরয়ী মূলনীতির উপর পরিচালিত করার পদ্ধতিও তাই হবে যা ব্যাংকের ব্যাপারে পেশ করা হয়েছে। তবে এখানে চারটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা দরকার যাকে 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' সর্বপ্রথম সুদ থেকে মুক্ত করার জন্য নির্বাচিত করেছিল। সে প্রতিষ্ঠান চারটি হচ্ছেঃ

১. N.I.T ২. I.C.P ৩. H.B.F.C ৪. স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ফাইনান্স

www.pathagar.com

করপোরেশন[১]। এগুলোকে সুদ থেকে মুক্ত করা সহজ। এ কারণে 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' সর্বপ্রথম এগুলোর ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেছিল। এখানে তার সারাংশ পেশ করা হল :

১. N.I.T: প্রথমে বলা হয়েছে, এ প্রতিষ্ঠান (ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট) দশ টাকার নামিক মূল্যের (Face Value) ইউনিট চালু করে। মানুষ ইউনিট নিয়ে তার টাকা জমা দেয়। এ টাকা দিয়ে যে ফান্ড তৈরি হয় তার দ্বারা পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় এবং লভ্যাংশ (Dividend) আকারে ইউনিট-হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এ ব্যবস্থার উপর চিন্তা করা হলে দুটি আপত্তিযোগ্য বিষয় সামনে আসে। এক হল, N.I.T-এর বেশির ভাগ পুঁজি বিনিয়োগ শেয়ারের মধ্যে হয় এবং একারণে সব ধরনের কোম্পানির শেয়ার গ্রহণ করা হত। ব্যাংক ও সুদী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং এরূপ কোম্পানির শেয়ারও গ্রহণ করা হত যার মৌলিক কারবারই হারাম। এটা বন্ধ করার জন্য N.I.T-কে বাধ্য করা হয়েছে, নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সুদী এবং হারাম কারবারী প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানির শেয়ার নিতে পারবে না। দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, N.I.T-এর ইউনিট-হোল্ডারদের আস্থা আনয়নের জন্য সরকার একথার জামানত দিয়েছিল, যদি লোকসান হয় তাহলে সরকার পরিশোধ করবে; বরং লাভ না হলেও আড়াই শতাংশ পর্যন্ত লাভও সরকার প্রদান করবে। অথচ সরকার নিজেও N.I.T-তে শরিকও ছিল। এক শরিক অন্য শরিকের জন্য লোকসানের জামিন হওয়া বা লাভের জিম্মাদার হওয়া জায়েয নেই। এ সমস্যা সমাধানকল্পে এ প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছিল, সরকার N.I.T থেকে নিজের অংশ প্রত্যাহার করে নেবে। তাহলে আর এটা শরিকের জামানত হবে না; বরং তৃতীয় পক্ষের জামানত হবে। সুতরাং এ বিষয়টি বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, লাভ না হওয়ার অবস্থায় তৃতীয় পক্ষের আড়াই শতাংশ লাভ এবং লোকসানের অবস্থায় লোকসানের জামিন হওয়া সঠিক কিনা? হানাফী ফিকাহ অনুসারে এর অবকাশ নেই। তার দুটি কারণ রয়েছে :

১. এমন হকের কাফালত শুদ্ধ হবে যা নিজে অত্যাবশ্যক ও

---

[১]. এগুলো পাকিস্তান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ভিন্ন এবং পুরোপুরি সুদী। -অনুবাদক।

www.pathagar.com

জামানতযোগ্য হয়। এ কারণে 'وديعت' এবং 'عاريت'-এর কাফালত শুদ্ধ হয় না। শিরকাত ও মুদারাবায় মূলধন জামানতযোগ্য হয় না। সুতরাং তার লোকসানের কাফালত অত্যাবশ্যক ও কার্যকর হবে না। এটা কেবল একটা প্রতিশ্রুতি হবে যা আইনগতভাবে অত্যাবশ্যক হবে না।

২. হিদায়া ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে 'ضمان الخسران باطل'। যার সারকথা হল, কোনো ব্যক্তি কাউকে বলল, তুমি এ চুক্তি বা কারবার কর, যদি তাতে লোকসান হয় তাহলে আমি তার জামিন হব। এ জামানত বাতিল হবে, কার্যকর হবে না। তবে মালেকী মাযহাব অনুসারীদের মতে তৃতীয় পক্ষের এ জামানত আইনগতভাবে অত্যাবশ্যক হতে পারে। তা এভাবে, মালেকী মাযহাব মতে, যে প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রতিশ্রুতি প্রদত্তকে কোনো ব্যয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয় বা তাকে কোনো কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়, তা আইনগতভাবেও অত্যাবশ্যক হয়ে যায়। এর আলোকে বলা যায়, এখানে সরকার তৃতীয় পক্ষ হিসেবে আড়াই শতাংশ লাভ এবং লোকসান না হওয়ার জামানত দিয়ে মানুষকে N.I.T-তে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এ কারণে, এ জামানত আইনগতভাবেও কার্যকর হবে।[২] সুতরাং তৃতীয় পক্ষের জামানতকে কার্যকর ঘোষণা করে সরকারের অংশ N.I.T থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে আর এ জামানত কার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে N.I.T-এর প্রচারিত বিজ্ঞাপনসমূহে লেখা থাকে, আড়াই শতাংশ লাভ নিশ্চিত।

সুতরাং এ প্রস্তাবের আলোকে সরকারের পক্ষ থেকে বিধান চালু

---

[২]. কিছু উলামায়ে কিরাম হানাফী ফিকাহের 'ضمان خطر الطريق'-এর আংশিকতার আলোকে হানাফীদের মতেও এ জামানতকে অত্যাবশ্যক বলেছেন। তার সারকথা হল, কেউ অন্য একজনকে বলল, 'اسلك هذا الطريق فانه امن فان هلك مالك فعلي' (এ পথে চল, কারণ এটা নিরাপদ। যদি তোমার মাল নষ্ট হয় তাহলে আমার উপর তার দায়)। তার বলার পর সে ঐ রাস্তার উপর চলল এবং তার মাল ক্ষতিগ্রস্থ হল, তাহলে সে তার জামিন হবে। -(شامي ص ١٧٠ ج ٤ كتاب الجهاد)

এখানে এ জামানত মৌলিকভাবে সে ব্যক্তির উপর অত্যাবশ্যক ছিল না। শুধু এ অঙ্গীকারের কারণে অত্যাবশ্যক হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানেও তৃতীয় পক্ষের অঙ্গীকারের কারণে এ জামানত অত্যাবশ্যক সাব্যস্ত করা যায়, কিন্তু এ কিয়াস সঠিক মনে হয় না। কারণ 'ضمان خطر الطريق' অত্যাবশ্যক হওয়ার কারণ হল ধোঁকা। এ রাস্তায় কোনো ক্ষতি হবে না- এটা বলে সে ধোঁকা দিয়েছে, কিন্তু আলোচ্য অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে ধোঁকা নেই। কারণ, সরকারের জামানতের অর্থ এ নয়, N.I.T-তে লোকসান হবেই না। সরকারের উদ্দেশ্য তো শুধু পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া।

www.pathagar.com

হয়েছে এবং প্রথমে N.I.T সে অনুযায়ী কাজও করেছে, কিন্তু কার্যক্রমের ধারাবাহিক তত্ত্বাবধান না থাকার কারণে N.I.T-এর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। এ কারণে ব্যবস্থাপনা পুনরায় শরীয়ত পরিপন্থী হয়ে গেছে। পরিবর্তন এসেছে এরূপ, N.I.T-এর কাছে পুঁজি জমা হয়েছে অনেক। শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত মনে করা হয়েছে। তখন N.I.T আরো কয়েক পদ্ধতিতে পুঁজি বিনিয়োগ আরম্ভ করে দিয়েছে। সেসব পদ্ধতি শরয়ীভাবে নাজায়েয। যেমন-

১. মার্ক আপের উপর কারবার শুরু করে দিয়েছে এবং ব্যাংকে প্রচলিত মার্ক আপের শরীয়ত পরিপন্থী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২. ব্যাংকের ন্যায় ইজারা শুরু করে দিয়েছে, যাতে আগে উল্লিখিত শরয়ী ত্রুটিগুলো রয়ে গেছে।

৩. P.T.C-এর নাজায়েয রূপ অবলম্বন করা হয়েছে। পি টি সির মূল তত্ত্ব এবং তার প্রেক্ষাপট বুঝাও এখানে জরুরি।

'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' অর্থনীতিকে সুদ থেকে মুক্ত করার যে প্রস্তাবগুলো পেশ করেছিল, তাতে P.T.C-এর প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সারকথা হল, প্রথমে বলা হয়েছে, কোম্পানিকেও মূলধন সংস্থানের জন্য কখনো বন্ড চালু করতে হয় যা সুদ। তার বিকল্প পেশ করা হয়েছিল, কোম্পানি মুদারাবার সনদাদি চালু করবে। যার নাম হবে পর্টিচিপেশন টার্ম সার্টিফিকেট (Participation Term Certificate)। এটা এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মুদারাবার সর্টিফিকেট হবে। যে ব্যক্তি এ সার্টিফিকেট লাভ করবে সে এ নির্ধারিত মেয়াদকালে কোম্পানির সম্পত্তিতে শরিক হয়ে যাবে। প্রয়োজনের সময় সে তার নিজের অংশ বিক্রিও করতে পারবে। এ প্রস্তাব পরবর্তীতে কোম্পানি আইনের অংশ হয়ে গেছে। কিছুসংখ্যক কোম্পানি পি টি সি জারি করেছে। এন আই টিও চালু করা শুরু করেছে, কিন্তু তাতে জটিল ধরনের পরিবর্তন করে জারি করা হয়েছে। যার কারণে এটি নাজায়েয রূপ ধারণ করেছে।

৪. দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের জন্য টি এফ সি চালু, অর্থাৎ পি টি সির অনুরূপ সনদাদি জারি করা হয়েছে। যার নাম টার্ম ফাইন্যান্স সার্টিফিকেট (Term Finance Certificate) ছিল।

তার পরে এন আই টির কারবারে পুনরায় কিছু সংশোধন হয়। তার

www.pathagar.com

মধ্যে মুরাবাহা এবং ইজারার চুক্তি (Agreements) ঠিক করে দেয়া হয়েছে। পি টি সি রহিত করে দেয়া হয়েছে এবং টি এফ সিকে মুরাবাহায় পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। তবে এখনো এন আই টির দুটি পন্থা নাজায়েয। একটি হল, ব্যাংকের 'পি এল এস' একাউন্টে অর্থ রাখা হয়, যার সুদ হয়। দ্বিতীয় হল, 'পি টি সি' ভবিষ্যতের জন্য রহিত করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আগে থেকে যা চলছিল তার কতগুলোর মেয়াদপূর্তি (Maturity) হয় নি। এ কারণে ফরমের মধ্যে এ অংশ রেখে দেয়া হয়েছে, 'আমি পি এল এস এবং পি টি সির আয় নিতে চাই না।' ফরমে এটা লেখার পর 'এন আই টি' ইউনিট নেয়ার অবকাশ তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো কার্যত কাজ সঠিক হওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত ধারাবাহিক তত্ত্বাবধানের কোনো ব্যবস্থা না থাকবে।

**২. 'ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব পাকিস্তান' (I.C.P) :** এর পরিচয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পুঁজি বিনিয়োগ শুধু কোম্পানির শেয়ারের মধ্যে হয়। আইনগতভাবে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল, যে কারবার মৌলিকভাবে জায়েয সেসব কোম্পানির শেয়ার নেবে, কিন্তু কার্যত তা হচ্ছে কিনা, তাদের ব্যালেন্স শীট ইত্যাদি দেখে হুকুম বর্ণনা করতে হবে।

**৩. স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ফাইন্যান্স করপোরেশন :** এ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পকে পুঁজি সরবরাহ করার জন্য গঠন করা হয়েছিল। প্রথমে সুদের উপর ঋণ প্রদান করত। তারপর 'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগের সুপারিশ করে।

**৪. হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন (H.B.F.C) :** এ প্রতিষ্ঠান 'হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সিং' অর্থাৎ গৃহ নির্মাণ বা ক্রয় করার জন্য পুঁজি সরবরাহ করত। পাশ্চাত্য ধাঁচের প্রতিষ্ঠান তো এ উদ্দেশে সুদের উপর ঋণ দান করে এবং বাড়ি রেহেন রেখে দেয়।

'ইসলামী নযরিয়াতী কাউন্সিল' হাউস ফাইন্যান্সিং-এর জন্য যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা ছিল একটি নতুন ধরনের চুক্তি, যাকে ক্রমহ্রাসমান মালিকানা 'شركت متناقصة' (Decreasing Partnership) বলে। এর সারকথা হল, বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক (Client) অর্থাৎ গৃহ

www.pathagar.com

নির্মাণে ইচ্ছুক ব্যক্তির যৌথ পুঁজি দ্বারা গৃহ ক্রয় বা নির্মাণ করা হবে। উভয়ের নিজ নিজ পুঁজি অনুপাতে গৃহের শরিক মালিকানা 'شركت ملك' হবে। যেমন ২৫ ভাগ মূলধন গ্রাহকের এবং ৭৫ ভাগ প্রতিষ্ঠানের হলে গৃহ উভয়ের মাঝে চার অংশে যৌথ হবে। এক চতুর্থাংশ হবে গ্রাহকের এবং তিন চতুর্থাংশ প্রতিষ্ঠানের। গৃহ নির্মাণ হয়ে যাওয়ার পর গ্রাহক করপোরেশনের অংশে ভাড়াটে হিসেবে থাকবে এবং করপোরেশনকে ভাড়া পরিশোধ করবে। সে সাথে বিভিন্ন দফায় করপোরেশনের অংশ অল্প অল্প করে ক্রয়ও করতে থাকবে। এ উদ্দেশে করপোরেশনের অংশকে কয়েকটি ইউনিট বানানো যেতে পারে। যেমন করপোরেশনের অংশ দশ ইউনিটে ক্রয় করা হবে। ক্রয় করার ফলে করপোরেশনের যে অংশ কমতে থাকবে সে অনুপাতে ভাড়াও কমতে থাকবে। যখন গ্রাহক করপোরেশনের সকল অংশ ক্রয় করে নেবে তখন করপোরেশনের মালিকানা শেষ হয়ে গ্রাহক পুরো বাড়ির মালিক হয়ে যাবে। এখন ভাড়াও দেয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এখানে তিনটি আকদ (চুক্তি) হয়েছে– ১. যৌথ মালিকানা ২. ভাড়া ৩. বিক্রয়। এ তিনটি আকদ কোনো ধরনের পূর্ব শর্ত ছাড়া পৃথক পৃথক হলে তা জায়েয হবার ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কার্যত এখানে এক চুক্তিতে তিন আকদ একটা অপরটার সাথে শর্তযুক্ত বা শর্তযুক্তের মতো হবে। আর এভাবে চুক্তি ছাড়া উপায়ও নেই। এ অবস্থা ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিবেচ্য। এখানে বুঝা দরকার, এক আকদের পিঠে অন্য আকদের শর্তারোপ করা তখন নাজায়েয যখন এক আকদের ভিত্তিতে অন্য আকদের শর্তারোপ করা হয়, কিন্তু অবস্থা যদি এরূপ হয়, একবারে কতগুলো আকদের একত্রে এমনভাবে চুক্তিবদ্ধ করা হয় যে, বর্তমানে কোনো আকদ (চুক্তি) সম্পাদন হচ্ছে না। বর্তমানে শুধু তা সম্পাদিত হওয়ার চুক্তি করা হচ্ছে। তারপর সে আকদগুলো স্ব-স্ব স্থানে এবং স্ব-স্ব সময়ে সম্পাদিত হবে। তারপর যখন তা থেকে কোনো আকদ কার্যকর হতে থাকবে তখন অন্য আকদের কোনো শর্ত থাকবে না। এ অবস্থায় 'صفقة فى صفقة' (চুক্তির মধ্যে চুক্তি) অথবা 'بيع و شرط' (শর্তযুক্ত বিক্রি)-এর হুকুম চালু হবে না। এর নজির হল, 'بيع بالوفاء', এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ আছে। বিশুদ্ধ অভিমত হল, 'وفاء'-এর শর্ত বিক্রয়চুক্তির পিঠে হলে জায়েয হবে না। আর যদি বিক্রয় শর্তমুক্ত হয়

www.pathagar.com

এবং 'وفاء' এর বিক্রয়চুক্তি পৃথকভাবে করা হয় তাহলে জায়েয হবে। আর অঙ্গীকার পূরণ আইনগতভাবেও অত্যাবশ্যক হবে। বিক্রির পর 'ওফার' বৈধতা অনেক ফকীহ লেখেছেন। বিক্রির পূর্বে 'وفاء' বা অঙ্গীকার পূরণের কার্যকারিতাও 'جامع الفصولين' গ্রন্থে সুস্পষ্ট ব্যক্ত রয়েছে।[১] এ দ্বারা বুঝা গেল, এক আকদের পিঠে অন্য আকদের শর্ত আরোপ করা জায়েয নেই। তবে আকদের পূর্বে অথবা পরে অন্য আকদের চুক্তি করা জায়েয আছে। শর্তারোপ এবং অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য হল, আকদের পিঠে শর্ত আরোপ করায় বিক্রি সম্পাদনই দ্বিতীয় আকদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় আকদ হয় তাহলে বিক্রয় সম্পাদন হবে নইলে সম্পাদন হবে না। আর বিক্রয় এমন আকদ যা সংযুক্তি গ্রহণ করে না। পৃথকভাবে অঙ্গীকার করার অবস্থায় বিক্রয়ের সংযুক্তি অত্যাবশ্যক হয় না। এ ব্যাখ্যার আলোকে 'شركت متناقصة' (ক্রম হ্রাসমান অংশীদারিত্ব)-এর বৈধতা আছে বলে বুঝা যায়। কারণ, প্রথমে একবারে তিন আকদের চুক্তি হয়ে যায়। তারপর কোনো শর্ত ছাড়াই প্রত্যেক আকদ স্ব-স্ব সময়ে হতে থাকে। সুতরাং আলোচ্য প্রস্তাব অনুসারে যদি 'হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স'-এর সাথে চুক্তি করা হয় তাহলে জায়েয হবে, কিন্তু এখানেও ধারাবাহিক তত্ত্বাবধানের অভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যত বহু ধরনের দোষত্রুটি সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন এ মুহূর্তে যেভাবে কাজ করছে তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কয়েকটি ত্রুটি বিদ্যমান।

হাউস ফাইন্যান্সিংকে আরবিতে 'التمويل العقارى' বলে। এ বিষয়ে অধমের একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে যা আমার 'بحوث فى قضايا فقهية معاصرة' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

কানাডায় 'হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্সিং'-এর জন্য একটি 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মানুষ তার সদস্য হয় এবং সদস্যগণই সোসাইটি থেকে মূলধন সংগ্রহ করে গৃহ ক্রয় বা নির্মাণ করে। এর লাভ হল, সোসাইটির মুনাফা পুনরায় সদস্যরাই পায় এবং সদস্যদেরই উপকার হয়।

---

[১] جلد اول ص٢٣٦ الفصل الثامن عشر.

www.pathagar.com

# বিমা

## (Insurance) تأمين

বিমাও আজকাল কারবারের একটা বিরাট অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় কোনো ব্যবসাই এর থেকে মুক্ত নয়। বিমা অর্থ হল, ভবিষ্যতে মানুষের যে বিপদ আসে কোনো মানুষ বা প্রতিষ্ঠান তার জামানত নেয়, অমুক প্রকার বিপদের আর্থিক ক্ষতি আমি পূরণ করে দেব। প্রসিদ্ধ হল, চতুর্দশ শতাব্দীতে এর সূচনা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে পণ্য-সামগ্রী সামুদ্রিক জাহাজে প্রেরণ করা হত। সামুদ্রিক জাহাজ কখনো ডুবে যেত এবং মালের ক্ষয়-ক্ষতি হত। সামুদ্রিক জাহাজের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রথমে বিমার প্রচলন হয়। আল্লামা শামী রাহ.ও 'مستامن'-এর বিধান বর্ণনায় 'سوكرة' নামে এর আলোচনা করেছেন।[১] যে দুর্ঘটনার বিপরীতে বিমা করা হয় সে দুর্ঘটনা হিসেবে বিমা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত।

১. 'تامين الاشياء' (Good Insurance) :[২] এর প্রক্রিয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো পণ্যের বিমা করতে চায় সে নির্দিষ্ট হারে বিমা কোম্পানিকে ফিস পরিশোধ করতে থাকে। যাকে 'প্রিমিয়াম' (Premium) বলে। আর যেহেতু প্রিমিয়াম অধিকাংশ কিস্তিওয়ারি পরিশোধ করা হয়, এ কারণে তাকে আরবিতে 'قسط' বলে। এ পণ্য দুর্ঘটনা কবলিত হলে কোম্পানি তার আর্থিক ক্ষতিপূরণ করে দেয়। আর যে পণ্যের বিমা করা হয় যদি তা কোনো দুর্ঘটনা কবলিত না হয় তাহলে বিমা গ্রহীতা যে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে তা ফেরত পায় না। তবে দুর্ঘটনা কবলিত অবস্থায় বিমার টাকা বিমা গ্রহীতা পেয়ে যায়। যা দ্বারা সে তার ক্ষতিপূরণ করে নেয়। জাহাজের বিমা, গাড়ির বিমা, বাড়ির বিমা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

২. 'تامين المسؤلية':[৩] এর সারকথা হল, কারো উপর ভবিষ্যতে কোনো

---

[১]. رد المحتار ٤: ١٧٠ ايس، ايم، سعيد كمپنى.

[২]. বাংলায় একে সম্পত্তি বিমা বলে। দুর্ঘটনা ও ঝুঁকি থেকে সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য এ বিমা করা হয়। বিমা গ্রহীতাকে প্রিমিয়ামের অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে হয় এবং বিমাচুক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়। নৌ-বিমা, অগ্নি-বিমা, যানবাহন-বিমা প্রভৃতি সম্পত্তি বিমার প্রকার।

[৩]. একে দায় বিমা বা তৃতীয় পক্ষ বিমা বলে। যেখানে বিমা গ্রহীতা কোনো তৃতীয় পক্ষকে সুবিধা দেয়ার জন্য বিমাকারীর সাথে চুক্তি করে। কর্মচারী বিমা মটর বিমা, ইত্যাদি এ শ্রেণীর বিমা।

www.pathagar.com

দায়িত্ব আসতে পারে, এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য বিমা করা হয়। যেমন গাড়ি রাস্তায় নামানোর কারণে দুর্ঘটনার ফলে অন্যের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। এ অবস্থায় গাড়ি চালকের উপর আর্থিক ক্ষতিপূরণ অত্যাবশক হবে। তাই এর বিমা করা হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটলে বিমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে। একে সাধারণত থার্ড পার্টি ইনস্যুরেন্স (Third Party Insurance) বলে। আমাদের দেশে গাড়ি রাস্তায় নামানোর জন্য এ ইনস্যুরেন্স আইনগতভাবে জরুরি। কোনো কোনো পাশ্চাত্য দেশে এমন হয়, কোনো ব্যক্তি নিজ গৃহের সামনে থেকে বরফ পরিষ্কার না করার ফলে কোনো লোকের বরফে পা ফসকে গেল, যার কারণে তার শারীরিক ক্ষতি হল। তাহলে সে গৃহমালিকের বিরুদ্ধে মামলা করে তার থেকে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করে। এ আশঙ্কা থেকে বাঁচার জন্যও বাড়ির মালিক বিমা করে। এটাও 'تأمين المسؤلية' এর একটি রূপ। এ প্রকার বিমায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়োজন হলে বিমা কোম্পানি তা আদায় করে।

৩. 'تأمين الحياة' : যাকে জীবনবিমা (Life Insurance) বলে। এর অর্থ হল, কোম্পানি বিমা গ্রহীতার সাথে চুক্তি করে, যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিমা গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে তাহলে বিমা কোম্পানি ধার্যকৃত টাকা তার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করবে। এর অনেক প্রকার হয়ে থাকে। কোনো কোনো প্রকারে সময় নির্দিষ্ট থাকে। সে সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে বিমার টাকা উত্তরাধিকারীরা পাবে। যদি এ সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ না করে তাহলে মেয়াদ শেষ হওয়ার দ্বারা বিমা শেষ হয়ে যায় আর সুদসহ টাকা ফেরত পায়। আবার কোনো প্রকারে মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে না। যখনই মৃত্যুবরণ করবে উত্তরাধিকারীরা বিমার অর্থ পাবে।

'تأمين الاشياء' এবং 'تأمين الحياة'-এর মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, 'تأمين الاشياء'-এর ক্ষেত্রে যদি দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে যে কিস্তি (প্রিমিয়াম) আদায় করা হয়েছিল সে টাকা ফেরত পাওয়া যায় না। আর 'تأمين الحياة'-এর মধ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিতর মৃত্যুবরণ না করলে প্রদত্ত টাকা সুদসহ পাওয়া যায়।

বিমার কর্মপদ্ধতি এবং গঠনপ্রণালী হিসেবে এর আরও তিনটি প্রকার আছে :

www.pathagar.com

১. 'التأمين الاجتماعى' : এ প্রকার বিমায় সরকার এমন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে যাতে একটা মানব সমষ্টির কোনো ক্ষতিপূরণ বা কোনো উপকার লাভ সহজ হয়, তাকে 'গ্রুপ ইনস্যুরেন্স' বলে। যেমন কর্মচারীদের বেতন থেকে প্রত্যেক মাসে সামান্য টাকা কেটে তা এক ফান্ডে জমা করা হয়। তারপর কর্মচারীর মৃত্যু বা সে কোনো দুর্ঘটনা কবলিত হলে মোটা অংকের টাকা তার উত্তরাধিকারী বা স্বয়ং কর্মচারীকে প্রদান করা হয়। এর বহু প্রকার রয়েছে। এসবের উপর সামগ্রিক হুকুম দেওয়া কঠিন। প্রত্যেক ধরনের হুকুম হবে পৃথক।

২. 'التأمين التبادلى' বা 'التأمين التعاونى' : একে ইংরেজিতে Mutual Insurance, বাংলায় সহযোগিতা বিমা বলে। তার সারকথা হল, যে লোকদের বিপদাশঙ্কা একই ধরনের হয় তারা পরস্পর মিলিত হয়ে একটি ফান্ড গঠন করে। আর স্থির করে, আমাদের কারো কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এ ফান্ড থেকে তার ক্ষতিপূরণ করা হবে। এ ফান্ডে কেবল সদস্যদের টাকা থাকে। ক্ষতিপূরণ প্রদানও শুধু সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বছরের পর হিসাব করা হয়। যদি পরিশোধিত বিনিময় ফান্ডের টাকা থেকে বেড়ে যায় তাহলে সে অনুপাতে সদস্যদের থেকে অতিরিক্ত টাকা উসুল করা হয়। আর যদি ফান্ডের টাকা বেঁচে যায় তাহলে সদস্যদের ফিরিয়ে দেয়া হয়। অথবা তাদের পক্ষ থেকে আগামী বছরের জন্য ফান্ডে অংশ অনুযায়ী জমা রেখে দেয়া হয়।

প্রথমে বিমার এ রূপই চালু হয়েছিল। শরয়ীভাবে এতে কোনো আপত্তি নেই। যে সব আলেম বিমার উপর আলোচনা করেছেন তারা এর জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত।

৩. 'التأمين التجارى' বা 'التأمين بقسط ثابت' : একে ইংরেজিতে Commercial Insurance বলে। এর প্রক্রিয়া হল, বিমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কোম্পানির উদ্দেশ্য হয় বিমাকে একটি ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা এবং এর মাধ্যমে মুনাফা উপার্জন করা। যেমন অন্যান্য কোম্পানি বিভিন্ন কারবারের মাধ্যমে মুনাফা উপার্জন করে। এ কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের বিমার স্কিম চালু করে। যে বিমা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তার সাথে বিমা কোম্পানির চুক্তি হয়, আপনি এত টাকার এত কিস্তি পরিশোধ

www.pathagar.com

করবেন, লোকসানের অবস্থায় কোম্পানি আপনার লোকসানের ক্ষতিপূরণ করবে। কোম্পানি কিস্তি নির্ধারণ করার জন্য হিসাব করে নেয়, যে দুর্ঘটনার বিপরীতে বিমা করা হচ্ছে তা কতবার হবার আশঙ্কা আছে। যাতে তার বিনিময় পরিশোধ করে কোম্পানির উদ্বৃত্ত লাভ থাকে। এ হিসাবের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা রয়েছে, যার পারদর্শীদের বলা হয় 'একচুয়ারি' (Actuary)।

এ ধরনের বিমার প্রচলনই বেশি। এরই শরয়ী হুকুম সমকালীন উলামায়ে কিরামের সর্বাধিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। এ সম্পর্কে আরব দেশীয় আলেমদের মধ্যে শায়খ আবু যুহরা এবং মুস্তফা আঝঝারকার ঘোর মতপার্থক্য রয়েছে। শায়খ আবু যুহরা আলোচ্য প্রস্তাবের বিমা হারামের প্রবক্তা ছিলেন। আর মুস্তফা ঝারকা এর জায়েযের প্রবক্তা ছিলেন। বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ার প্রায় সকল প্রসিদ্ধ আলেম এর হারামের প্রবক্তা। তবে প্রসিদ্ধদের শুধু দুজন আলেম এর জায়েয হওয়ার পক্ষে। একজন হলেন শায়খ মুস্তফা ঝারকা এবং অপরজন হলেন শায়খ আলী আল হাকীফ।

অধিকাংশের অভিমত হল, এ বিমায় জুয়া আছে এবং সুদও আছে। জুয়া হচ্ছে এ জন্য, একদিক থেকে দেয় নির্দিষ্ট এবং অন্যদিক থেকে দেয় অনির্দিষ্ট। যে কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে তার সমুদয় টাকা গচ্ছা যেতে পারে আবার তা থেকে বেশিও পাওয়া যেতে পারে। এর নামই জুয়া। আর সুদ হচ্ছে এভাবে, এখানে টাকা দিয়ে টাকার বিনিময় এবং এতে কমবেশি হচ্ছে। বিমা গ্রহীতার পক্ষ থেকে কম টাকা দেয়া হয় এবং সে বেশি টাকা পায়। তবে 'تامين الحياة' (জীবনবিমার) মধ্যে জুয়া হয় না। কারণ সেখানে টাকা নিশ্চিত ফেরত পাওয়া যায়, কিন্তু সুদ ও ধোঁকা আছে। সুদ তো সুস্পষ্ট। ধোঁকার অর্থ হল, আকদের রুকনের (মূল্য পণ্য বা মেয়াদ) মধ্যে কোনো বস্তুর অজ্ঞাত হওয়া অথবা কোনো অজ্ঞাত এবং অনির্দিষ্ট ঘটনার উপর নির্ভর হওয়া। এখানে ধোঁকা এভাবে হচ্ছে, কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে তা অজ্ঞাত। এমনও হতে পারে, যত টাকা দিয়েছিল সুদসহ সে টাকাই ফেরত পাওয়া যাবে। আবার এও হতে পারে, দুর্ঘটনা কবলিত হলে বেশি টাকা পাওয়া যাবে।

মুস্তফা ঝারকা এবং শায়খ আলী আল-হাকীফের দলিলের বিস্তারিত

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার সুযোগ এখানে নেই। তবে তাঁদের দলিলের সারাংশ পেশ করা হল। তাঁদের দলিলের সারাংশ হচ্ছে–

১. জুয়া এবং বিমার মধ্যে পার্থক্য আছে। জুয়া নিয়মতান্ত্রিক আকদ বা চুক্তি নয়। কেবল একটি খেলা ও প্রতারণা। আর বিমা একটি নিয়মতান্ত্রিক চুক্তি এবং প্রচেষ্টা। এর উত্তর হল, এ আকদের জুয়া সুদ ও ধোঁকা হওয়ার বিষয়টা আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি। জুয়ার জন্য খেলা বা প্রতারণা হওয়া জরুরি নয় । প্রচেষ্টা হয়েও জুয়ায় পরিণত হতে পারে।

২. এখানে দুর্ঘটনা কবলিত অবস্থায় কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধিত টাকা আকদকৃত বস্তু নয়; বরং বিমা করার ফলে লাভ হওয়া নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা আকদকৃত বস্তু। আর নিরাপত্তার বিনিময় প্রদান করা জায়েয। এর জন্য পাহারাদারের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, পাহারাদারের বেতন সে নিরাপত্তার বিনিময়। যা এ পাহারাদারের কারণে লাভ হয়। এর উত্তর হল, আকদকৃত বস্তু নিরাপত্তা নয়; বরং সেটা টাকাই। আর নিরাপত্তা হল, তার একটি ফলাফল বা পরিণাম। পাহারাদারের দৃষ্টান্তের মধ্যেও পাহারাদারের কাজ আকদকৃত বস্তু, নিরাপত্তা তার ফল। যেহেতু পাহারাদারের কাজ আকদকৃত বস্তু হতে পারে, এ কারণে সেটা জায়েয, কিন্তু টাকাকে আকদকৃত বস্তু বানানো হলে সমান সমান হওয়া শর্ত, যা বিমার মধ্যে নেই।

৩. সহযোগিতা বিমা 'التأمين التبادلى' (Mutual Insurance) : সব উলামায়ে কিরামই এর জায়েয হওয়ার প্রবক্তা। বাণিজ্যিক বিমাও 'التأمين التجارى' (Commercial Insurance) এরই একটি সম্প্রসারিত রূপ। ব্যাপক আকারে লোকদের সদস্য হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য একটি সম্প্রসারিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। তার ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক পাওয়া উচিৎ। বিমা কোম্পানি যে লাভ করে সেটা তাদের ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক। এ দলিলের সারকথা হল, 'التأمين التجارى' ও 'التأمين التبادلى' এর অনুরূপ। এর উত্তর হচ্ছে, 'التأمين التبادلى' একটি অনুদান এবং 'التأمين التجارى' হল বিনিময়। অনুদানের ক্ষেত্রে ধোঁকা সহনীয় হয়, কিন্তু বিনিময় চুক্তিতে ধোঁকা সহনীয় নয়।

৪. এটাও তাদের একটি দলিল, বিমা একটি নতুন চুক্তি। আর চুক্তির

www.pathagar.com

মূল হল যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ত্রুটি না পাওয়া যাবে ততক্ষণ তা বৈধ। আর বিমার যে ব্যাখ্যা আমরা করেছি তাতে কোনো ত্রুটি নেই। সুতরাং তার অবকাশ আছে। এর উত্তর হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিমার ত্রুটিগুলো হচ্ছে, জুয়া, সুদ এবং ধোঁকা, যা আমরা বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে মূলত বৈধ হওয়ার নিয়ম চলবে না।

## বিমার বিকল্প

বিমার বিকল্প একটা তো হল সহযোগিতা বিমা (Mutual Insurance)। যাতে শরিকরা নিজ নিজ ইচ্ছামতো ফান্ডে টাকা জমা করে। বছরের মাঝখানে যে লোকদের কোনো ক্ষতি হয় ঐ ফান্ড থেকে তাদের সাহায্য করে। তারপর বছর শেষ হবার পর যদি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে তা শরিকদের অংশ অনুযায়ী ফেরত দেয়া হয়। অথবা তাদের পক্ষ থেকে আগামী বছরের জন্য ফান্ডে চাঁদা হিসেবে রেখে দেয়া হয়।

এছাড়া বর্তমানে ইসলামী দুনিয়ার কয়েকটি দেশে 'التكافل شركات' নামে কিছু কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা বাণিজ্যিক বিমার বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাদের মৌলিক ধারণা হল, প্রত্যেক বিমা গ্রহীতা কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার। কোম্পানি মূলধন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে লভ্যাংশ তার শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনও করে। আবার কোম্পানির একটি রিজার্ভ ফান্ড থেকেই বিমা গ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণও করে।

আমার এখনো ঐসব কোম্পানির কর্মপন্থার বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয় ফিকহী দৃষ্টির আলোকে ভেবে দেখার সুযোগ হয় নি। তাই এক্ষণে আমি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তমূলক কথা বলতে পারছি না।

www.pathagar.com

# সরকারি অর্থব্যবস্থা

# (Public Financing)

এ আলোচ্য বিষয়ের অর্থ হচ্ছে, দেশের মোট ব্যয় কি তা কিভাবে নির্ধারিত হয়। আর এ ব্যয়ের অর্থ সংস্থানই বা কিভাবে হয়। আইন অনুযায়ী সরকার কর আরোপ করে। পার্লামেন্ট ব্যয়ের সীমা নির্দিষ্ট করে তার অনুমতি প্রদান করে। প্রতিবছর সরকারের আয় ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য যে দলিল প্রস্তুত করা হয় তাকে ইংরেজিতে বাজেট বলে।[১]

---

১. এ শব্দটি বাংলায়ও প্রচলিত। সরকারের আগামী এক বছরের প্রত্যাশিত আয় এবং পরিকল্পিত ব্যয়ের খাতওয়ারি বিস্তারিত বিবরণকে বাজেট বলে। বস্তুত আধুনিক কালের বাজেটে শুধু আয় ব্যয়ের হিসাবই নয়; বরং একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক চিত্র, জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, জাতীয় উৎপাদন, দেশজ উৎপাদন ইত্যাদি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। একটি দেশের অধিবাসীগণ প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম ও মূলধনের সাহায্যে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তাকে মোট জাতীয় উৎপাদন (এৎড়ংং ঘধঃরড়হধষ চৎড়ফঁপঃ) সংক্ষেপে এ.ঘ.চ বলে। মোট জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে বলা হয় জাতীয় আয় (ঘধঃরড়হধষ ওহপড়সব) এবং সংক্ষেপে ঘ. ও বলে। জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে জনগণের মাথাপিছু আয় (চবৎ ঈধঢ়রঃধষ ওহপড়সব) পাওয়া যায়। বিগত বছরের আয়ের তুলনায় বর্তমান বছরের আয় বৃদ্ধির হারকে বলা হয় প্রবৃদ্ধির হার (এৎড়ংং জধঃব)।

একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন (এৎড়ংং উড়সবংঃরপ চৎড়ফঁপঃ) সংক্ষেপে এ.উ.চ বলে।

আয় ও ব্যয়ের প্রকৃতি হিসেবে বাজেট দু প্রকার। ১. রাজস্ব বাজেট, ২. মূলধনী বাজেট।

যে বাজেটে শুধু সরকারের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব ব্যয়ের বিবরণ উল্লেখ থাকে তাকে রাজস্ব বাজেট (জবাবহঁব ইঁফমবঃ) বলে। কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব নিয়ে রাজস্ব আয়ের খাত গঠিত। অন্যদিকে সাধারণ প্রশাসন, প্রতিরক্ষা বিভাগ, পুলিশ প্রশাসন প্রভৃতি রাজস্ব ব্যয়ের প্রধান খাত।

যে বাজেটে সরকারের আগামী এক বছরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্য ব্যয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের উৎস উল্লেখ থাকে তাকে মূলধনী বাজেট (ঈধঢ়রঃধষ ইঁফমবঃ) বলে। এ উদ্দেশে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, ইংরেজিতে (অহহঁধষ উবাবষড়ঢ়সবহঃ ঢ়ষধহ), সংক্ষেপে অ.উ.চ বলে। একে উন্নয়ন বাজেটও (উবাবষড়ঢ়সবহঃ ইঁফমবঃ) বলা হয়।

এ বাজেটের আয়ের খাত সাধারণত সরকারি ঋণ ও রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত নিয়ে গঠিত হয়। ব্যয়ের খাতে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাজেট মূলত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। কখনো দেখা যায় বাজেটে উল্লিখিত আয় ব্যয়ের লক্ষ্য পূরণ হয় নি, অথবা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ যে আয় নির্ধারণ করা হয়েছিল বাস্তবে তার কম হয়েছে বা যে ব্যয় ধরা হয়েছিল বাস্তবে তার থেকে কম ব্যয় হয়েছে, অথবা বাজেটের তুলনায় ব্যয় বা আয় বেশি হয়ে গেছে। তখন পরবর্তী বাজেট ঘোষণার পূর্বে আগের বাজেটের সমন্বয় করা হয়। একে সংশোধিত বাজেট বলে। যেমন বাংলাদেশের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের মূল বাজেট ছিল ৬৯,৭৪০ কোটি টাকা। তা সংশোধন করে ৬৬, ৮৩৬ কোটি টাকা ধার্য করা হয়।

www.pathagar.com

বাজেট কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার এবং স্থানীয় সরকারের পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বাজেট মিলিয়ে একটি সম্মিলিত বাজেটও তৈরি করা হয়। একে (Consolidated Budget) বলে।

বাজেটের দুটি অংশ থাকে। এক অংশে লেখা থাকে আগামী বছরে সম্ভাব্য ব্যয়গুলো কি কি। দ্বিতীয় অংশে অনুমান করা হয়, আগামী বছরে কত আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সম্ভাব্য আয় ব্যয়ের তুলনায় কম হয় তাহলে বলা হয়, বাজেটে ঘাটতি হয়েছে। যদি আয় ব্যয় সমান সমান হয় তাহলে তাকে সুষম বাজেট মনে করা হয়। আর যদি আয় ব্যয়ের থেকে বেশি হয় তাহলে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে।

---

২০০৭-০৮ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত বাজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হল

**প্রাপ্তিসমূহ**

| | |
|---|---|
| • রাজস্ব | ৫৭৩০১ কোটি |
| করসমূহ | ৪৫৮৩৮ কোটি |
| কর বহির্ভূত প্রাপ্তি | ১১৪৬৩ কোটি |
| • বৈদেশিক অনুদান | ৪২৫৫ কোটি |
| ⇒ মোট | ৬১৫৫৬ কোটি |

**ব্যয়সমূহ**

| | |
|---|---|
| • অনুন্নয়নমূলক ব্যয় | ৫২৯০০ কোটি |
| অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় | ৪৮৩৮৯ কোটি |
| অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয় | ৪৫১১ কোটি |
| • উন্নয়নমূলক ব্যয় | ২৮৫২২ কোটি |
| বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) | ২৬৫০০ কোটি |
| এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচী | ২০২২ কোটি |
| • অন্যান্য ব্যয় | ৫৭১৫ কোটি |
| ⇒ মোট ব্যয় | ৮৭১৩৭ কোটি |
| সামগ্রিক ঘাটতি | ২৫৫৮১ কোটি |

**অর্থ সংস্থান**

| | |
|---|---|
| বৈদেশিক ঋণ | ৬৩৫০ কোটি |
| অভ্যন্তরীণ ঋণ | ১৯২৭৬ কোটি |
| ⇒ মোট অর্থসংস্থান | ২৫৫৮১ কোটি |

উল্লেখ্য. ঘোষিত বাজেটটি ঘাটতি বাজেট। মোট ঘাটতির পরিমাণ পঁচিশ হাজার পাঁচশ একাশি কোটি টাকা। (দৈনিক যুগান্তর, ৮ জুন, ২০০৭ ইং)

www.pathagar.com

## ব্যয়

ব্যয় দুই প্রকার–

**১. চলতি (Current) ব্যয় :** এর দ্বারা ঐ সমস্ত ব্যয় বুঝায় যার ফায়দা শুধু ঐ সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে যে সময়ের জন্য বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট এক বছরের হলে এক বছর পর্যন্তই ফায়দা হবে। যেমন সরকার কর্তৃক পরিশোধ্য সুদ চলতি ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

**২. স্থায়ী ব্যয় :** যে ব্যয়ের ফায়দা বাজেটভুক্ত সময়ের পরও পাওয়া যাবে। যেমন সড়ক সেতু ইত্যাদির উপর ব্যয়। একে উন্নয়ন ব্যয়ও বলে। যেমন ১৯৯২–৯৩ এর বাজেটে ব্যয় ছিল এরূপঃ

| | |
|---|---|
| চলতি ব্যয় | ২৫৭ কোটি টাকা |
| উন্নয়ন ব্যয় | ৭৩ কোটি টাকা |
| মোট ব্যয় | ৩৩০ কোটি টাকা |

## আয়

আয়ও দুপ্রকার। ১. কর[১] রাজস্ব, ২. কর বহির্ভূত রাজস্ব।

**কর রাজস্ব আয় :** যে আয় সরকারের কর থেকে আসে। কর দুপ্রকার।

**১. প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) :** যা ব্যক্তির উপর এমনভাবে আরোপিত হয়, সে তার বোঝা অন্যের উপর চাপাতে পারে না। যেমন আয় বেতন সম্পত্তি ইত্যাদির উপর আরোপিত কর।

**২. পরোক্ষ কর (Indirect Tax) :** যে করের বোঝা অন্যের উপরও চাপানো যায়। যেমন দোকান কারখানা ইত্যাদির উপর কর। দোকানদার বা শিল্পপতি মূল্য বাড়িয়ে অন্যের উপর তার বোঝা চাপাতে পারে। অথবা 'বিক্রয় কর' যা দোকানদার থেকে উসুল করা হয়, কিন্তু দোকানদার প্রত্যেক বস্তু বিক্রির সময় এ কর তার ক্রেতা থেকে উসুল করে নিতে পারে।

অর্থনীতিতে করের মূলনীতিও বলে দেয়া হয়। কর আরোপ করতে এ

---

[১]. জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কর (ঞ্চধী) বলে।

www.pathagar.com

সব মূলনীতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলোর খেয়াল রাখা উচিৎ।

১. করের পরিমাণে অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। ২. কর আদায়ের ব্যবস্থা সহজ হতে হবে, যাতে কর আদায়ে মানুষকে ঝামেলা পোহাতে না হয়। ৩. কর প্রয়োজনানুরূপ হতে হবে, যা সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্তও নয় এবং কমও নয়। ৪. সকল শ্রেণীর উপর সমান হারে আরোপ করতে হবে। ৫. কর এ পরিমাণ হতে পারবে না যাতে লোক মনে করতে থাকে, তাদের কারবারে কোনো লাভই হয় না। এর পরিণামে দেশে উৎপাদন কার্যক্রম প্রভাবিত হতে শুরু করে। ৬. করের পরিমাণ সহনশীল হতে হবে। দ্রব্যমূল্য এবং আয়ের উত্থান পতনের কারণে আপনা আপনি বদলে যায়। বার বার বদলাতে না হয়। যেমন পরিমাণ নির্ধারণ করে কোনো বস্তুর উপর কর আরোপ করা অসহনশীল। আর মূল্যের শতকরা হার অনুসারে কর আরোপ করা হলে তা সহনশীল হবে। যা ঐ বস্তুর মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকবে। ৭. কর ব্যবস্থাপনা এমন না হওয়া যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর প্রভাব পড়ে।

**কর বহির্ভূত আয় :** যে আয় সরকারি বা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আসে। যেমন ওয়াপদা, ফোন, পিআইএ, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে ইত্যাদি থেকে যে আয় আসে তা হল কর বহির্ভূত আয়।[২]

## ঘাটতি ও ঘাটতি পূরণ

ব্যয় থেকে আয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই ঘাটতি। যেমন পাকিস্তানের ১৯৯২–৯৩ এর বাজেটে ঘাটতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| মোট ব্যয় | ৩৩০ কোটি টাকা |
| মোট আয় | ২৬৫ কোটি টাকা |
| ঘাটতি | ৬৫ কোটি টাকা |

---

৩. কর ছাড়া অন্যান্য খাত থেকে যে আয় আসে তাকে কর বহির্ভূত রাজস্ব বলে। কর বহির্ভূত রাজস্ব দুই ধরনের। ১. বাণিজ্যিক রাজস্ব, ২. প্রশাসনিক রাজস্ব।

সরকারি খাতে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা এবং সরকারি সম্পত্তি থেকে যে আয় আসে তাকে বাণিজ্যিক রাজস্ব (ঈড়সসবৎপরধষ জবাবহঁব) বলে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ডাক, রেল, বিমান ইত্যাদির ভাড়া, সরকারি শিল্পখাত থেকে প্রাপ্ত আয় ইত্যাদি বাংলাদেশ সরকারের প্রধান বাণিজ্যিক রাজস্ব।

প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার মাধ্যমে সরকার যে রাজস্ব আয় করে তাকে প্রশাসনিক রাজস্ব (অফসরহরংঃৎধঃরাব জবাবহঁব) বলে। যেমন ফি, জরিমানা, বিশেষ কর প্রভৃতি।

www.pathagar.com

এ ঘাটতি পূরণের জন্য পুঁজি সরবরাহ করাকে 'ঘাটতি পূরণ' (উবভরপরঃ ঋরহধহপরহম) বলে। ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে। ঋণ দু প্রকার :

**১. বৈদেশিক ঋণ (Foreign Loans) :** যা অন্য কোনো দেশের সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে গ্রহণ করা হয়।

**২. অভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal Loans) :** যা দেশের অভ্যন্তরে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা জনসাধারণ থেকে নেয়া হয়।

অভ্যন্তরীণ ঋণ দুপ্রকার:

**১. ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (Non Banking Loans) :** যা জনসাধারণ থেকে নেয়া হয়। জনসাধারণ থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য 'সরকারি ঋণপত্র' জারি করা হয়। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে এ উদ্দেশে বিভিন্ন সেভিং স্কিম জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষ এ 'সরকারি ঋণপত্র' ক্রয় করে টাকা সরকারকে প্রদান করে। যেমন প্রাইজবন্ড, ন্যশনাল ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট, বিশেষ ডিপোজিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি। এ সব ঋণপত্রের উপর বর্তমানে জনসাধারণকে সুদ দেয়া হয়।

**২. ব্যাংক ঋণ (Banking Loans) :** একে 'নোট ছাপানো' বলেও ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকার নোট ছাপে না। কারণ আইনগতভাবে নোট ছাপানোর অধিকার সরকারের নেই; বরং স্টেট ব্যাংকের সে অধিকার রয়েছে। এ পুঁজি সংগ্রহের প্রক্রিয়া হল, সরকার 'ট্রেজারি বিল' চালু করে স্টেট ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। এ পরিমাণ টাকা সরকারের একাউন্টে জমা করে দেয়া হয়। একে 'নোট ছাপানো' বলা হয়। সরকার স্টেট ব্যাংককে ঋণ পরিশোধ করে, সাধারণত বর্তমানে তার দুটি পদ্ধতি আছে। এক হল, এত টাকার আরো অতিরিক্ত 'ট্রেজারি বিল' জারি করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, সরকার স্টেট ব্যাংককে বলে, আমার একাউন্ট থেকে এত টাকা কমিয়ে দাও।

তারপর ঋণের তিনটি মেয়াদ হয় যা বাজেটে লেখা থাকে।

**১. স্থায়ী ঋণ (Permanent Loans) :** যা সরকার 'সরকারি

www.pathagar.com

ঋণপত্রের' মাধ্যমে সাধারণ জনগণ থেকে গ্রহণ করে, যা ফেরত দেয়া হয় না। তবে এসব 'ঋণপত্র' সেকেন্ডারি মার্কেটে (ঝবপড়হফধৎু গধৎশবঃ) বিক্রি করা যায়। যেমন প্রাইজবন্ড ইত্যাদি।

**২. ভাসমান ঋণ (Floating Loans) :** যে ঋণ সরকার স্টেট ব্যাংক থেকে গ্রহণ করে।

**৩. স্বল্পমেয়াদী ঋণ (Unfunded Loans) :** যেসব ঋণপত্র স্বল্পমেয়াদী হয় তাকে বুঝায়। যেমন ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট, ন্যাশনাল ডিপোজিট সার্টিফিকেট, মাসিক আয়, বিশেষ ডিপোজিট ইত্যাদি।

ঘাটতি পূরণে বেশি অংশ থাকে অভ্যন্তরীণ ঋণের। বৈদেশিক ঋণ তার তুলনায় অনেক কম হয়। যেমন ১৯৯২-৯৩ সালে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল তার বিবরণ নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ঋণ | ২১ কোটি টাকা |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ | ৪৮ কোটি টাকা |
| বৈদেশিক ঋণ | ১৭ কোটি টাকা |
| মোট ঋণ | ৮৬ কোটি টাকা |

ঋণের টাকা পরিষ্কারভাবে লেখা হয়। অর্থাৎ শুধু ঋণের টাকাই লেখা হয়। এর উপর যে সুদ আদায় করতে হয় তা ব্যয় খাতে লেখা হয়। আজকাল আমাদের দেশে সুদের পরিমাণ মূল টাকা থেকে বেশি হয়। যেমন ১৯৯২-৯৩ সালে সরকারকে যে দেনা পরিশোধ করতে হবে তা হল নিম্নরূপ :

| | |
|---|---|
| মূল ঋণ | ৩৩ কোটি টাকা |
| সুদ | ৮৬ কোটি টাকা |
| মোট দেনা | ১১৯ কোটি টাকা |

তারপর সুদের বেশির ভাগ অংশই অভ্যন্তরীণ ঋণের থাকে। বৈদেশিক সুদ তার তুলনায় খুবই কম। যেমন উপরোল্লিখিত ৮৬ কোটি টাকার মধ্যে ৫৮ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ সুদ আর ১৫ কোটি টাকা বৈদেশিক সুদ (অবশিষ্ট ১৩ কোটি টাকার কোনো ব্যাখ্যা বাজেটে করা হয় নি)।

এখন পর্যন্ত যেসব ঋণ সরকারের দায়িত্বে অবশ্য পরিশোধ্য তার বিবরণ :

www.pathagar.com

| | |
|---|---|
| মোট ঋণ | ১৩০০ কোটি টাকা |
| অভ্যন্তরীণ ঋণ | ১০০০ কোটি টাকা |
| বৈদেশিক ঋণ | ৩০০ কোটি টাকা |
| অভ্যন্তরীণ ঋণের বিবরণ : | |
| মোট ঋণ | ১০০০ কোটি টাকা |
| স্টেট ব্যাংক | ২৭৫ কোটি টাকা |
| সাধারণ ব্যাংক | ১১০ কোটি টাকা |
| বিশেষ ডিপোজিট | ২০০ কোটি টাকা |
| বৈদেশিক ঋণের বিবরণ | |
| বিদেশী সরকার থেকে গৃহীত | ১৯০ কোটি টাকা |
| আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে গৃহীত | ১১০ কোটি টাকা |
| মোট | ৩০০ কোটি টাকা |

এসব হিসাব থেকে বুঝা গেল, সরকারের মোট ঋণের অনেক বিরাট অংশ অভ্যন্তরীণ এবং অনেক কম অংশ বৈদেশিক।

## ঘাটতি পূরণের বিকল্প পদ্ধতি

যখন সুদমুক্ত অর্থনীতির কথা আলোচনা করা হয় তখন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে তা সর্বাধিক কঠিন সমস্যা মনে করা হয়। অনেকেই ভাবতে থাকে, যদি সুদে ঋণ নেয়ার পথ একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ নেয়া হয় তা নেয়ার পদ্ধতি কী হবে? কেননা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিরকাত ও মুদারাবা কল্পনা করা যায়, কিন্তু যে ব্যয়ের জন্য সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাতে বহুসংখ্যক কাজ এমন যা লাভজনক নয়। যেমন সড়ক, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, সেনা বাহিনীর জন্য নতুন অস্ত্র সংগ্রহ করা। অনুরূপভাবে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যার ফায়দা পুরো জাতি ভোগ করে, কিন্তু তা থেকে সরাসরি কোনো আয় আসে না।

এ প্রশ্নের উত্তরে সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, বাজেট ঘাটতি কমানোর জন্য সর্বপ্রথম অপচয়মূলক ব্যয় পরিহার করা প্রয়োজন, রাত দিন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে যার প্রদর্শনী হয়। একটি দরিদ্র দেশে যার কোনো বৈধতাও নেই। তেমনিভাবে আমাদের দেশে ঘুষ দুর্নীতির কারণেও অনেক বিরাট অংকের টাকা নষ্ট হয়। এর রাস্তা বন্ধ হওয়া দরকার, কিন্তু

www.pathagar.com

তারপরও এ বাস্তবতা স্বস্থানে থেকে যাবে। অপচয়মূলক ব্যয় পরিহার এবং দুর্নীতি বন্ধ করা সত্ত্বেও দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে বাজেট ঘাটতি পূরণের জন্য পুঁজি সরবরাহের অন্য মাধ্যমের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে। বর্তমান অবস্থায় এ উদ্দেশের জন্য সুদের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হয়। সুদমুক্ত করার পর সরকারের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন অর্থ সংস্থান পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যার কয়েকটি হল :

১. সরকারের যে প্রতিষ্ঠান লাভজনক যেমন টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগ, এর অর্থ সংস্থানের জন্য মুদারাবা সার্টিফিকেট জারি করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে লোক এ মুদারাবা সার্টিফিকেট গ্রহণ করবে সে ঐ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশে তার অংশ অনুযায়ী শরিক হবে। তেমনিভাবে যদি কোনো মহাসড়ক বা সেতু নির্মাণ করতে হয় তাহলে তার ব্যবহারের উপর ফিস আরোপ করা যেতে পারে। এর দ্বারা এ প্রকল্পও লাভজনক হয়ে যাবে। এর মধ্যেও জনসাধারণকে মুদারাবা সার্টিফিকেট জারি করা যেতে পারে।

২. যে প্রকল্প কোনোভাবেই লাভজনক না হবে তার অর্থ সংস্থানের জন্য এমন সুদমুক্ত বন্ড জারি করা যেতে পারে যার উপর কোনো বিনিময় প্রদান করা হবে না। তবে তার গ্রাহকদের ট্যাক্সে ছাড় দেয়া যেতে পারে। ট্যাক্স ছাড় পদ্ধতি অধিক হারে আকর্ষণীয় বানানো যেতে পারে। ট্যাক্স যেহেতু জনসাধারণের উপর সরকারের ঋণ নয়, এ কারণে তা মওকুফ বা তাতে ছাড় দেয়া সুদের মধ্যে গণ্য হবে না। সরকার ট্যাক্স বসাতে এবং বিভিন্ন বিভাগকে ছাড় দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন কারণ সামনে রাখে। যদি এ কারণও সামনে রাখা হয় তাহলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

৩. আরেকটি প্রস্তাবও বিবেচনাযোগ্য। সরকারকে ঋণ দিয়ে সরকারি ঋণপত্র গ্রহীতাদের তাদের ঋণের উপর কোনো শর্তযুক্ত ও ধার্যকৃত অতিরিক্ত প্রদান করা তো যাবে না, কিন্তু কখনো সুযোগমতো কিছু পুরস্কার দেয়া যেতে পারে। আইনগতভাবে যা দাবি করার কারো কোনো অধিকার থাকবে না। মালয়েশিয়ায় এ প্রস্তাবের উপর কার্যক্রম চলছে। যেহেতু এ পদ্ধতিতে পুরস্কার শর্তযুক্তও নয়, আর তার হারও ধার্যকৃত নয় এবং তা পাওয়াও নিশ্চিত নয়। ঋণদাতার পক্ষ থেকে তার দাবিও নেই। এ কারণে দর্শনগত দিক থেকে তার উপর সুদের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না, কিন্তু

www.pathagar.com

সন্দেহ হয়, ধারাবাহিক কার্যক্রমের ফলে এটা 'المعروف كالمشروط'-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আরো একটি প্রস্তাব হচ্ছে, এ অতিরিক্ত আদায়কে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ ঋণের মেয়াদে মোট জাতীয় উৎপাদনে যত বৃদ্ধি পাবে, ততটুকু বেশিই জনসাধারণকে দেয়া হবে। যদি কোনো বৃদ্ধি না থাকে তাহলে অতিরিক্ত কিছু দেয়া হবে না। এ প্রস্তাবের ব্যাপারে এখনো আমার নেতিবাচক বা ইতিবাচক কোনো দিকে দৃঢ়তা নেই, কিন্তু আলেমদের এর উপর অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ।

৪. সরকারের নিজের কাজের জন্য, অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীর জন্য অনেক মেশিনারি সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। তার অর্থ সংস্থানের জন্য ইজারা পদ্ধতিও সহজে গ্রহণ করা যায়। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ সামগ্রী ইজারার ভিত্তিতে লাভ করা যায়।

৫. এ ছাড়া একটি বহুমুখী কর্মপ্রক্রিয়া হতে পারে, সরকার তার ব্যয়ের অর্থ সংস্থানের জন্য একটি বাণিজ্যিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করবে (এ প্রতিষ্ঠান সরকারি বিভাগেও প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং তাকে আধা সরকারিও বানানো যেতে পারে)। এ প্রতিষ্ঠান জনগণের জন্য মুদারাবা সার্টিফিকেট চালু করবে। আর এ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত জনগণের টাকা থেকে সরকারকে বিভিন্ন কাজের মধ্যে শিরকাত মুদারাবা ইজারা এবং মুরাবাহার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। যার বিস্তারিত প্রক্রিয়া ব্যাংকিং অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বিনিয়োগের ফলে যে আয় হবে সেটা মুদারাবা সার্টিফিকেটধারীদের মধ্যে অংশ অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। এ মুদারাবা সার্টিফিকেট সেকেন্ডারি মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্যও হতে পারে। এভাবে জনসাধারণের নিশ্চয়তাও লাভ হতে পারে, সে তার খাটানো টাকা যখন ইচ্ছা সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রি করে ফেরত নিতে পারবে। আর সার্টিফিকেট নিজের কাছে রাখতে চাইলে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আয়ে অংশীদার হতে পারবে।

মোট কথা, বিভিন্ন প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন এবং তার জন্য উত্তম ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ ঋণের এক বিরাট অংক থাকে স্টেট ব্যাংকের ঋণ। তার উপর সুদের লেনদেন নিছক একটি কাগজী জমা খরচ। এটা বাদ দিতে

www.pathagar.com

কোনো জটিলতা নেই। তেমনিভাবে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ঋণের লেনদেনেও সুদের কার্যক্রম সহজেই দূর করা যেতে পারে। এতেও কোনো জটিলতা নেই।

বৈদেশিক ঋণের ব্যাপারেও যদি সরকার আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করে তাহলে অন্য দেশকেও ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে টাকা সরবরাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বৈদেশিক ঋণদাতাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ অর্জন করা, লাভ করার পদ্ধতি তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। এর একটি সরল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এখনো অনেক দেশ ঋণ দেয়ার সাথে সাথে শর্তারোপ করে, দ্রব্য-সামগ্রী আমাদের দেশ থেকেই ক্রয় করতে হবে। যখন দ্রব্য সামগ্রী তার দেশ থেকেই ক্রয় করতে হবে তখন ঋণের পরিবর্তে দ্রব্য-সামগ্রীকেই 'مرابحة مؤجلة' এর ভিত্তিতে গ্রহণ করতে কী অসুবিধা? এখন সারা দুনিয়ায় ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে পরিচিত হয়ে উঠছে। আই এম এফ (ও.গ.ঋ.) এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে এর উপর যথারীতি রিসার্চ হচ্ছে। তার থেকে কোনো কোনোটার সমর্থনে পাশ্চাত্য লেখকদের প্রবন্ধও প্রকাশিত হচ্ছে। আই এফ সি (ও.ঋ.ঈ ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন)– যা বিশ্ব ব্যাংক ধাঁচের একটি প্রতিষ্ঠান এবং খাঁটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। এখন ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে নিজেরাই ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে কারবার করছে। এ অবস্থায় যদি ইসলামী দেশগুলো আন্তরিকতা এবং গুরুত্বের সাথে অন্য সরকারের সাথে এর ভিত্তিতেকারবার করার চেষ্টা করে, তাহলে এ ব্যাপারে সাফল্য পাওয়া খুব কঠিন কিছু নয়।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى أله وصحبه اجمعين

সমাপ্ত

www.pathagar.com

MAKTABATUL AZHAR
মাকতাবাতুল আযহার
মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৯৮৮১৫৩২, ০১৯২৪-০৭৬৩৬৫